আদ-দাউলাতুল ফাতিমিয়্যাহ গ্রন্থের অনুবাদ

# ফাতেমি সাম্রাজ্যের ইতিহাস

ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি

Barqa
FATIMID CALIPHATE
Cairo
EGYPT
HIJAZ
Aswan

মিফতাহ আল-ফাতাহ
অনূদিত

## উৎসর্গ

মুহাম্মদ বিন নাসীম আরাফাত
প্রস্ফুটিত কলি হয়েই চলে গেল মহামহিমের কাছে
পরপারে সুখে থেক জান্নাতে মনোহর বাগানে—

# সূচিপত্র


প্রকাশকের কথা ........ ৯
অনুবাদকের কথা ........ ১০
ভূমিকা ........ ১৩

প্রথম অধ্যায় ........ ২১
উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের শিয়া রাষ্ট্র ........ ২১

প্রথম পরিচ্ছেদ ........ ২১
শিয়াদের পরিচয় ........ ২১
এক. শিয়া (الشيعة) শব্দের পারিভাষিক অর্থ ........ ২৩
দুই. رافضة বা রাফেযীদের পরিচয় ........ ২৪
তিন. তাদেরকে এই নামে নামকরণের কারণ ........ ২৫
চার. শিয়া সম্প্রদায়ের সূচনা ........ ২৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ........ ৩২
শিয়াদের গুরুত্বপূর্ণ দল-উপদলের পরিচয় ........ ৩২
এক. নাসিরিয়্যাহ ........ ৩২
তাদের ভ্রান্ত আকিদাসমূহ ........ ৩৫
দুই. শিয়া ইসনা আশারিয়্যাহ ........ ৩৭
বর্তমান যুগে শিয়া ইসনা আশারিয়ার কার্যক্রম ........ ৪৩
বর্তমান সময়ের শিয়া ইমাম ও তার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ........ ৪৩
সাহাবীদের ব্যাপারে ইমাম খোমেনির আকিদা-বিশ্বাস ........ ৪৬
শিয়া-সুন্নি ঐক্য কি সম্ভব? ........ ৪৮
শায়েখ মুসা জারুল্লাহর অভিজ্ঞতা ........ ৪৯
তিন. শিয়া ইসমাইলিয়া ........ ৫৫
ক. উম্মতের ওপর বাতেনিদের মারাত্মক প্রোপাগাণ্ডা ........ ৫৬
খ. বাতেনিদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস ........ ৬০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ........................................................................৬১
উত্তর আফ্রিকায় বাতেনী মতবাদ প্রচারকগণ........................................৬১
আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ী ........................................................৬১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ..........................................................................৬৮
প্রথম রাফেযি শিয়া খলিফা উবায়দুল্লাহ মাহদি......................................৬৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ........................................................................৭২
ইমাম মাহদির ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা...... ৭২
এক. ইমাম মাহদি সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসের তাওয়াতুর.............. ৭৬
দুই. ইমাম মাহদি সম্পর্কিত হাদিস অস্বীকারকারী এবং তাদের মত খণ্ডন.............................................................................. ৭৭

দ্বিতীয় অধ্যায়..........................................................................৮১
উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার গোত্রসমূহের বিরোধ.........৮১

প্রথম অনুচ্ছেদ ..........................................................................৮১
তারাবলুসে হাওয়ারা গোত্রের বিদ্রোহ ...........................................৮১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ.........................................................................৮৪
বারাকা অভিমুখে উবায়দিয়াদের অভিযান ........................................৮৪
উবায়দিয়াদের বিরুদ্ধে বারাকাবাসীর বিদ্রোহ ...................................৮৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ.........................................................................৮৭
উবায়দিয়াদের বিরুদ্ধে আবু ইয়াযীদ খারেযির বিদ্রোহ-অভিযান....৮৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ...........................................................................৯২
রাফেযীদের দ্বিতীয় খলিফা আল কায়িম বি আমরিল্লাহ আবুল কাসেম নাযযার ইবনে উবায়দুল্লাহ..................................................... ৯২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ .........................................................................৯৪
উত্তর আফ্রিকায় শিয়া রাফেযিদের তৃতীয় খলিফা আল মানসূর বি নাসরুল্লাহ আবু তাহের ইসমাঈল..............................................৯৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ........................................ ৯৬
আল মুঈয লি দীনিল্লাহ আবু তামীম সাদ........................ ৯৬
মিসর অভিমুখে মুঈয এর সফর ........................ ৯৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ ........................................ ১০১
উত্তর আফ্রিকায় উবায়দিয়াদের অন্যায়-অপরাধসমূহ............ ১০১

অষ্টম পরিচ্ছেদ........................................ ১১৩
আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শী আলেমদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ......... ১১৩
ইমাম আবু উসমান সাঈদ বিন হাদ্দাদ রহ.-এর ঐতিহাসিক বিতর্ক
........................................ ১১৯

তৃতীয় অধ্যায়........................................ ১৩৩
সনহাজি সাম্রাজ্য ........................................ ১৩৩
ভূমিকা........................................ ১৩৩

প্রথম পরিচ্ছেদ........................................ ১৩৩
আবুল ফুতূহ ইউসুফ বিন জিরি বিন মুনাদ বিন মানকূশ সনহাজি ১৩৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ........................................ ১৩৫
মুঈয বিন বাদিশ সনহাজি (৪০৬-৪৪৯ হিজরী) ........................ ১৩৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ........................................ ১৪০
উত্তর আফ্রিকার দিকে বনী হিলাল, বনী সুলাইম ও অপরাপর আরব
সম্প্রদায়ের অভিযান ........................................ ১৪০
ভূমিকা ........................................ ১৪০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ........................................ ১৪৫
মুঈয বিন বাদিশ ও আরব গোত্রসমূহের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ... ১৪৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ........................................ ১৫১
মুঈযের সন্তানাদি ও দৌহিত্রগণ........................................ ১৫১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ........................................ ১৬৫
উত্তর আফ্রিকায় জিরি সাম্রাজ্য পতনের কারণসমূহ.................. ১৬৫
কায়রাওয়ান ও মাহদিয়ায় জিরি বংশের শাসকবৃন্দ .................. ১৬৬

চতুর্থ অধ্যায় ........................................ ১৬৭
উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের পতন ........................................ ১৬৭

প্রথম পরিচ্ছেদ........................................ ১৬৭
উবায়দিয়া সাম্রাজ্য পতন, বাতেনী সম্প্রদায়ের ভিত নির্মূল এবং ক্রুসেডার খ্রিস্টানদের ভরাডুবির কারণসমূহ.................. ১৬৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ........................................ ১৭৯
সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ........................................ ১৭৯
সিরিয়া ও মিসরের অঞ্চলসমূহে ঐক্যের সুবাতাস.................. ১৯৪
সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের ইন্তিকাল........................................ ১৯৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ........................................ ১৯৬
মিসর থেকে উবায়দিয়া সাম্রাজ্য উৎখাতকারী ও বায়তুল মুকাদ্দাস বিজেতা সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী........................................ ১৯৬
মহামান্য বিচারপতি ........................................ ২১১
মহান বিজেতা সুলতান সালাহউদ্দীনের ইন্তিকাল .................. ২১৮
সুলতান সালাহউদ্দীনের জীবনের বিশেষ দিকসমূহ.................. ২২০
সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহ.-এর ব্যাপারে মর্মস্পর্শী শোকগাঁথা ........................................ ২৩১
সুলতান সালাহউদ্দীন রহ.-এর মৃত্যুতে রচিত হৃদয়স্পর্শী সংবাদ ২৩৫
আলোচনার সারাংশ ........................................ ২৩৮

# প্রকাশকের কথা

নাহমাদুহূ ওয়ানুসল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মাবাদ।

'আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়্যাহ' গ্রন্থটি বর্তমান সময়ের একজন খ্যাতিমান লেখক ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির অনন্য রচনা। মূল আরবি বইটি রয়্যাল সাইজে ১৩৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত। মাকতাবাতুন নূর—এই বইটির মাধ্যমে প্রকাশনার পথে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে। প্রথম বই হিসেবে কেন একে বেছে নেওয়া হলো—পাঠকমহল আশা করি তার গুরুত্ব বুঝবেন।

প্রথম হিসেবে বইটিকে ঘিরে আমাদের আশা ও স্বপ্ন অতুল। তাই অনুবাদসহ এর সার্বিক মানোন্নয়নে কোনোরূপ কসূর করা হয়নি। দীর্ঘদিন ধরেই বইটি প্রকাশের কথা পাঠকদের কাছে বলা হচ্ছিল। কিন্তু সার্বিক সৌন্দর্যায়ন ও মানসম্পন্ন করতে গিয়েই বিলম্ব হয়ে গেল। তারপরও আশা করি, পাঠকমহল আমাদেরকে অপারগ না ভেবে আপন করে নেবেন। বইটি সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি-পরামর্শ ও দুআ দেবেন। সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবেন।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে একটাই মিনতি– তিনি যেন আমাদের কাজগুলোকে কেবলই জীবিকার মাধ্যম না বানান। আমাদের কাজ দ্বারা যেন মুসলিম জাতিসত্তার বিকাশ ও উন্নয়ন করেন। ইসলামি চেতনা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করেন। ইসলামবিদ্বেষীদেরকে সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠক হিসেবে গড়ে তুলবার তাওফিক দান করেন। আমিন।

পাঠক! কথা আজ এ পর্যন্তই...!
সামনে নতুন কোনো বইয়ে আরও কথা হবে...!
ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন...!
আল্লাহ হাফেয!

মাওলানা দিলাওয়ার হুসাইন
১৮.০৩.২০২০

# অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহামহিম আল্লাহ তাআলার। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (স)-এর ওপর। সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, সালিহীন ও সালফে সালেহীনের ওপর আল্লাহর অশেষ দয়া ও রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাআলা তাদের কর্ম-অবদানগুলো কবুল করুন। তাদের কবরগুলোকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দিন। বর্তমান ও অনাগত মুসলিম প্রজন্মকে দীন ও ইসলামের নিষ্ঠাপূর্ণ খেদমতে নিয়োজিত রাখুন। ইসলামবিদ্বেষী অপশক্তিগুলোকে হিদায়াত দিন। হিদায়াত নসীবে না থাকলে তাদেরকে ইসলামবিরোধী কর্মতৎপরতা থেকে বিমুখ রাখুন। ধ্বংস করে দিন। আমীন।

সমগ্র পৃথিবীতে আজ ইসলাম ও মুসলমানগণ চরম নিগৃহীত, অন্যায় নির্যাতন নিপীড়নে জর্জরিত। দীন-ইসলামের ধারক-বাহকগণ লাঞ্ছিত-অপদস্থ। যুগ পরম্পরায় তারা ইসলামবিদ্বেষীদের অন্যায় হস্তক্ষেপ ও জুলুম-নির্যাতনের শিকার। যুগে যুগে নানান দল-উপদল ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করতে চেয়েছে। ইসলামের সুমহান আদর্শকে দলিতমথিত করে নিজেদের মনগড়া ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। যুগে যুগে ইসলামের লেবাস পরিহিত শত্রুরা ইসলামের সমূলে কুঠারাঘাত করেছে, করে চলেছে। আর সর্বক্ষেত্রেই ইসলামের ধারক-বাহক, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা-আদর্শের অনুসারী আলেম-উলামা ও সাধারণ মুসলমানগণ তাদের অন্যায় টার্গেটে পরিণত হয়েছেন। যুগপ্রেক্ষিতে আল্লাহর মদদে তারা সে টার্গেট ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। জেল-জুলুম আর নির্যাতনের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ পেরিয়ে তারা ইসলামের চেতনা-আদর্শ বুলন্দ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। দিগন্ত পানে ইসলামের বিজয়কেতন উড্ডীন করতে সক্ষম হয়েছেন।

শিয়া রাফেযি বাতেনি সম্প্রদায় এমনই এক গোষ্ঠি– যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের বিনাশ সাধনে অদ্যাবধি কর্মতৎপর। উত্তর আফ্রিকাঞ্চলে তারা নিজেদের মজবুত ঘাঁটি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। সে অঞ্চলগুলোতে তারা আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শী আলেম-উলামা ও সাধারণ মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের স্ট্রীম রোলার চালিয়েছিল। ইসলামী আকিদা-আদর্শ নাম দিয়ে তারা এমনসব ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস জনমনে তৈরি করতে চেয়েছিল– যা মূলত শিয়া

গোষ্ঠির নামায়নে ইহুদি-খ্রিস্টানদেরই আকিদা-বিশ্বাস। নিজেদের এই ভ্রান্ত আকিদা প্রতিষ্ঠায় তারা খ্যাতিমান আলেম-উলামা ও ইসলামের ধারক-বাহক জনসেবকদেরকে হত্যা করতেও কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ করেনি। উপরন্তু তারা মিসর, মরক্কো ও সিরিয়ার নানান অঞ্চল দখল করে নিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্য সুসংহত করতে সক্ষম হয়। আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শী আলেম-উলামাগণ দিনরাতের কর্মতৎপরতায় তাদের মজবুত ঘাঁটি সমূলে উৎপাটিত করার সমূহ সুযোগ ও উপায় সৃষ্টি করেন। তাদের সেই বিপ্লবী ধ্যান-ধারণার মানস সন্তান সুলতান নুরুদ্দীন মাহমুদ ও সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর হাত ধরে দীনের পতাকাবাহী বীরসেনানীরা বাতেনীদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে এবং তাদের সাম্রাজ্যের ভিত সমূলে উৎপাটন করে সেখানে ইসলামি খেলাফতের বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে সমর্থ হয়।

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে লিবিয়ার বেনগাজিতে জন্মগ্রহণ করা ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি বর্তমান সময়ের একজন খ্যাতিমান লেখক। ইসলামি ইতিহাসের জানা ও অজানা অধ্যায়গুলো নিজ কলমে তিনি রচনা করেছেন প্রবল যত্ন-আত্তি নিয়ে। প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাবলির সহায়তা নিয়ে ইতিহাসের অজানা অধ্যায় থেকে তিনি খুঁজে এনেছেন অনেক বিরল তথ্য-উপাত্ত। এর পাশাপাশি ইতিহাসের নানান বাঁকগুলোকে নিজস্ব বিশ্লেষণ স্টাইলে উপস্থাপন করেছেন বিপুল দক্ষতায়। তার রচনা ও গদ্য পাঠককে যেমন প্রবলভাবে আকর্ষণ করে তেমনি অসংখ্য লাইব্রেরি ও গ্রন্থাগারের শোভাবর্ধনও করে।

'আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়্যাহ' বা 'ফাতেমি সাম্রাজ্যের ইতিহাস' তার অনন্য একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি তিনি কেন লিখেছেন– তা তিনি ভূমিকাতেই উল্লেখ করে দিয়েছেন। বর্তমান প্রজন্ম এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম এ গ্রন্থ পাঠ করে একই সাথে যেমন বাতিলের অপতৎপরতার কথা জানতে পারবে তেমনি বাতিল প্রতিরোধে সংগ্রামী চেতনা ও প্রেরণাও লাভ করবে। নিজেদের সোনালি ইতিহাসের কথামালা পাঠ করে তারা নব্য বাতিল ও মুখোশধারী শত্রুদের কর্মতৎতরতা রুখে দেওয়া পথনির্দেশনাও খুঁজে পাবে। আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে বাতিলের নখরথাবা থেকে হেফাযত করুন।

'আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়্যাহ' বা 'ফাতেমি সাম্রাজ্যের ইতিহাস' গ্রন্থটি প্রকাশে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা বাংলাবাজারস্থ মাকতাবাতুন নূর। নব্য প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে সৃজনশীল পাঠকের সুনাম কুড়াতে সক্ষম হয়েছে। কুদরতের কারিশমায় এটিই হতে যাচ্ছে তাদের প্রথম নিজস্ব প্রকাশনা। সূচনালগ্নে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের সৎসাহস করায় তারা অবশ্যই

সাধুবাদ পাবার যোগ্য। আশা করি, সমমনা প্রতিষ্ঠানগুলোও এই উদ্যোগকে উৎসাহিত করবেন।

গ্রন্থটি অনুবাদের জন্য আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল প্রায় বছরখানেক আগে। মূল বইটি কলেবরে ছোট্ট হলেও ইতিহাসের নানা বাঁক ও পাঠপরিক্রমাগুলো যত্নের সাথে ফুটিয়ে তোলা এবং সরল বর্ণনায় বইটিকে পাঠকের বোধের কাছাকাছি নিয়ে আসার কোশেশ করতে গিয়েই এতো দেরি হলো। বোদ্ধা পাঠক আশা করি আমাদের কর্মপ্রচেষ্টার গুরুত্ব বুঝবেন। কাজটি করতে গিয়ে নিজের শ্রম ও মেহনত ব্যয়ে কোনোরূপ কার্পণ্য করিনি। তারপরও কোথাও কোথাও মুদ্রণপ্রমাদ বা বোধের অসঙ্গতি রয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। এগুলো নিয়েই এগিয়ে যেতে হয় নিরন্তর। সুহৃদ পাঠক সেগুলো পরম মমতায় আমাদেরকে ইঙ্গিত করলে শুধরে নেওয়া হবে। ইনশাআল্লাহ।

বইটি যদি আমাদের জ্ঞান ও মনন সমৃদ্ধিতে কোনোরূপ ভূমিকা রাখতে পারে– তবেই আমাদের শ্রম-সাধনা সার্থক। আলহামদুলিল্লাহ।

*মিফতাহ আল ফাতাহ*
১৮.০৩.২০২০

# ভূমিকা

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের অধিপতি মহান আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে এবং পাপাচার ও তার পরিণাম থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ তাআলা যাকে হিদায়াত দান করেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে হিদায়াত দান করতে পারবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করতে থাক। আর অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।[১]

তিনি আরও ইরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার (পাঁজর) থেকে তার সঙ্গীনী সৃষ্টি করেছেন; আর তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। আর তোমরা ওই মহান আল্লাহকে ভয় কর– যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা করে থাক। তোমরা আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন।[২]

---

[১] সূরা আলে ইমরান : ১০২।
[২] সূরা নিসা : ১।

তিনি আরও ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।[৩]

হামদ-ছানার পর কথা হলো, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, যেমন প্রশংসা করা উচিত আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাট রাজত্ব অনুসারে। হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনার জন্যই, যতক্ষণ না আপনি সন্তুষ্ট হন। হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য, যখন আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান- তারপরও।

'আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়্যাহ' নামক বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে ইতিহাসে 'ফাতেমি সম্প্রদায়' নামে পরিচিত জাতি-গোষ্ঠির রাজ্যশাসনের সূচনা ও উত্থান-পতনের কথা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে শিয়া সম্প্রদায় ও মুসলিম জাতির বিনাশ সাধনে তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতার কথাও আলোচনা করা হয়েছে। উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে বাতেনি সম্প্রদায়ের সাফল্যের কারণ ও রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। রাফেযি সম্প্রদায় ও আহলুস সুন্নাহের মাঝে দ্বন্দ্বের বাস্তবতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে রাফেযিদের নানাবিদ অপকৌশল ও এর প্রতিরোধে আহলুস সুন্নাহর গৃহীত পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের বিনাশে উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের অধিবাসীদের গৃহীত বিরাট বিরাট আন্দোলন-সংগ্রাম ও পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে তৎকালীন সময়ে আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শী আলেম উলামা কর্তৃক বয়ান-নসীহত ও তালিম-তরবিয়্যতের চেষ্টা-সাধনার কথা এবং রাফেযি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্রধারণের কথাও সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শ প্রচার-প্রসার এবং সমগ্র উত্তর আফ্রিকা থেকে রাফেযিদের ভিত ও শেকড় উৎপাটনে সনহাজি সাম্রাজ্যের ভূমিকা সবিস্তারে উল্লেখ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে, মুঈয ইবনে বাদিশ সনহাজির

---

[৩] সূরা আহযাব : ৭০-৭১।

যুগে এবং তার পুত্র শাহযাদা তামীম বিন মুঈয এর যুগে গৃহীত ব্যাপক কর্মতৎপরতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এমনিভাবে মিসরে উবায়দিয়া সাম্রাজ্য ও সনহাজি সাম্রাজ্যের মাঝে সংঘটিত সংঘর্ষ-ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সনহাজি সাম্রাজ্য পতনের মূল কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বই পাঠককে মিশরের রাফেযী ফেতনা ও ইরাকের আহলুস সুন্নাহর মধ্যকার দ্বন্দ্বের কথাও ব্যক্ত করবে। আর এই দ্বন্দ্বের কথা কেবলই ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য উদ্ঘাটনের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। সত্য কথা হলো, উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস সারা মুসলিম উম্মাহ তথা মিসর, হিজায, সিরিয়া ও ইরাকসহ সারা মুসলিম বিশ্বে সংঘটিত ফেতনা-ফাসাদের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। সুতরাং, আমরা ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে এক জাতির একাংশ বাদ দিয়ে কেবল অপর অংশ বর্ণনা করতে পারি না।

একই সঙ্গে এই বইটি দুই মহান মুসলিম সেনাপতি নূরুদ্দীন মাহমূদ ও সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর যুদ্ধ ও সংগ্রামী জীবনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও পরিস্ফুট করে দেবে। আলেম-উলামা, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও দীনি ব্যক্তিবর্গের অমর কীর্তিনামার কথাও তুলে ধরবে। যারা সদাসর্বদা দীনের প্রচার-প্রসারে এবং দীনমনস্ক প্রজন্ম তৈরিতে বিরাট অবদান রেখেছেন। এর পাশাপাশি বইটি নানান ফেতনা ও যুদ্ধ-সংঘর্ষের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদানের মধ্য দিয়ে জাতি-সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কর্মনীতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ তাআলার রীতিনীতি বোঝা এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সেগুলোর সত্যমর্ম উদ্ঘাটনে পথনির্দেশ করবে, উম্মাহর হারানো ঐতিহ্য ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারে আলেম-উলামাদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের গুরুত্বের কথা তুলে ধরবে এবং বস্তুজাগতিক ক্ষেত্রে এমন উপায়-উপকরণ সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করবে- যার দ্বারা সত্যিকারার্থেই শত্রুবাহিনীর বিপক্ষে বিজয় লাভ করা যায়।

এই বইটি সমাজ পরিবর্তন, জাতি ও রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা পালনের গুরুত্ব তুলে ধরবে। উম্মাহর মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ঐশী জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও সাধনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করবে। চাই তা আচার-আখলাক ও সংগ্রাম-সাধনার ক্ষেত্রে হোক কিংবা আপন রবের কিতাব, তার নবীর সুন্নত পালন এবং নিষ্ঠাপূর্ণভাবে এ দুটির অনুসরণ ও ঐক্যবদ্ধভাবে দীনের আহ্বানে সাড়া দানের মাধ্যমে হোক।

আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টা কোনো নতুন কিছু নয়; বরং এ গ্রন্থে কালের সেই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো সংকলন ও গ্রন্থনা করা হয়েছে– যা উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে। যা পশ্চিমাঞ্চলে ইসলামী রাজনীতির মেরুকরণে

বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করেছে। সুতরাং আমার এই চেষ্টা যদি কল্যাণকর হয় তবে তা একমাত্র আল্লাহর তাওফীকেই হয়েছে। যদি আমি কোনো ভুল করে থাকি, তবে আমাকে অবহিত করলে আমি অবশ্যই আমার বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেবো। এ গ্রন্থের সমালোচনা, পর্যালোচনা এবং পরিমার্জন ও পরিশোধনের দ্বার সবার জন্যই উন্মুক্ত।

## এই গ্রন্থ রচনার মৌলিক উদ্দেশ্য

ক. এ কথা প্রমাণ করা যে, আমাদের দেশের ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি সুন্নী ধারা তথা নবী কারীম সা. ও তার সাহাবীগণ যে ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন– তার আলোকেই রচিত ও প্রচারিত। শিয়া ও খারেযিদের প্রচলিত ধারা নয়।

খ. বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থা ও পরিস্থিতি, রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি, পতনের কারণ, সারাজাহানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার কর্মরীতি এবং ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষেত্রে আল্লাহর রীতিনীতি জানার মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের পথ সহজতর করা।

গ. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা-বিশ্বাস অনুধাবন করাকে গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেওয়া। জাতির আগামী প্রজন্মকে এরই আলোকে গড়ে তোলা। রাফেযিদের ধ্যান-ধারণার প্রকাশকরতঃ কুরআন-সুন্নাহ ও জ্ঞানী আলেমসমাজের সর্বসম্মত মতের পরিপন্থী তাদের ভ্রান্ত দিকগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া। (যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই তাদের বিকৃত চিন্তা-চেতনার বিষছোবল থেকে বেঁচে থাকতে পারেন।)

ঘ. সংস্কারের মানসিকতা সম্পন্ন কতিপয় মুসলিম চিন্তাশীল নেতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরা। যেমন মরক্কোয় মুঈয বিন বাদিশ ও তামীম বিন মুঈয, পূর্বে নূরুদ্দীন মাহমূদ ও সালাহউদ্দীন আইয়ুবী। যাতে মুসলিম প্রজন্ম তাদের জীবনচরিত পাঠ করে সবিশেষ উপকৃত হতে পারে। এ ইতিহাস জানতে পারেন যে, তারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

ঙ. ইসলামি গ্রন্থাগারগুলোকে নিরেট ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস ও সুষ্ঠু চিন্তা-চেতনা থেকে রচিত গ্রন্থাদি উপহার দিয়ে সমৃদ্ধ করা। যাতে পাঠকবৃন্দ পাশ্চাত্যের ইসলামবিদ্বেষী মহল কর্তৃক ইসলামি আদর্শ ও ইতিহাস বিকৃত করার ঘৃণ্য মানসিকতা থেকে রচিত রচনাসম্ভার সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকতে পারে।

এ বইটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

**প্রথম অধ্যায় : উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে শিয়া রাষ্ট্র**
এ অধ্যায়ে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। যথা :

**প্রথম পরিচ্ছেদ : শিয়াদের শাব্দিক পরিচয়**
এক. শিয়া শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ
দুই. রাফেযীদের পরিচয়
তিন. তাদেরকে এই নামে নামকরণের কারণ
চার. শিয়া সম্প্রদায়ের সূচনা

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিয়াদের গুরুত্বপূর্ণ দল-উপদলের পরিচয়**
এক. নাসিরিয়্যাহ ও তাদের ভ্রান্ত আকিদাসমূহ
দুই. শিয়া ইসনা আশারিয়্যাহ
-বর্তমান যুগে শিয়া ইসনা আশারিয়ার কার্যক্রম
-বর্তমান সময়ের শিয়া ইমাম ও তার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র
-শায়েখ মুসা জারুল্লাহর অভিজ্ঞতা
তিন. শিয়া ইসমাইলিয়া
ক. উম্মাহর ওপর বাতেনিদের মারাত্মক প্রোপাগাণ্ডা
খ. বাতেনিদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উত্তর আফ্রিকায় বাতেনী মতবাদের দাঈ বা প্রচারকগণ**

**চতুর্থ পরিচ্ছেদ : প্রথম রাফেযি শিয়া খলিফা উবায়দুল্লাহ মাহদী**

**পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ইমাম মাহদীর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা-বিশ্বাস**
-নাম ও বৈশিষ্ট্য
-আবির্ভাবের স্থান
এক. ইমাম মাহদি সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসে তাওয়াতুর।
দুই. মাহদি সম্পর্কিত হাদিস অস্বীকারকারী এবং তাদের মত খণ্ডন।

**দ্বিতীয় অধ্যায় : উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার অধিবাসীদের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ**
এ অধ্যায়ে আটটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। যথা:
**প্রথম পরিচ্ছেদ : তারাবলুসে হাওয়ারা গোত্রের বিদ্রোহ**

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বারাকা অভিমুখে উবায়দিয়াদের অভিযান
-উবায়দিয়াদের ওপর বারাকাবাসীর বিদ্রোহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উবায়দিয়াদের বিরুদ্ধে আবু ইয়াযীদ খারেযির অভিযান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : রাফেযীদের দ্বিতীয় খলিফা আল-কায়িম বি আমরিল্লাহ আবুল কাসেম নাযযার ইবনে উবায়দুল্লাহ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : উত্তর আফ্রিকায় শিয়া রাফেযিদের তৃতীয় খলিফা আল-মানসূর বি নাসরিল্লাহ আবু তাহের ইসমাঈল

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আল মুঈয লি দীনিল্লাহ আবু তামীম সাদ
-মিসর অভিমুখে মুঈযের সফর

সপ্তম পরিচ্ছেদ : উত্তর আফ্রিকায় উবায়দিয়াদের কৃত অন্যায়-অপরাধসমূহ

অষ্টম পরিচ্ছেদ : আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শী আলেমদের গৃহীত পদক্ষেপ ও কৌশলসমূহ
-আবু উসমান সাদ আল-হাদ্দাদের মুনাযারা বা বিতর্ক

তৃতীয় অধ্যায় : সনহাজি বা জায়নবাদী সাম্রাজ্য
এ অধ্যায়ে ছয়টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। যথা :

প্রথম পরিচ্ছেদ : আবুল ফুতূহ ইউসুফ বিন জিরি বিন মুনাদ বিন মানকূশ সনহাজি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুঈয বিন বাদিশ সনহাজি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উত্তর আফ্রিকার দিকে বনী হিলাল, বনী সুলাইম ও অপরাপর আরব সম্প্রদায়ের অভিযান

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মুঈয বিন বাদিশ ও আরব গোত্রসমূহের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মুঈযের সন্তানাদি ও দৌহিত্রগণ
এক. আমীর তামীম বিন মুঈয
দুই. আমীর ইয়াহইয়া বিন তামীম বিন মুঈয বিন বাদিশ
তিন. আমীর আলী বিন ইয়াহইয়া বিন তামীম বিন মুঈয

চার. আমীর হাসান বিন আলী বিন ইয়াহইয়া বিন তামীম
ক. আমীর হাসান বিন আলী সনহাজির যুগে তারাবলুসের গভর্নর
খ. রজার কর্তৃক তারাবলুস আক্রমণ
গ. তারাবলুসে দুর্ভিক্ষ

**ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : উত্তর আফ্রিকায় জিরি সাম্রাজ্য পতনের কারণসমূহ**
-কায়রাওয়ান ও মাহদিয়ায় জিরি বংশের শাসকবৃন্দ।

**চতুর্থ অধ্যায় : উবায়দিয়া সাম্রাজ্য পতনের কারণসমূহ**
এ অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। যথা :

**প্রথম পরিচ্ছেদ : উবায়দিয়া সাম্রাজ্য পতনের কারণসমূহ**

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ**
-সিরিয়া ও মিসরীয় অঞ্চলসমূহে ঐক্যের সুবাতাস
-সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের ইন্তিকাল

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী**
ক. মহামান্য বিচারপতি ও তার ইন্তিকাল
খ. মহান বিজেতা সুলতান সালাহউদ্দীনের ইন্তিকাল
গ. সুলতান সালাহউদ্দীনের জীবনের বিশেষ দিকসমূহ
ঘ. সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহ.-কে নিয়ে রচিত মর্মস্পর্শী শোকগাথা
ঙ. সুলতান সালাহউদ্দীন রহ.-এর হৃদয়স্পর্শী মৃত্যুসংবাদ

### আলোচনার সারাংশ

পরিশেষে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যাশা করি, তিনি যেন এই কাজটিকে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে কবুল করেন। অধমকে এর প্রতিটি বর্ণের সাওয়াব দান করেন এবং নেকির পাল্লা ভারি করেন। সর্বোপরি এই কাজটি শেষ করার জন্য যারাই যেভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে তিনি উত্তম বিনিময় দান করেন। আমিন!

হে আল্লাহ! আপনি পূতঃপবিত্র সুমহান। সকল প্রশংসা আপনারই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই। আপনার কাছেই তাওবা করি। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাআলার জন্য-এটাই আমাদের চিরন্তন দাবি।

*ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি*

# প্রথম অধ্যায়
# উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের শিয়া রাষ্ট্র

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### শিয়াদের পরিচয়

- শিয়া (الشيعة) শব্দের আভিধানিক অর্থ

আল্লামা জাওহারী রহ. বলেন, شيعة الرجل অর্থ ব্যক্তির অনুসারী ও ভক্তবৃন্দ। شَايَعَه বলা হয় এই অর্থেই। যেমন الولي শব্দ থেকে وَالَاهُ বলা হয়। تَشَيَّعَ الرَّجُلُ অর্থ, সে শিয়া মতাদর্শী হওয়ার দাবি জানালো।

تَشَايَعَ الْقَوْمُ অর্থ, লোকেরা শিয়া মতাদর্শী হলো। আর প্রত্যেক এমন জাতি, যাদের একাংশ অপর অংশের রায় ও সিদ্ধান্ত মেনে চলে- পরিভাষায় তাদেরকে شِيَعٌ বলা হয়। (আস-সিহাহ্, আল্লামা জাওহারী রহ. কৃত; লিসানুল আরব : شيع ধাতু)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ.

যেমন-তাদের সতীর্থদের সাথেও এরূপ করা হয়েছে (সূরা সাবা : ৫৪)

অর্থাৎ তাদের ন্যায় পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সাথে।

'আল-মিসবাহুল মুনীর' অভিধানে এসেছে, الشيعة অর্থ, অনুসারী ও সহযোগী। আর প্রত্যেক এমন গোষ্ঠি যারা কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছে- তাদেরকে شِيَعٌ বলা হয়। (আল-মিসবাহুল মুনীর : شيع ধাতু)

পরবর্তীতে শিয়া শব্দটি একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের উপাধি রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। الشيعة এর বহুবচন, اَلشِّيَعُ যেমন, سِدْرَةٌ এর বহুবচন, سِدَرٌ।

اَلْأَشْيَاعُ হচ্ছে বহুবচনের বহুবচন।

বলা হয়, شيعت رمضان بست من شوال অর্থাৎ আমি রমযানের রোযা রাখার পরপরই শাওয়ালের ছয়টি রোযা রেখেছি।

সুতরাং আভিধানিক দিক থেকে الشيعة শব্দের অর্থ, জাতি, সঙ্গী, অনুসারী ও সহযোগী।

কুরআনে কারীমের কয়েকটি আয়াতে উক্ত অর্থেই شيعة শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۖ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَ هٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ.

সেখানে তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তার নিজ দলের এবং অন্যজন তার শত্রু দলের। অতঃপর যে তার নিজ দলের সে শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল।[৪]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন,

وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ.

আর ইবরাহীম নূহপন্থীদেরই একজন ছিলো।[৫]

প্রথম আয়াতে الشيعة শব্দের দ্বারা القوم বা জাতি উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় আয়াতে শব্দটি এমন অনুসারীদের দিকে ইঙ্গিত করছে, যারা একই রায় ও আদর্শে ঐক্যমত পোষণ করে এবং সবাই মিলে একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৬]

---

[৪] সূরা কাসাস : ১৫।
[৫] সূরা সাফফাত : ৮৩।
[৬] আল মিসবাহুল মুনীর : ১ : ৩২৯।

## এক. শিয়া (الشيعة) শব্দের পারিভাষিক অর্থ

الشيعة শব্দটি পারিভাষিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র অর্থ প্রদানের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। শব্দটি এমন দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– যারা মনে করে, ইমামত বা নেতৃত্ব এমন কোনো বিষয় নয়, যার দিকে সাধারণ মানুষের নযর দিতে হবে বা তাদের হস্তক্ষেপে তা বাস্তবায়িত হবে; বরং ইমামত হচ্ছে দীনের রুকন এবং ইসলামের মূল ভিত্তি।

কোনো নবীর জন্য ইমাম বা নেতা নির্বাচনের ব্যাপারটি ভুলে যাওয়া বা তা জনগণের হাতে অর্পণ করে যাওয়া জায়েয নয়; বরং তার জন্য জনগণের (পরবর্তী) ইমাম নির্ধারণ করে যাওয়া আবশ্যক।[৭]

আল্লামা আবুল হাসান আশআরী রহ. শিয়া মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

و إنما قيل لهم الشيعة : لأنهم شايعوا عليا – رضوان الله عليه – و يقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم.

তাদেরকে শিয়া বলা হয়, কারণ তারা হযরত আলী রা. কে অনুসরণ করে এবং তাকে রাসূলে কারীম সা.–এর সকল সাহাবীর উর্ধ্বে মনে করে।[৮]

হযরত আবদুর রহমান ইবনে খালদূন রহ. বলেন, জেনে রাখুন! الشيعة শব্দের আভিধানিক অর্থ, সঙ্গী ও অনুসারী। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ফুকাহায়ে কেরাম ও কালামশাস্ত্রবিদদের মতে- শব্দটি হযরত আলী রা. এর বংশধর ও অনুসারীদের জন্য প্রযোজ্য।

শিয়াদের সর্বসম্মতবাদী মত হলো, ইমামত বা নেতৃত্ব এমন কোনো বিষয় নয়; যার দিকে সাধারণ মানুষের নযর দিতে হবে বা তাদের হস্তক্ষেপে তা প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত হবে; বরং ইমামত হচ্ছে দীনের রুকন ও ইসলামের মূল ভিত্তি।

কোনো নবীর জন্য ইমাম নির্বাচনের ব্যাপারটি ভুলে যাওয়া বা তা জনগণের হাতে ছেড়ে দেওয়া জায়েয নয়; বরং তার জন্য জনগণের (পরবর্তী) ইমাম

---

[৭] দেখুন, মুকাদ্দিমায়ে ইবনে খালদূন : ১৯৬-১৯৭।
[৮] মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন : ১ : ৬৫।

নির্বাচন করে যাওয়া আবশ্যক। (পরবর্তী ইমাম) ছোট বড় যাবতীয় পাপ ও গোনাহ থেকে মুক্ত থাকবেন। (নাউযুবিল্লাহ)

তাদের মতে, নবী কারীম সা. হযরত আলী রা.-কে (পরবর্তী ইমামকে) নির্বাচন করেছেন এমন ভাষ্যের দ্বারা– যা কেবল তারাই তাদের মতাদর্শের আলোকে প্রচার-প্রসার করেন এবং এর ওপর নির্ভর করে থাকেন। বড় বড় শরীয়তবেত্তা ও কুরআন-সুন্নাহর পণ্ডিত ইমামগণ সে সম্পর্কে অবগত নন। তাদের প্রচারিত ওইসব ভাষ্যের অধিকাংশই হলো মনগড়া, বানোয়াট এবং বিভ্রান্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংবলিত।[৯]

## দুই. رافضة বা রাফেযীদের পরিচয়

الرفض এর শাব্দিক অর্থ, পরিত্যাগ করা, বর্জন করা। বলা হয়, رفضه- يرفض- رفضا অর্থ, সে তাকে পরিত্যাগ করলো বা করবে।

ইমাম আসমায়ী রহ. বলেছেন, তাদেরকে এই নামে নামকরণের কারণ হলো, তারা হযরত যায়েদ ইবনে আলী রা.-কে পরিত্যাগ করেছে।[১০]

সুতরাং رفض এর আভিধানিক অর্থ হলো, পরিত্যাগ করা এবং কোনো ব্যাপার বা বিষয় থেকে মুক্ত থাকা।

পরিভাষায় শিয়াদের একটি দলকে রাফেযী বলা হয়। তাদেরকে এ নামে ডাকার কারণ হলো, তারা হযরত যায়েদ ইবনে আলী রা.-কে পরিত্যাগ করেছে।

ইমাম আসমায়ী রহ. বলেন, শিয়ারা তার হাতে বায়আত হয়েছিল। এরপর তারা তাকে বললো, আপনি দুই শায়খ (হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রা.) থেকে বিমুখ হোন। নচেৎ আমরা আপনার সাথে বিবাদ-বিতণ্ডা করবো। তিনি তা অস্বীকার করলেন। বললেন, তারা আমার দাদাতুল্য। সুতরাং আমি তাদের থেকে বিমুখ হতে পারবো না। তখন তারা তাকে পরিত্যাগ করে। অন্যদেরকেও তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তখন থেকেই তারা ইতিহাসে 'রাফেযী' নামে খ্যাত হয়ে যায়।[১১]

---

[৯] মুকাদ্দিমায়ে ইবনে খালদূন : ১৯৬-১৯৭।

[১০] আস-সিহাহ, জাওহারী : ২: ১০৭৮; লিসানুল আরব : ৭ : ১৫৭, ر-ف-ض মূল ধাতু।

[১১] লিসানুল আরব : ৭ : ১৫৭।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ রহ. বলেন, একবার আমি আমার পিতা হযরত আহমদ বিন হাম্বল রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাফেযী কারা? তিনি উত্তর দিলেন, যারা হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রা.-কে গালি দেয় এবং ভর্ৎসনা করে।[১২]

## তিন. তাদেরকে এই নামে নামকরণের কারণ

একবার হযরত যায়েদ বিন আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব রা. বাদশাহ হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের দরবারে আসেন। বাদশাহ এমন লোকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, যারা হযরত আবু বকর রা. ও উমর রা.-কে গালিগালাজ করে। যায়েদ রা. তাদেরকে নিষেধ করলেন। তখন তারা তাকে পরিত্যাগ করলো। তার সাথে তখন ২০০ ঘোড়সওয়ার ছিল।

যায়েদ বিন আলী রা. তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আমাকে পরিত্যাগ করছো? তারা বললো, হ্যাঁ। তখন থেকেই ইতিহাসে তারা এই নামে খ্যাত হয়। এটি ছিলো হিজরী ১২২ সালের ঘটনা।[১৩]

হিজরী ১২২ সনে সংঘটিত ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে বলেছেন,

এই সনে হযরত যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব রা. এর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। হত্যাকাণ্ডের কারণ ছিলো, তিনি যখন কুফাবাসীর বায়আত গ্রহণ করেন তখন তাদেরকে এই বছরের শুরুতে জিহাদে যাওয়ার এবং তার পক্ষে রক্তপণ নেওয়ার নির্দেশ দেন। ফলে লোকেরা তার পক্ষে রক্তপণ নেওয়া শুরু করে। তখন সুলাইমান ইবনে সুরাকা নামের এক লোক ইরাকের নায়েব ইউসুফ ইবনে উমরের কাছে গিয়ে যায়েদ ইবনে আলির বিরুদ্ধে এমন সংবাদ প্রদান করে, যা ছিলো তার জন্যে উদ্বেগজনক।

তখন ইউসুফ ইবনে উমর তাকে ডেকে পাঠান এবং আসার জন্য ভীষণ পীড়াপীড়ি করেন।

শিয়ারা এ ঘটনা জানতে পেরে হযরত যায়েদ বিন আলীর কাছে সমবেত হয়। তাকে জিজ্ঞাসা করে, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। হযরত আবু বকর ও

---

[১২] মানাকিবে ইমাম আহমাদ, ইবনুল জাওযী রহ. : ১৬৫।
[১৩] ইতিকাদাতু ফিরাবিল মুসলিমীনা ওয়াল মুশরিকীনা : ৫২।

উমর রা.-এর ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

তিনি বললেন, আল্লাহ তাদের উভয়কে ক্ষমা করুন। আমি আমার পরিবারের কাউকে তাদের ব্যাপারে মন্দ কিছু বলতে শুনিনি। আর আমিও তাদের ব্যাপারে ভালো কথাই জানি। আমাদের কাছে তাদের কুফরী করার কথা আসেনি। তারা ক্ষমতা লাভ করে ইনসাফ করেছেন এবং কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করেছেন।

তারা বললো, তাহলে আপনি কেন আহলে বাইতের নামে রক্তপণ প্রত্যাশা করেন?

তিনি বললেন, মানুষের মাঝে এর জন্য একমাত্র আমিই বেশি হকদার। কিন্তু মানুষ আমাদেরকে পরাহত করেছে এবং রক্তপণ নেওয়া থেকে বিরত রাখছে।

লোকেরা বললো, তাহলে কেন আপনি ক্ষমতাসীনদের সাথে লড়াই করবেন? তিনি বললেন, এখনকার লোকেরা পূর্ববর্তীদের মতো নয়; এরা তো মানুষের ওপর জুলুম করছে। নিজেদের ওপরও জুলুম করছে। আমি তাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নতের দিকে এবং সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা ও বিদআত মূলোৎপাটনের দিকে ডাকছি। সুতরাং যদি তোমরা আমার কথা শোনো তবে তা তোমাদের ও আমাদের উভয়ের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি অস্বীকার করো তবে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য আমি দায়ী নই।

তখন তারা তাকে পরিত্যাগ করে। তার থেকে দূরে সরে যায়। তার বায়আত পরিহার করে। সেদিন থেকেই তারা ইতিহাসে রাফেযী নামে নামান্তরিত হয়।[১৪]

উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা শিয়াদেরকে রাফেযী নামে নামকরণের কারণ পরিস্ফুট হয়ে গেলো। অর্থাৎ তারা হযরত যায়েদ বিন আলী রা.-কে পরিত্যাগ করেছিল। যার অন্যতম কারণ ছিলো, তিনি তাদেরকে হযরত আবু বকর ও উমর রা.-কে গালিগালাজ করতে বারণ করেছিলেন।

বর্তমানে শিয়া মতাদর্শীদের মাঝে যারাই সীমালঙ্ঘন করে এবং সাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া বৈধ মনে করে তাদেরকেই রাফেযী নামে অভিহিত করা হয়।

[১৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯ : ৩৭০-৩৭১।

## চার. শিয়া সম্প্রদায়ের সূচনা

ইতিহাসের রচনাসম্ভার থেকে জানা যায়, উম্মাহর মাঝে সর্বপ্রথম শিয়া চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শের বীজ রোপণ করে এক ইহুদী। তার নাম ছিলো, আবদুল্লাহ বিন সাবা। সে নিজেকে মুসলিম হিসেবে প্রচার করতো এবং ইসলামের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াতো। সময়টি ছিলো ইসলামী ইতিহাসে তৃতীয় খলিফা-খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান বিন আফফান যিন নূরাইন রা. এর খেলাফতকাল। ইবনে সাবা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মদীনা, বসরা, কূফা, মিসর ও সিরিয়ায় ছুটে বেড়িয়েছে। সে যেখানেই গিয়েছে সেখানেই ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। মুসলমানদের ভেতরে বিভেদ উস্কে দিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধানোর ষড়যন্ত্র করেছে।

ইবনুস সাওদা নামে পরিচিত ইবনে সাবা নামক এই লোকটি মূলত ইহুদীবাদের দুটি মূল প্রোপাগাণ্ডা বাস্তবায়নের মিশনে নেমেছিল।

এক. সে দাবি করত, নবী কারীম সা. পুনরায় আবির্ভূত হবেন। সে বলতো, ওই ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে দাবি করে হযরত ঈসা আ. পুনরায় আগমন করবেন। অথচ সে মুহাম্মদ সা. পুনরায় আবির্ভূত হবেন- এ কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অথচ আল্লাহ তাআলা নিজেই ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ.

যিনি আপনার প্রতি কুরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন।[১৫]

দুই. সে দাবি করতো, প্রত্যেক নবীর একজন অসী বা অভিভাবক থাকে। আর আলী রা. হলেন মুহাম্মদ সা.-এর অসী। মুহাম্মদ সা. হলেন সর্বশেষ নবী। আর আলী রা. হলেন সর্বশেষ অসী। আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-এর অসী কে অস্বীকার করে, তার অধিকার কেড়ে নেয় এবং উম্মাহর দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়– তার চেয়ে বড় জালেম আর কে আছে?

ইবনে সাবা তার অনুগত শিষ্য ও অনুচরদেরকে বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রে এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেরণ করে, যাতে তারা মুসলিম গভর্নরদের দোষ-ত্রুটি, তাদের ব্যাপারে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ-আপত্তির কথা লিপিবদ্ধ করে এবং

---

[১৫] সূরা কাসাস : ৮৫।

সেগুলো খলিফাতুল মুসলিমীনের কাছে পাঠায়। সে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে উদ্বুদ্ধ করে। যাতে জনসাধারণ তাদের সাথে একাত্বতা পোষণ করে এবং তাদের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে।

তার টার্গেট ছিলো, গভর্নরদের নামে লিখিত এসব বানোয়াট চিঠিপত্র যখন খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান রা.-এর হাতে পৌঁছবে তখন জনসাধারণ ও খলিফা-গভর্নরদের মাঝে মনোদ্বন্দ্ব ও বিরোধ সৃষ্টি হবে।

এভাবে সে বিভিন্ন ইসলামী শহরগুলোতে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলে। বসরা, কূফা ও মিসরবাসী খুব দ্রুতই তার এই পাঁতা ফাঁদে পা দেয়। এর সবচে নিকটতম ফলাফল এই হয় যে, খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান ইবনে আফফান রা. কে অন্যায় ও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ইসলামের ইতিহাসে ইবনে সাবা সর্বপ্রথম খলিফার বিদ্রোহ করে এবং নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

তিনি আরও লিখেছেন, ইসলামত্যাগী রাফেযিদের মূল উৎপত্তি ও উদ্ভব মুনাফিক ও নাস্তিক কাফেরদের থেকেই। কেননা নাস্তিক ইবনে সাবা-এর উদ্ভাবক। সে হযরত আলী রা.-কে ইমাম দাবি করেছে। তার ইমামতের পক্ষে শরয়ী নস বা ভাষ্যের কথা ব্যক্ত করে এবং তার নিষ্পাপতার কথা দাবি করে বাড়াবাড়ি করেছে।[১৬]

তিনি আরও উল্লেখ করে বলেছেন, মুনাফিক ও নাস্তিক ইবনে সাবা ইসলামের ভেতরে বিভেদ ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে চেয়েছে। বোয়েলস খ্রিস্টানদের নিয়ে যে প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছে সে মুসলমানদেরকে নিয়ে অনুরূপ প্রোপাগাণ্ডা চালাতে চেয়েছে। কিন্তু সে বোয়েলসের ন্যায় খুব বেশি সফল হতে পারেনি। কেননা বোয়েলসের সফলতার রহস্য ছিল খ্রিস্টানদের শক্তি ও বুদ্ধির দুর্বলতা। কেননা হযরত ঈসা মাসীহ আ.-কে উর্ধ্ব আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার পর তার এমন অধিক অনুসারী ছিল না, যারা তার দীন শিখবে। দীনি বিধিবিধান পরিপালন করবে। ফলত বোয়েলস যখন খ্রিষ্টধর্ম বিকৃত করে বানোয়াট নতুন তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করল তখন অধিকাংশ মানুষই তাকে অনুসরণ করলো, তার কথা বিশ্বাস করলো। তারা বরং ধর্মের নামে বাড়াবাড়িমূলক কর্মকাণ্ডকেই আপন করে নিল। তখন সত্যপন্থীরা তাদের বিরোধিতা করেন এবং তাদের মতাদর্শ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এতে রাষ্ট্রের অধিপতি তাদের

---

[১৬] মাজমূআতুল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া রহ.: ৪: ৪৩৫।

কয়েকজনকে হত্যা করে। ফলত তাদের কয়েকজন গির্জা ও উপাসনালয়গুলোতে আশ্রয় নিয়ে একাকী সন্ন্যাসবাদের জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। উম্মাহর বিষয়ে মহান ঐশী নীতি হলো, এই উম্মাহর একটি দল সদা-সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ফলে কোনো মুলহিদ বা সত্যবিদ্বেষী কেউ এই উম্মাহর ওপর চেপে বসতে পারবে না এবং সত্যের বুলি আউড়িয়ে মনগড়া কোনো বিষয়ও এই দীনে প্রবেশ করাতে পারবে না। কিন্তু কেউ ভ্রষ্ট লোকদের মতাদর্শ গ্রহণ করে বিভ্রান্ত হলে তার কথা ভিন্ন।[১৭]

ইবনে সাবার কূটনামি, ষড়যন্ত্র, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার গৃহীত প্রোপাগাণ্ডার কারণে কোনো ঈমানদার ব্যক্তি তার পক্ষে ভালো কোনো কথা বলেনি। উপরন্তু তারা তাকে এই বলে স্মরণ করেছে যে, ইসলামের ইতিহাসে সে-ই সর্বপ্রথম মুসলমানদের মাঝে হযরত আবু বকর ও উমর রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও বিষোদ্গার ছড়িয়েছে। কেউ কেউ তার ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেছেন, চরিত্রগত দিক দিয়ে সে ছিল পাপাচারী, মিথ্যুক, কপটচারী, নাস্তিক, নিজে পথভ্রষ্ট এবং অন্যদেরকে ভ্রষ্টকারী।

আল্লামা ইবনে হাজার রহ. আবু ইসহাক ফারাযী রহ.–এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একবার সুওয়াইদ ইবনে গাফালা নামক এক ব্যক্তি হযরত আলী রা.–এর দরবারে প্রবেশ করে বললো, আমি একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি। তারা বসে বসে হযরত আবু বকর রা. ও হযরত উমর রা.-এর সমালোচনা করছিল। তারা মনে করে, আপনিও তাদের ব্যাপারে অনুরূপ মনোভাব পোষণ করেন।

তখন আলী রা. বলেন, আমার ও এই কালো খবীসের মাঝে কিসের তুলনা? এরপর বললেন, তাদের ব্যাপারে সুন্দর মনোভাব পোষণ না করলে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। তিনি তখন আবদুল্লাহ ইবনে সাবার নামে একটি পত্র লিখেন এবং তাকে মাদায়েনে চলে যাবার নির্দেশ দেন।

তিনি বললেন, সে যেন কখনো আমার সাথে একই শহরে অবস্থান না করে।

এরপর তিনি মিম্বারে দাঁড়ালেন। লোকেরা তার কাছে সমবেত হলো। তিনি দীর্ঘসময় পর্যন্ত হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রা. এর নামে গুণকীর্তন করলেন। সবশেষে তিনি বললেন, আমার কাছে কারো ব্যাপারে যেন এই অভিযোগ না আসে যে, সে হযরত আবু বকর ও উমর রা.-এর উপরে আমাকে

---

[১৭] মিনহাজুস সুন্নাহ : ৩ : ২৬১।

প্রাধান্য দেয়। যদি কারো নামে আমি এরূপ অভিযোগ শুনি তবে তাকে স্মরণকালের শ্রেষ্ঠ শাস্তি প্রদান করা হবে।[১৮]

কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত আলী রা. তাকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। এমনকি তরবারিও হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ তার পক্ষে সুপারিশ করলে তিনি বললেন, সে যেন কিছুতেই আমার সাথে একই শহরে অবস্থান না করে। তখন তিনি তাকে মাদায়েনের দিকে পাঠিয়ে দেন।[১৯]

হযরত ইবনে আসাকির রা. আবুল জুলাসাই রহ. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রা.-কে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি, তুমি ধ্বংস হও। আল্লাহর কসম! আমাকে এমন কোনো রহস্যজ্ঞান দান করা হয়নি, যা কোনো মানুষের কাছে গোপন রাখা হয়েছে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে আরও বলতে শুনেছি, নিশ্চয় কিয়ামতের আগে ত্রিশজন মিথ্যা নবীর দাবিদার আত্মপ্রকাশ করবে। আর তুমি তাদের একজন।[২০]

উক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আলী রা. ইবনে সাবাকে পাপাচারী আখ্যায়িত করেছেন। এমনকি তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাকে হত্যা না করে মাদায়েনে নির্বাসিত করে দিয়েছেন এবং তাকে অন্যতম মিথ্যুক আখ্যায়িত করেছেন।

হাফেয যাহাবী রহ. ইবনে সাবা সম্পর্কে বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা হচ্ছে চরমপন্থী নাস্তিক। সে নিজে পথভ্রষ্ট এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে থাকে। আমি ধারণা করছি, আলী রা. তাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছেন।

আল্লামা জুযাজানী রহ. বলেন, সে মনে করতো, কুরআনের নয় অংশের একাংশ প্রকাশিত হয়েছে। বাকি অংশ সম্পর্কে হযরত আলী রা. জ্ঞান রাখেন। আলী রা. এই প্রোপাগাণ্ডার কথা জানতে পেরে তাকে এরূপ মন্তব্য করতে নিষেধ করে দেন।[২১]

---

[১৮] দেখুন, তালবীসে ইবলিস, ইবনুল জাওযী রহ.: ১০০-১০১।
[১৯] তারিখে দিমাশক, ইবনে আসাকির রহ.: ৭: ৩৪।
[২০] তারিখে দিমাশক : ৬ : ৩২।
[২১] মিযানুল ইতিদাল : ২: ৪২৬।

হাফেয ইবনে হজর আসকালানী রহ. ইবনে সাবার নিন্দামূলক বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাবার কুকীর্তির কথা ইতিহাসে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ। আল্লাহর শোকর, তার থেকে বর্ণিত কোনো হাদিস নেই। তার অনুসারীদেরকে সাবায়ী বলা হয়। তারা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)-কে খোদা মনে করতো। আলী রা. স্বীয় খিলাফতকালে তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছেন।

আমার মতে, কাউকে আগুনে পুড়িয়ে মারা শরয়ীভাবে নিষিদ্ধ। তাদেরকে তরবারি দিয়ে হত্যা করাই যথেষ্ট ছিল।[২২]

উক্ত আলোচনা থেকে পাঠকগণ ভালোমতো বুঝে গেছেন যে, এই ইহুদী ইবনে সাবাই সর্বপ্রথম শিয়া সম্প্রদায়ের চিন্তা-চেতনা বিস্তার করেছে। সে-ই নবী কারীম (সা.)-এর পুনরায় আবির্ভাব হওয়া, তার কোনো অসী থাকার কথা দাবি করেছে। তার অনুসারীরা এসব ভ্রান্ত কথাবার্তা ইসলামী বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। আর এক্ষেত্রে স্বল্পজ্ঞানের বুর্বক গোষ্ঠী হয়েছে তাদের সহচর।[২৩]

ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন, সর্বযুগে ইসলামবিদ্বেষীরাই ইসলামের সবচে বেশি ক্ষতি করেছে। এর অন্যতম কারণ ছিলো, কুরআন-সুন্নাহর নীতি-আদর্শকে পাশ কাটিয়ে তারা সবসময় নিজেদের মনগড়া স্বার্থান্ধ চিন্তা-চেতনা বিস্তারের অপচেষ্টায় মেতে উঠতে চেয়েছে।

***

[২২] লিসানুল মিযান : ৩: ১২২-১২৩।
[২৩] ইবনে সাবা হাকীকাতুন লা খয়ালুন, সাদী আল হাশেমী রহ.।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## শিয়াদের গুরুত্বপূর্ণ দল-উপদলের পরিচয়

ঐতিহাসিকগণ শিয়াদের বিভিন্ন দল-উপদল নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমি আমার আলোচনায় কেবল তাদের নামগুলোই উল্লেখ করবো। বিস্তারিত আলোচনা করবো না। তবে বাতেনী সম্প্রদায়ের কথা সবিস্তারে আলোচনা করবো। কারণ, তারা উত্তর আফ্রিকায় রাজত্ব করেছে। আর ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করবো। কারণ, বর্তমানে তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা রয়েছে। শিয়াদের মাঝে এখন তারাই বেশি শিয়া মতবাদ প্রচার-প্রসার করে থাকে।

নাসিরিয়্যাহ সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করবো। কারণ, সাবায়ী সাম্রাজ্যের সূচনাকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত তারা সিরিয়ায় রাজত্ব চালিয়ে আসছে।

উলামায়ে কেরাম শিয়াদের যেসব দল-উপদলের কথা উল্লেখ করেছেন, তার অন্যতম হলো, সাবায়ী, গারাবিয়্যাহ, বায়াতিয়া, হাশেমিয়া, খিতাবিয়্যাহ, আলাবাইয়্যাহ, কায়সানিয়্যাহ, যায়দিয়্যাহ জারদুভিয়্যাহ, সুলাইমানিয়্যাহ, সালিহিয়্যাহ, বাতারিয়্যাহ। এসব দল-উপদলের মাঝে কিছু আছে এমন- যারা খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে। আর কিছু আছে, তুলনামূলক কম বাড়াবাড়ি করে। কেউ তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে সে ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ. রচিত মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, আল্লামা শাহরাস্তানী রহ. রচিত আল-মিলাল ওয়াননিহাল এবং আল্লামা আবু তাহের বাগদাদী রহ. রচিত 'আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক' অধ্যয়ন করতে পারে।

### এক. নাসিরিয়্যাহ

এই দলটিকে শিয়াদের মাঝে সবচে বেশি উগ্রপন্থী গণ্য করা হয়। তারা নিজেদেরকে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নাসীর আল মানীরীর দিকে সম্পৃক্ত করে। এরা শিয়া রাফেযিদের ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম দল। হযরত আলী রা.-এর ব্যাপারে এরা বাড়াবাড়িমূলক চিন্তা লালন করে। এমনকি তারা তাকে ইলাহ বা খোদাও সাব্যস্ত করে। (নাউযুবিল্লাহ!)

তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। গোড়া খ্রিস্টানদের সহায়তা করেছে এবং বর্বর তাতারবাহিনীর পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এমনকি তারা আল্লাহর নাম ও

নিদর্শনাবলীর বিরুদ্ধাচারণ করেছে। তারা আল্লাহর বাণী ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদিস বিকৃত করেছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-কে একবার নাসিরিয়্যা সম্প্রদায়ের কিছু লোক প্রশ্ন করলে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা নিম্নরূপ-

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। নাসিরিয়্যাহ নামে পরিচিত এসব লোকেরা এবং কারামেতা বাতিনিয়্যা সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকেরা ইহুদী-নাসারাদের চেয়েও বেশি কট্টর কাফের। তারা বরং অন্যান্য মুশরিকদের চেয়েও অধিক গোড়া মুসলিমবিদ্বেষী। উম্মতে মুহাম্মাদিয়্যার ক্ষতিসাধনে তারা কাফের যুদ্ধবাজদের চেয়েও অগ্রগামী। যেমন তাতারবাহিনী, ফরাসী বাহিনী ও অন্যান্যরা। কেননা, তারা মূর্খ-অজ্ঞ মুসলমানদের সামনে শিয়া মতবাদ প্রচার করে, নিজেদেরকে আহলে বাইতের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে প্রচার করে। অথচ বাস্তবে তারা আল্লাহ, তার রাসূল, তার কিতাবের ওপর ঈমান আনে না। তারা সৎ কাজের আদেশ করে না, মন্দ কাজ থেকে বারণ করে না। তারা পরকালীন সাওয়াব, শাস্তি, জান্নাত-জাহান্নাম মানে না, কোনো নবী-রাসূল এবং পূর্ববর্তী জাতি ও সম্প্রদায়কে বিশ্বাস করে না।

তারা বরং তাদের পরিচিত ইমামগণের থেকে কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্য উদ্ধৃত করে। তারা সেগুলোর মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দাবি করে যে, এগুলো বাতিনী ইলম। তারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলি নিয়ে যেসব শিরক করে তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এমনকি আল্লাহ ও রাসূলের কথা ও বাণী ভুল ব্যাখ্যা করায়ও তাদের কোনো গণ্ডি-সীমা নেই।

সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি আরও বলেছেন, আমাদের জানা আছে যে, সিরিয়া উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলো একমাত্র তাদের সহযোগিতার কারণেই খ্রিস্টানদের হস্তগত হয়েছে। তারা সর্বদা মুসলমানদের শত্রুদের সাথে আঁতাত রাখে। তাদের সবচে বড় বেদনার বিষয় ছিল, তাতার বর্বরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লাভ করা। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সবচে বড় শত্রুতা ছিল, তারা মুসলমান উদ্বাস্তু শিবিরের উপর খ্রিস্টানবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ ও রাসূলের এই শত্রুরা যেসময় সিরিয়ার উপকূল অঞ্চলে অধিক হারে বসবাস করতো, তখন তাদের সহায়তায় খ্রিস্টানরা ওইসব অঞ্চল হস্তগত করে নেয়। এরপর একইভাবে তারা পবিত্র বাইতুল মাকদিস ও অন্যান্য অঞ্চল দখল করে নেয়। এসব ক্ষেত্রে তাদের দূরভিসন্ধিমূলক চক্রান্তই মুসলমানদের সবচে বেশি ক্ষতি করেছে।

এরপর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের মাঝে নূরুদ্দীন শহীদ, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ও তাদের সহচরদের ন্যায় একদল জানবাজ মুজাহিদ তৈরি করে দেন। তারা খ্রিস্টানদের হাত থেকে নিজেদের উপকূলীয় অঞ্চল ছিনিয়ে নেন। পাশাপাশি তারা মিসর বিজয় করেন। তারা প্রায় দুশো বছর এসব অঞ্চলে ঝেঁকে বসেছিল। খ্রিস্টানদের সাথে তারা ঐক্য ও সমঝোতা করে নিয়েছিল। মুসলমানগণ তাদের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করে এসব শহর-নগর জয় করেন।

তাতারীবাহিনী এই দলের লোকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা না পেলে কিছুতেই কোনো মুসলিম শহরে প্রবেশ করতে পারতো না এবং বাগদাদ ও অন্যান্য মুসলিম শহরের শাসকদেরকে হত্যা করতে পারতো না।

মুসলমানদের কাছে তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। কখনো তাদেরকে ডাকা হয় 'মুলহিদ' কখনো ডাকা হয় 'কারামেতা' কখনো 'বাতিনিয়্যাহ' কখনো 'ইসমাঈলিয়্যাহ' কখনো খারমিয়া এবং কখনো 'মাহমারা'।

এসব নাম দ্বারা কখনো তাদের সমষ্টিকে বুঝানো হয়। আবার কখনো তাদের মধ্যকার বিশেষ কোনো শ্রেণিকে বুঝানো হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাদের ওপর হদ-কিসাস ও শাস্তি আরোপ করা বিরাট পুণ্যের কাজ এবং ঈমানী দায়িত্ব। নিরীহ-নিরস্ত্র মুশরিক ও আহলে কিতাবীদের সাথে যুদ্ধ করার চেয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করা মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করার ন্যায়। খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম আহলে কিতাবী কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার আগে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কেননা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষতির চেয়ে এদের ক্ষতির মাত্রা ও পরিমাণ বেশি। সুতরাং সাধ্যানুসারে তাদের প্রতিহত করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

অতএব কেউ তাদের ব্যাপারে কিছু জানলে তা গোপন করা জায়েয নেই; বরং তা ব্যাপকাকারে প্রচার-প্রসার করতে হবে। যাতে মুসলমানগণ তাদের প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে। আর এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশনা না মেনে চুপ করে বসে থাকাও কারো জন্য বৈধ নয়।

এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, যারা তাদের ক্ষতি ও চক্রান্ত রুখে দিতে এবং তাদেরকে সঠিক পথে পথ প্রদর্শন করতে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাবে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে এমন আজর ও প্রতিদান রয়েছে, যার পরিমাণ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।[২৪]

---

[২৪] মাজমূআতুল ফাতওয়া, ইবনে তাইমিয়া রহ. : ৩৫: ১৪৯-১৫০।

বর্তমানে এই নিকৃষ্ট দলটি আলাভী নামে পরিচিত। ফ্রান্স কর্তৃক সিরিয়া আক্রমণের সময় এরা উগ্রপন্থী খ্রিস্টানদের পক্ষাবলম্বন করে। ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তারের সাথে সাথে এরা তাদের সিরিয়ায় অধিষ্ঠিত করে দেয়। তারা যখন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দখল করে তখন আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শীদের ওপর নির্যাতনের এমন স্ট্রীম রোলার চালায়– যদরুণ শিশুরা বৃদ্ধে পরিণত হয়, নির্যাতনের ভয়াবহতা ও নিপীড়নের নির্মমতার কারণে গর্ভবতী গর্ভপ্রসব করে ফেলে। তারা আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শী নারীদের অপহরণ করে ইজ্জত লুণ্ঠন করে। নারী-পুরুষদেরকে কারান্তর করে। কার্যত তারাই সিরিয়ার শাসনভার হাতে তুলে নেয়। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাদের এসব অপকর্মের উপযুক্ত শাস্তি দেন এবং দীন ও শরীয়তের ধারক-বাহকদেরকে যথাযথ প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ করে দেন।

তারা পর্যায়ক্রমে লাজিক পর্বত, সিরিয়ার হেমাত ও হিমস, ইস্কান্দারিয়ার উপকূল, তারতূস, আদানা, বর্তমান তুরস্কের আতনা, কুর্দিস্তান ও অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে।[২৫]

## তাদের ভ্রান্ত আকিদাসমূহ

১. ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব রা.-কে ইলাহ বা সর্বেসর্বা মনে করা। তারা মনে করে, তিনি মেঘমালায় থাকেন, বজ্রধ্বনি হলো তার আওয়াজ। বিজলী হলো তার হাসি। এ কারণে তারা মেঘমালাকে খুবই তাযীম বা সম্মান করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করে, আলী রা. সূর্য বা চন্দ্রে বসবাস করেন।

২. পুনঃপ্রাণ সঞ্চার হওয়া– তাদের অন্যতম ভ্রান্ত বিশ্বাস। তাদের মতে যারা আলী রা.-এর ইবাদত করে না, তারা গাধা, ঘোড়া ও খচ্চরের আকৃতিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। আর যারা আলী রা. এর ইবাদত করে তথা তাদের মুমিনরা প্রতিজন সাতবার পুনর্জীবন লাভ করে। এরপর তারা তারকায় অবস্থান নেয়। যাতে সে পূতঃপবিত্রতা অর্জন করে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে।[২৬]

এ ধরনের আরো অনেক ভ্রান্ত আকিদা রয়েছে।

---

[২৫] দেখুন, আল মুজায ফিল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিব, নাসিরুল উকল ওয়াল ফাকারি : ১৩৭।

[২৬] আল মুজায ফিল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিব, নাসিরুল উকল ওয়াল ফাকারি : ১৩৭।

তাদের দুটি ঈদ রয়েছে। যেদিন তারা সকলে সমবেত হয়। এ সময় তারা নাবীয পান করে এবং নানান অশ্লীল ও গর্হিত কাজ করে। ঈদ দুটি হলো,

১. ঈদুল গুতাস ওয়াল বারবারা। এ দুটি খ্রিস্টানদের উৎসব।
২. ঈদুল নাইরোজ। এটি অগ্নিপূজকদের উৎসব।[২৭]

তারা এসব রীতি পালনকে গুপ্তজ্ঞান দাবি করে। তাদের নারীদের সাধারণত কোনো ধর্মকর্ম পালনের বিধান নেই। কেননা তারা মনে করে, নারীদের মেধা কম। ফলে তারা এসব (মনগড়া) গুপ্তজ্ঞান আত্মস্থ করতে সক্ষম নয়। তাদের পুরুষরা ১৯ বছর বয়সে উপনীত না হলে এই গুপ্তজ্ঞান আত্মস্থ করতে পারে না। তারা বিশেষ সভায়, বিভিন্ন উদ্যোগ-আয়োজন, বুদ্ধিবৃত্তিক সভা-সেমিনার ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নাসিরী মতাদর্শ প্রচার-প্রসার করে থাকে। তাদের এসব কর্মকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যাবে, সুলাইমান জর্ডানীর রচিত 'আল বারূকাতুস সুলাইমানিয়্যাহ' নামক গ্রন্থে।

এর লেখক প্রথমে নাসিরী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। পরে তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই গ্রন্থটি রচনা করেন। পরিণতিতে তারা তাকে ফুটন্ত তেলে জীবন্ত নিক্ষেপ করে হত্যা করে।[২৮]

এখানে যে কথাটি বলা আবশ্যক তা হলো খ্রিস্টান রাষ্ট্র যেমন, আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স... ও ইসরাঈল সম্মিলিতভাবে এই গোষ্ঠীটিকে মদদ যুগিয়ে থাকে। যাতে তারা এদের মাধ্যমে উম্মাতে মুসলিমাকে বিভক্ত ও ছিন্ন-ভিন্ন করতে পারে। তারা মনে করে, মুসলমানদের মাঝে একমাত্র এই সম্প্রদায়টি তাদের গোপন উদ্দেশ্য সাধনে শক্ত হাতিয়ারের ভূমিকা পালন করতে পারবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.

তখন তারা যেমন ছলনা করত তেমনি আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহর কৌশল খুবই সুনিপুণ।[২৯]

এদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে পড়ুন, শায়খ আবু যুহরা রহ. রচিত

---

[২৭] আল মুজায ফিল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিব, নাসিরুল উকল ওয়াল ফাকারি : ১৩৯।
[২৮] আল মুজায ফিল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিব, নাসিরুল উকল ওয়াল ফাকারি : ১৪০।
[২৯] সূরা আনফাল : ৩০।

তারিখুল মাযাহিবিল ইসলামিয়্যাহ, আলাভী অংশ; আসকারি রহ. কৃত নাসিরিয়্যাহ এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. রচিত ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : খণ্ড ৩৫)

## দুই. শিয়া ইসনা আশারিয়্যাহ

মানুষের মাঝে তাদের অনেকগুলো নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, ইমামিয়্যাহ। কেননা তারা বলে, বাহ্যিক নস ও সুনির্দিষ্ট নির্বাচনের মাধ্যমে ইমাম নির্ধারিত করা আবশ্যক।

'আইয়ানুশ শিয়া' নামক গ্রন্থের লেখক বলেন, নিশ্চয় এই শিয়া ইসনা আশারিয়া নামটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়, যে হযরত আলী রা. কে খেলাফত লাভে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি গণ্য করে। অধিকাংশ সময় আত্মতৃপ্তি ও প্রতিশোধ গ্রহণের অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৩০]

তবে 'আল কাফি' গ্রন্থের রচয়িতা আল কালীনি শিয়ায়ী এমন বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, যদ্দারা বোঝা যায় যে, তারা এই নাম ও উপাধি গ্রহণ করে সন্তুষ্ট। তারা অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তাঁর নামে মিথ্যা ও বানোয়াট কথাবার্তা বলে বেড়ায়।[৩১]

উল্লেখ্য, শিয়াদের কাছে আল-কাফি গ্রন্থটি খুবই মর্যাদাপূর্ণ। বরং আহলুস সুন্নাহের কাছে সহিহ বুখারির যে মর্যাদা এই গ্রন্থকে তারা সেরূপ মর্যাদা দিয়ে থাকে।

তারা বলে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য রাওয়াফেয শব্দটি ব্যবহার করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ!)

জনমানুষের কাছে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, শিয়ারা খুবই নির্লজ্জ। তারা আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিজীবের ব্যাপারে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ দেওয়ায় কোনো কিছুর পরোয়া করে না।

তারা ইসনা আশরিয়া নামে পরিচিত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, তারা বারো জন ইমাম থাকার কথা বলে এবং এই ইমাম তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত বলে দাবি করে। তাদের উক্ত বারো জন ইমামের নাম নিম্নরূপ,

---

[৩০] আইয়ানুশ শিয়া, মুহসিন আমীন : ১ : ২০।
[৩১] মুরুউল কাফি ৮ : ২৮, রচনা নং ৬ : কিতাবুর রাওযা।

১. আবুল হাসান আলী ইবনে আবী তালিব। (মৃত্যু ৪০ হিজরী)
২. আল হাসান বিন আলী ইবনে আবী তালিব। (মৃত্যু ৫০ হিজরী)
৩. আল হোসাইন বিন আলী ইবনে আবী তালিব। (মৃত্যু ৬১ হিজরী)
৪. আলী যাইনুল আবিদীন ইবনে হোসাইন বিন আলী। (মৃত্যু ৯৫ হিজরী)
৫. মুহাম্মদ আল বাকির ইবনে আলী। (মৃত্যু ১১৪ হিজরী)
৬. জাফর আস সাদিক ইবনে মুহাম্মদ। (মৃত্যু ১৪৮ হিজরী)
৭. মূসা আল কাযিম ইবনে জাফর। (মৃত্যু ১৮৩ হিজরী)
৮. আলী ইবনে মূসা আর রিযা। (মৃত্যু ২০৩ হিজরী)
৯. আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী আল জাওয়াদ। (মৃত্যু ২২০ হিজরী)
১০. আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ আল হাদী। (মৃত্যু ২৫৪ হিজরী)
১১. আবু মুহাম্মদ আল হাসান ইবনে আলী আল আসকারী। (মৃত্যু ২৬০ হিজরী)
১২. আবুল কাসিম মুহাম্মদ বিন হাসান আল মাহদী। (মৃত্যু ২৫৬ হিজরী)[৩২]

শিয়া ইমামিয়্যাদের মতে, এরাই হলেন সেই বারো জন ইমাম। শিয়া ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায় তাদের ব্যাপারে যেসব ধ্যান-ধারণা লালন করে থাকে তার পুরোটাই বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনে ভরপুর। এসব ধ্যান-ধারণা তারা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ তাআলা এর স্বপক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ নাযিল করেননি।

তারা তাদের ইমামদের ব্যাপারে যেসব ধারণা লালন করে তার অন্যতম হলো, তারা শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, বাহ্যিক-আভ্যন্তরীণ যাবতীয় দোষ ও পাপাচার থেকে মুক্ত। একইভাবে তারা যাবতীয় ভুল-প্রমাদ ও স্মৃতি-বিস্মৃতির দোষ থেকেও মুক্ত। কেননা ইমামগণ শরীয়তের ধারক-বাহক হয়ে থাকেন। সুতরাং শরীয়ত পরিপালন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা নবীদের অবস্থার মতোই। (নাউযুবিল্লাহ!)[৩৩]

---

[৩২] দেখুন! আকাইদুল ইমামিয়্যাহ, মুহাম্মদ রেযা আল মুযাফফর : ৬২-৬৩।
[৩৩] আকাইদুল ইমামিয়্যাহ, মুহাম্মদ রেযা আল মুযাফফর : ৬২-৬৩।

তারা তাদের ইমামদেরকে এমনসব বিশেষণে বিভূষিত করে যে, তা শরয়ী ভাষ্য ও যৌক্তিক কথাবার্তাও তা গ্রাহ্য করে না। উদাহরণস্বরূপ কালয়ানী রচিত 'আল-কাফি' গ্রন্থ– যা তাদের কাছে উসূলুল কাফি নামে পরিচিত, সে গ্রন্থ পড়ে দেখা যেতে পারে। কালয়ানী উক্ত গ্রন্থে এমন কিছু অধ্যায় এনেছেন, যাতে তাদের মিথ্যা ও ভ্রান্ত মতবাদের পক্ষে বিভিন্ন বক্তব্য ও উক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। এর সবগুলোই তাদের ইমামদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনমূলক লেখাজোখায় ভরপুর।

উক্ত অধ্যায়গুলো থেকে কয়েকটি অধ্যায়ের কথা নিম্নে তুলে ধরা হলো,

- باب أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه

  (ইমামগণ আল্লাহ তাআলার নির্দেশনার দায়িত্বশীল এবং তারা তাঁর ইলমের ভাণ্ডার) (আল-কাফি : ১ : ১৯২)

- باب أن الأئمة هم أركان الأرض

  (ইমামগণই পৃথিবীর স্তম্ভ ও মূল বিষয়) (আল-কাফি : ১ : ১৯৬)

- باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل، وأنهم يعرفونها، على اختلاف أدلتها

  (ইমামগণের কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সকল গ্রন্থ রয়েছে। দলিলপ্রমাণ অসংখ্য ও মতবিরোধপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তারা এগুলোর জ্ঞান ও বিদ্যা সম্পর্কে অবগত) (আল-কাফি : ১ : ২২৭)

- باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة،

  (পুরো কুরআন ইমামগণের কাছেই সংরক্ষিত আছে) (আল-কাফি : ১ : ২২৮)

- باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل،

  (ইমামগণ নবী-রাসূল ও ফিরিশতাদের কাছে পাঠানো সকল জ্ঞানের কথাই অবগত) (আল-কাফি : ১ : ২৫৫)

- باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون، وانهم لا يموتون إلا باختيار منهم

(ইমামগণ জানেন, তারা কখন মৃত্যুবরণ করবেন। তারা কেবল তাদের ইচ্ছানুসারেই মৃত্যুবরণ করবেন) (আল-কাফি : ১ : ২৫৮)

- باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم شيء

(ইমামগণ যা ঘটেছে এবং যা ঘটবে তার জ্ঞান রাখেন। তাদের কাছে কোনো কিছুই গোপন নয়) (আল-কাফি : ১ : ২৬০)

- باب أن الله لم يعلم نبيه علما إلا أمر أن يعلمه أمير المؤمنين وأنه شريكه في العلم،

(আল্লাহ তাআলা নবীকে কোনো জ্ঞানের কথা বললে তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তিনি আমীরুল মুমিনীনকে সে জ্ঞানের কথা জানান। আর জানার ক্ষেত্রে তিনি তার অংশীদার) (আল-কাফি : ১ : ২৬৩)

- باب أن الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وما عليه،

(ইমামগণের কাছে কোনো বিষয় গোপন করা হলে তারা সে বিষয়ের ভালো-মন্দ সব কথাই বলে দিতে পারেন) (আল-কাফি : ১ : ২৬৪)

- باب أن الإمام يعرف الإمام الذي يكون بعده

(ইমামগণ তার পরবর্তী ইমাম কে হবেন, সে কথা জানেন) (আল-কাফি : ১ : ২৭৬)

- باب في أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون عن البينة

(ইমামগণের কাছে কোনো বিচার উপস্থিত হলে তারা হযরত দাউদ আ. বা দাউদ আ.-এর পরিবারের লোকদের ন্যায় বিচার করেন। তারা কোনো প্রমাণ চান না) (আল-কাফি : ১ : ২৯৭)

- باب أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل .

(ইমামগণের পক্ষ থেকে যে বিষয় এসেছে তা ছাড়া অন্য বিষয়ে মানুষের কিছু করার বা বলার অধিকার নেই। তাদের পক্ষ থেকে কোনো কিছু বিবৃত বা নির্ধারিত না হয়ে থাকলে সেটা বাতিল) (আল-কাফি : ১ : ২৯৯)

প্রিয় পাঠক! ইসনা আশারিয়া আলেমগণের মধ্যে আমরা এরূপ অসংখ্য বাড়াবাড়িমূলক উক্তি দেখতে পাই। আপনি যখন মাজলিসি কর্তৃক রচিত 'মিরআতুল উকূল' নামক গ্রন্থটি হাতে নেবেন তখন তাতে এরূপ মারাত্মক মারাত্মক ভ্রান্ত আকিদার কথা লেখা দেখবেন। তারা একথাও দাবি করে যে, ইমামগণের নিষ্পাপতা নবীদের নিষ্পাপতার ঊর্ধ্বে। কেননা তারা তাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান।[৩৪]

এ পর্যায়ে শিয়াদের বর্তমান ইমাম, তাদের মূল কেন্দ্রবিন্দু, তাদের মহান নেতা, যাকে ইরানী বিপ্লবের জনক বলা হয়, তার সম্পর্কে অল্প-বিস্তর আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শী যুবসমাজের কাছে ব্যাপারটি কিছুটা সংশয়পূর্ণ। বরং ব্যাপারটি এমন কতিপয় দাঈ ও আলেমদের কাছেও ধোঁয়াশাপূর্ণ– যারা মূলত আহলুস সুন্নাহর নীতি আঁকড়ে ধরতে গিয়ে শিয়া মতাদর্শ গ্রহণ করে বসে আছেন। তারা কিসের অঙ্গীকার করছেন, জীবন যাপনে কোন বিধান মেনে চলছেন- তার তোয়াক্কা করছেন না। এই শ্রেণির লোকেরা ইরানে ধোঁকাগ্রস্ত। শিয়ারা তাদেরকে জীবন্ত জবাই করে ফেলেছে। তাদেরকে বন্দী করে রেখেছে। তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছে। আপনি যখন আবদুল্লাহ মুহাম্মদ গরীব রচিত 'ওয়া জা-আ দাউরুল মাজূস'– অগ্নিপূজারীদের যুগ ফিরে এসেছে– নামক গ্রন্থটি অধ্যয়ন করবেন তখন তাদের আশ্চর্যকর কথাবার্তা ও মারাত্মক গর্হিত কাজকর্মের বিবরণ পাবেন। এই গ্রন্থে তাদের কার্যকলাপ, তাদের ভেতর ও বাহিরের কর্মকীর্তির কথা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, শিয়াদের এই গোষ্ঠী আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শ নির্মূলে পরস্পরে কতটা ঐক্যবদ্ধ!?

ইসনা আশারিয়াগণ যুক্তিপ্রমাণকে যথামর্যাদা দেয় না, তারা শরীয়তেরও কোনো ধার ধারে না। তারা শরয়ী নস বা ভাষ্যকেও আঁকড়ে ধরে না। তারা তাদের আলেম ও মাশায়েখদেরকেও যথাযোগ্য সম্মান করে না। এর বিপরীতে আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শীগণ নিজেদের ইমামদেরকে যথাযোগ্য সম্মান দেন। তাদেরকে তাদের স্ব স্ব স্তর ও অবস্থানেই রাখেন। ইমামগণের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর সুস্পষ্ট আকিদা-বিশ্বাস প্রসঙ্গে ইমাম যাহাবী রহ. এর উক্তি খুবই সুন্দর। তিনি বলেছেন, আমাদের ইমাম হযরত আলী রা. হলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত খলীফাতুল মুসলিমীনদের একজন। আমরা তাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালোবাসি। আমরা তাকে নিষ্পাপ দাবি করি না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. কেও নিষ্পাপ বলে দাবি করি না। তার দুই পুত্র হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন রা. হলেন রাসূলুল্লাহ সা. এর দৌহিত্র এবং

---

[৩৪] দেখুন, মিরআতুল উকূল, মাজলিসি : ২ : ২৮৯।

তারা উভয়েই জান্নাতবাসী যুবকদের সর্দার। আমরা যদি তাদেরকে খলিফা হিসেবে গণ্য করি তবে তারা এর উপযুক্ত।

যাইনুল আবিদীন হলেন খুবই মর্যাদাবান ব্যক্তি। তিনি নেককার আলেমগণের সর্দার। তিনি ইমামতের যোগ্য ব্যক্তি। এমনিভাবে তার পুত্র জাফর আল বাকির। তিনিও একজন ইমাম ফকীহ। তিনিও খেলাফতের যোগ্য ব্যক্তি।

এমনিভাবে তার পুত্র জাফর সাদিক। তিনি জ্ঞানমনস্ক আলেমগণের মধ্যে মহামর্যাদার অধিকারী। আবু জাফর মানসূরের চেয়ে তিনি খেলাফতের অধিক যোগ্য ছিলেন।

তার পুত্র মূসা। তিনিও খুবই সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানী। তিনি খলিফা হারুনুর রশীদের চেয়ে খেলাফতের অধিক যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। খ্যাতি ও মর্যাদায় তিনি খুবই মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন।

তার পুত্র আলী বিন মূসা রিযা। তিনিও যোগ্য ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। জ্ঞান ও বয়ান-বক্তৃতায় দক্ষ ছিলেন। মানুষের মনে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারতেন। খলিফা মামুন তার জালালত বা প্রভাব-প্রতিপত্তির কাছে নতজানু থাকতেন। তিনি ২০৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন।

তার পুত্র মুহাম্মদ আল জাওয়াদ। তিনি নিজ গোত্রের নেতা ছিলেন। তিনি জ্ঞান ও ফিকহে তার পিতৃপুরুষদের স্তরে উপনীত হতে পারেননি।

তার পুত্র, যার উপাধি হাদি- তিনিও খুব সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন।

তার পুত্র হাসান বিন আলি আল আসকারী রহ. এর অবস্থাও অনুরূপ।[৩৫]

আর বারোতম ইমাম সম্পর্কে তিনি বলেছেন, আর এই মুহাম্মদের ব্যাপারেই তারা ধারণা করে যে, তিনি সর্বশেষ খলিফা ও হুজ্জত। তিনি যুগের ইমাম। তিনি চিরঞ্জীব। কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তিনি আত্মপ্রকাশ করলে পৃথিবী ন্যায়-ইনসাফে ভরে যাবে। যেমন এখন জুলুম অবিচারে ভরপুর রয়েছে। আমাদের জানা মতে, তারা এই ইমামের জন্য প্রায় ৪৭০ বছর যাবত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। (এখানে ইমাম যাহাবী রহ. এর সময়কাল তথা ৭৪৮ হিজরী সাপেক্ষে ৪৭০ বছর)। যে বা যারা আপনাকে অদৃশ্য বিষয়ে সংশয়ে নিপতিত করবে সে আপনার ওপর ইনসাফ করেনি। সুতরাং কেউ অসম্ভব কোনো বিষয়ে সংশয়ে ফেললে সেটা কতটুকুই আর ধর্তব্য হবে? এক্ষেত্রে ইনসাফ বাঞ্ছনীয়। আমরা আল্লাহ তাআলা কাছে অজ্ঞতা ও বোকামি থেকে পানাহ চাই।[৩৬]

***

---

[৩৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৩ : ১২০-১২১।
[৩৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৩ : ১২০।

# বর্তমান যুগে শিয়া ইসনা আশারিয়ার কার্যক্রম

## বর্তমান সময়ের শিয়া ইমাম ও তার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র

ইরানে শিয়া সম্প্রদায় রাষ্ট্রক্ষমতার চাবি হাতে তুলে নেওয়ার পর ইসলামী বিশ্ব নড়েচড়ে বসেছে। এ সময়ে ইরানের শাহ পরাভূত হয়েছে। ইসনা আশারিয়াদের পক্ষাবলম্বনকারী মিডিয়া অপরাপর মুসলমানদেরকে তাদের কর্মকীর্তি সম্পর্কে মুসলমানদেরকে ধোঁকায় রেখেছে। পশ্চিমা মিডিয়াগুলোও তাদেরকে সমর্থন দিয়েছে। ইমাম খোমেনী একটি ধূর্ত যুগ ও সময় উপহার দিতে খুবই পারঙ্গমতা দেখিয়েছে। একইসঙ্গে আহলুস সুন্নাহর ওপর রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ লেখক-সাহিত্যিক ও দাঈগণ ইমাম খোমেনীর বিপুল প্রশংসা করেছে এবং তাকে যুগের মুজাদ্দিদ আখ্যায়িত করেছে। তারা বরং তাকে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব, আবদুল হামীদ বিন বাদিশ, মুহাম্মদ বিন আলী আস সানূসী ও হাসানুল বান্নার ন্যায় ধর্মীয় সংস্কারকদের কাতারে উঠিয়ে দিয়েছে।

যেহেতু ওইসব লেখাজোখা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে, একইসঙ্গে সেগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রজন্মের কাছে মূল বাস্তবতা অন্তরালে রাখার কারণ হয়েছে– সেহেতু আমার মনে হয়েছে, আমি ইমাম খোমেনীর ব্যাপারে বাস্তব কথাটি সবাইকে বলে দেই। ইমাম খোমেনী হচ্ছেন শিয়া ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের একজন মুখপত্র। তারা আল্লাহ তাআলার ঐশী বিধানের নানা দিক নিয়ে ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা লালন করে থাকে। তাদের সাজানো এই বিরাট বিপ্লব মূলত ইসলামের বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনার মূলে কুঠারাঘাত ও বিষ মিশ্রিত খঞ্জর হিসেবে গণ্য। বরং ইরানের এই বিপ্লবের কারণে নবী মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ সা. কর্তৃক আনীত বিশুদ্ধ দীনের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টির পথ রচিত হয়েছে।

যেহেতু ইরানী সাম্রাজ্য ইসলামী বিশ্বে আসন গেড়ে বসেছে এবং আফ্রিকা, এশিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, উত্তর আফ্রিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় নিজেদের বাতিল ও ভ্রান্ত চিন্তাধারা সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে সেহেতু অনেক সাধারণ মুসলমানও তাদের দাওয়াত ও আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে। অথচ তারা তাদের বাস্তব অবস্থা ও মিশন সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও অবগত নয়। এ কারণেই আমার মনে হয়েছে যে, আমি ইমাম খোমেনী ও তার অনুসারীবৃন্দের কীর্তিকলাপ এবং তাদের চিন্তাধারার কথা সবিস্তারে ব্যক্ত করি। যাতে ভবিষ্যত

প্রজন্ম এই ধূর্তপণ্ডিতদের নখর থাবা থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কেননা যুগ পরম্পরায় এরা তো তাদের শয়তানী কর্মতৎপরতা চালিয়েই যাবে।

ইমাম খোমেনী 'আল-হুকূমাতুল ইসলামিয়্যাহ' নামক গ্রন্থে নিজেদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের মতাদর্শে এই আকিদা লালন করা আবশ্যক যে, আমাদের ইমামদের এমন মর্যাদা রয়েছে যা অনেক নৈকট্যশীল ফিরিশতা বা কোনো নবী-রাসূলও লাভ করতে পারে না।

তাদের পক্ষ থেকে একথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহর সঙ্গে আমরা কখনো কখনো এমন অবস্থায় মিলিত হই যা অনেক নৈকট্যশীল ফিরিশতা বা কোনো নবী-রাসূলের পক্ষে মিলিত হওয়া সম্ভব নয়।[৩৭]

এটি স্পষ্ট স্বীকারোক্তি যে, তিনি নবী-রাসূলদের উপর ইসনা আশারিয়া ইমামদের মর্যাদাবান মনে করেন এবং শ্রেষ্ঠত্বের স্থান দেন।

গোঁড়া রাফেযিদের সমালোচনায় বড় বড় ইমামদের মতামত নিম্নরূপ,

আব্দুয যাহের বাগদাদি (মৃত্যু ৪২৯ হিজরী) বলেন, গোড়া রাফেযিদের ধারণা, ইসনা আশারিয়া ইমামগণ নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। অথচ আমরা জানি, এটা সুস্পষ্ট বাতিল কথা।[৩৮]

কাজী ইয়ায (মৃত্যু ৫৪৪ হিজরী) বলেন, গোঁড়া রাফেযীদের বিশ্বাস, নবীদের চেয়ে তাদের ইমামগণ শ্রেষ্ঠ। এর ওপর ভিত্তি করে আমরা অকাট্যভাবে বলতে পারি, এরকম বিশ্বাসের জন্য তারা কাফের সাব্যস্ত হবে।[৩৯]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র) (মৃত্যু ৭২৮ হিজরী) বলেন, রাফেযিদের মতে, ইসনা আশারিয়া ইমামগণ প্রথম সারির মুহাজির ও আনসারদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। গোঁড়া রাফেযিদের মতে, তাদের ইমামগণ নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।[৪০]

---

[৩৭] আল-হুকূমাতুল ইসলামিয়্যাহ, খোমেনি : ৫২।

[৩৮] উসূলুদ্দীন : ২৯৮।

[৩৯] আশ-শিফা : ১ : ২৯০।

[৪০] মিনহাজুস সুন্নাহ : ১ : ১৭৭।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (র) বলেন, যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস লালন করে যে, নবীগণ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি অধিক শ্রেষ্ঠ বা তাদের সমপর্যায়ের তাহলে সে কাফের।[৪১]

খোমেনি তার পূর্বসূরী ওইসব শায়েখদের চিন্তা ও বিশ্বাস ধারণ করেন– যারা এই বিকৃত মতাদর্শ উদ্ভাবন করেছেন। তিনি শায়খ কালিনী প্রণীত 'আল-কাফি' ও তাবরিসী রচিত 'আল ইহতিজাজ' গ্রন্থদ্বয়কে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখেন।

'ফসলুল খিতাব ফী ইসবাতি তাহরীফী কিতাবি রাব্বিল আরবাব' গ্রন্থপ্রণেতা অগ্নিপূজক হোসাইন নূরী তাবরিজিকে খোমেনী নিজের গ্রন্থসমূহে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাক্যে উল্লেখ করেছেন।

এমন একটি গ্রন্থকে নির্ভরযোগ্য বলেন, যাতে হযরত আলী রা.-এর এমন দোয়াসমূহ বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোতে তিনি আবু বকর রা. ও ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওপর বদদুআ করেছেন।

সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবীদেরকে এ কিতাবে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা কুরআনের পরিবর্তনকারী।[৪২]

কিছু কিছু আয়াতের ব্যাপারে তার নিজস্ব বাতিনী তাফসীর রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ যথাপ্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।[৪৩]

তার মতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, এ আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এ আদেশ করেছেন যে, তিনি যেন ইমামতকে যোগ্য ব্যক্তির হাতে অর্পণ করেন। তিনি হবেন আমিরুল মুমিনীন। তার দায়িত্ব হলো

---

[৪১] আর-রাদ্দু আলার রাফিযা : ২৯।
[৪২] মাসআলাতুত তাকরীব বাইনা আহলিস সুন্নাহ ওয়াশ শিয়া : ২ : ২৩৭।
[৪৩] সূরা নিসা : ৫৮।

তিনি পরবর্তী যোগ্য ব্যক্তির হাতে ইমামত অর্পণ করবেন। এভাবেই একের পর এক ধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে।[৪৪]

## সাহাবীদের ব্যাপারে ইমাম খোমেনির আকিদা-বিশ্বাস

ইসনা আশারিয়া ইমামদের আকিদা হলো, তাদের শত্রুদের থেকে বারাআত ঘোষণা করলেই কেবল বেলায়াত পাওয়া যাবে। তাদের শত্রু হলো হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.) এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীবৃন্দ।

খোমেনীর চোখে এসকল মহান মানুষ থেকে বারাআত ঘোষণা এবং নামাযে ইসনা আশারিয়াদের বিলায়েত গ্রহণ বৈধ। তিনি উল্লেখ করেন, নামাজরত ব্যক্তির জন্য সিজদায় গিয়ে একথা বলা বৈধ,

الإسلام ديني، و محمد نبي و علي و الحسن و الحسين بعدهم إلى آخرهم أئمتي، بهم أتولى و من أعدائهم أتبرأ.

ইসলাম আমার ধর্ম। মুহাম্মদ (সা.) আমার নবী। আলী (রা.) এবং হাসান হোসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু (এভাবে শেষ ইমাম পর্যন্ত সকলে) আমার ইমাম। আমি তাদেরই অনুসরণ করি এবং তাদের শত্রুদের থেকে নিজেকে সম্পর্কমুক্ত ঘোষণা করি।[৪৫]

তিনি সাহাবায়ে কেরামকে এজন্য অভিযুক্ত করেন যে, তারা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত সংক্রান্ত হাদিসের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে গাদিরে খুম নামক স্থানে রাসুল (সা.) হযরত আলী (রা.) কে তার পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। আর তখন থেকেই লোকজনের মনে তারা বিরোধিতা ছড়াতে শুরু করেন।[৪৬]

তার কিতাব 'আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া' এবং তার অন্যান্য গ্রন্থসমূহ সত্য পরিপন্থী ভ্রান্ত বক্তব্যে ভরপুর। খুব বেশি গোঁড়া ও বিকৃত কোনো আকিদা না হলে রাফেযিদের কোনো আকিদার সঙ্গে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করেননি।

---

[৪৪] মাসআলাতুত তাকরীব বাইনা আহলিস সুন্নাহ ওয়াশ শিয়া : ২ : ২৩৭।

[৪৫] তাহরীরুল ওয়াসীলাহ, আল খোমেনি : ১ : ১৬৯।

[৪৬] আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়্যাহ : ১৩১।

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইমাম খোমেনী শিয়াদের মাঝে শক্তি-সামর্থ্যে একজন সম্রাটের ন্যায় বেঁচে ছিলেন। তার সাম্রাজ্য বিপ্লব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় হয়। শিয়ারা প্রতারণা মিথ্যা ও পথভ্রষ্ট করণের পথ অবলম্বন করে। প্রতারণা ধোঁকাবাজি ও উগ্রতায় এই নতুন শিয়া ও আগের শিয়াদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

জনমানুষকে নিজেদের পক্ষে টানার জন্য প্রথম প্রথম তারা নিজেদের আকিদার পরিপন্থী বক্তব্য প্রদানের কৌশল অবলম্বন করে। ভক্তদের উদ্দেশ্যে খোমেনির প্রদত্ত এক বক্তব্য থেকে এটি প্রমাণিত হয়। ওই বক্তব্যে তিনি বলেন, তোমরা লোকজনকে একে একে দূরে সরিয়ে দিয়ো না। ওহাবী কাফের ইত্যাদি বলে তাদের অপবাদ দিও না। মানুষের সঙ্গে তোমাদের আচার-ব্যবহার যদি এমনই হয় তবে কে তোমাদের সঙ্গে থাকবে?[৪৭]

এজন্য খোমেনী ইরানি হাজীদের নির্দেশ দেন, তারা যেন নিজেদের আকিদা গোপন রেখে আহলুস সুন্নাহদের সঙ্গে নামাজ আদায় করে। শিয়া নেতারাও এমন করতেন। বিভিন্ন সময় তারা আহলে সুন্নাহর ইমামদের পেছনে নামাজ পড়তো এরপর তারা পুনরায় নামাজ পড়ে নিত।

সমকালীন সময়ের একজন শিয়া আলেম বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। মুসলমানদের প্রতি বিশেষত আহলুস সুন্নাহর প্রতি তাদের বিদ্বেষ ও বৈরীভাব এত প্রকট হয়েছে যে- তাদের রক্ত, ইজ্জত, সম্মান ও পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে খেলতে তারা সামান্যতম দ্বিধাবোধ করে না।

১৪০৭ হিজরী সনে তারা মক্কায় যে কর্মকাণ্ড করে তা বিরোধী মতের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষের শক্তিশালী প্রমাণ। এ সময় তারা মক্কার হারাম শরীফে প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ জড়ো করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা একত্র হয়ে দলবদ্ধভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে করতে কাবা ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তারা নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে তাদের মহানায়ক ইমাম খোমেনীর ছবি হাতে নিয়ে হারামের দিকে আসতে থাকে। মহান আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে সেদিন তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তারা হারাম শরীফে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে তারা অন্যান্য হাজী, সেনাসদস্য ও সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড শুরু করে। ১৪০৯ হিজরীতে হজ্বের সময় তারা তাদের অনুসারী ও

---

[৪৭] ফিরাকুন মুআসারা, ইওয়াজি : ১ : ২৬২।

কর্মীদের হারামের চারপাশে বিস্ফোরক স্থাপনের জন্য নিয়োগ দেয়। এটা জিলহজের ৭ তারিখের ঘটনা। হজে আগত অনেক হাজী সেদিন দুর্ঘটনার শিকার হন। ইরানীরা লোকজনের উপর নানারূপ নির্যাতন নিপীড়ন চালায়।[৪৮]

আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আনসারীর রচিত 'আহলুস সুন্নাহ ফী ইরান' গ্রন্থে আহলুস সুন্নাহর উপর তাদের সমূহ শাস্তি হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তাদের বহুমাত্রিক নির্যাতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ,

১. রশি দিয়ে পা বেঁধে বৈদ্যুতিক তার দিয়ে প্রহার করা।

২. দুই হাত পেছনে বেঁধে বন্দিকে জেলের এক কোণে রেখে নিচে পানি ঢেলে দেওয়া। বহুসংখ্যক মুসলিমের সঙ্গে তারা এ কাজ করে।

৩. বন্দীর শরীরের বিভিন্ন স্থানে ১০ থেকে ১০০ ও ৫০০ বেত্রাঘাত ও প্রহার করা হয়। এতে সে মারা গেলে তো গেলোই। না হয় ১৫ দিন যাবত এ নির্মম নির্যাতন চলত।

৪. বন্দীদের ঘোড়ার আস্তাবলে ফেলে রাখা। যাতে এখানেই শেষমেষ মৃত্যুবরণ করে।

৫. আরো বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন করা হয়, যেমন মাথার চামড়া তুলে ফেলা, মাথা ছিদ্র করে ফেলা, চোখ উপড়ে ফেলা, কোনো কোনো বন্দিকে পুড়িয়ে হত্যা করা, কারো কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা, নখ তুলে ফেলা ইত্যাদি।[৪৯]

এখানে তাদের নির্যাতন-নিপীড়নের কথা অল্প-সামান্যই বর্ণনা করা হলো। তারা সাহাবীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ায়। কুরআনে সন্দেহ-সংশয় থাকার কথা বলে। হাদিস সম্পর্কে মিথ্যাচার করে। আমরা তাদের কাছ থেকে কিই–বা আশা করতে পারি?

## শিয়া-সুন্নি ঐক্য কি সম্ভব?

ইতোপূর্বে শিয়া-সুন্নি ঐক্যের সবরকম চেষ্টা উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ মৌলিক বিষয়ে, কেবল শাখাগত বিষয়ে নয়। শিয়া-সুন্নি ঐক্য তখনই সম্ভব যদি শিয়ারা নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসে।

---

[৪৮] প্রাগুক্ত : ১ : ২৬৩।

[৪৯] আহলুস সুন্নাহ ফী ইরান : ৫৪।

শিয়া আলেমরা সুন্নিদের সঙ্গে তখনই ঐক্য সম্ভব মনে করেন, যখন সুন্নিরা সাহাবায়ে কেরামকে গালমন্দ করবে এবং তাদের বাতিল আকিদা বিশ্বাস ধারণ করবে। জনৈক শিয়া শায়খের সঙ্গে থাকা অবস্থায় এমনই অভিজ্ঞতা অর্জন করেন শায়খ ড. মুস্তফা আস-সিবাঈ। শিয়া শায়েখের নাম ছিল আব্দুল হোসাইন শরফুদ্দিন মাওসুবি। মুস্তফা সিবাঈ শিয়া-সুন্নি ঐক্যের ব্যাপারে খুব বেশি উৎসাহী ছিলেন। এজন্য তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, লেখক সাহিত্যিক ও ব্যবসায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা তাকে নানান মধুর কথা শোনায় এবং বিভিন্ন অঙ্গীকার প্রদান করে। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন শিয়া নেতা আব্দুল হোসাইন। তিনিও এ বিষয়ে খুবই উৎসাহী এবং আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। একদিন তিনি একটি বই প্রকাশ করেন। বইটির আগাগোড়া ছিল হযরত আবু বকর ও হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সম্পর্কে মিথ্যাচার ও গালমন্দে ভরপুর। তাতে একথাও লেখা আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সম্পর্কে জাহান্নামী হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন।[৫০]

শায়খ মুস্তফা সিবায়ী (রহ.) বলেন, আমি আব্দুল হোসাইনের মুখের কথা ও বইয়ের বক্তব্যে বিস্মিত হয়েছি। তার এই মনোভাব কোনোভাবেই একথা প্রমাণ করে না যে, সে শিয়া-সুন্নি ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং অতীত ভুলে যেতে একান্ত আগ্রহী।[৫১]

ঐক্যের বিষয়ে তাদের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল, সুন্নি দেশ ও অঞ্চল সমূহে শিয়া মতবাদ প্রচারের পথ উন্মুক্ত করা। সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী বক্তব্য দানের সুযোগ দেওয়া। হক ও সত্য কথা বলা থেকে আহলুস সুন্নাহ নিবৃত্ত থাকা। যদি রাফেযিরা কখনো সত্যকথন শুনে তখন সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলে শোরগোল শুরু করে যে, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ভঙ্গ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

## শায়েখ মুসা জারুল্লাহর অভিজ্ঞতা

মূসা জারুল্লাহ ছিলেন তুর্কিস্তানের কাযানের বাসিন্দা বংশোদ্ভূত রুশ নাগরিক। রাশিয়ায় মুসলিম নেতাদের অন্যতম একজন ছিলেন তিনি। রুশ জার-এর শেষ সময় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের শুরুর দিকে তিনি রাশিয়ায় অবস্থান করেন। তিনি মুসলিমদের সার্বিক বিষয়ে সর্বোত সিদ্ধান্ত প্রদানকারী ছিলেন।

---

[৫০] আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীইল ইসলামী : ৯।

[৫১] আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীইল ইসলামী : ১০।

রাশিয়ানদের সংখ্যা ছিল ৩০ লাখের মতো। পরে তিনি স্বদেশ ও পরিবার ছেড়ে দূরে চলে যান। এরপর ভারত হিজায মিশর ইরাক ও ইরান সফর করেন।

তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি যদি ঈমান বিসর্জন দিতাম তাহলে আমার পক্ষে রাশিয়ার প্রথম সারির লেখক হওয়া কঠিন কিছু ছিল না। কিন্তু আমি দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছি।[৫২]

এ মহান আলেমেদ্বীন ফরাসি তুর্কি তাতার ও রুশসহ অনেকগুলো ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। আরবি ভাষায় তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি আরবি ভাষার সর্বপ্রকার জ্ঞান যেমন, নাহু, সরফ, উসূল, বয়ান ও ছন্দ শিক্ষা লাভ করেন। ভাষা সংক্রান্ত কোনো বিষয় বা উদ্ধৃতি তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে দিতেন। তা কুরআন মাজিদের কোনো আয়াত হোক বা অন্য কিছু। কোন শব্দ কোন সূরায় কতবার এসেছে সেটাও তিনি বলে দিতে পারতেন।[৫৩]

এই মহান আলেম বিভক্ত উম্মার ঐক্য প্রচেষ্টা এবং শিয়া-সুন্নি একাত্মতার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি ব্যাপক শ্রম দেন। তিনি গুরুত্বের সঙ্গে শিয়াদের গ্রন্থসমূহ পড়তে শুরু করেন। তার বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি এ সময় আল ওয়াফি, মান লা ইয়াহদুরুহুল ফাকীহু, আল-ওয়াফি, মিরআতুল উকুল, বিহারুল আনওয়ার, গায়াতুল মারাম ইত্যাদি অসংখ্য কিতাব পাঠ করেন।[৫৪]

এরপর তিনি শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ও অঞ্চলসমূহ সফর করেন। সাত মাসেরও বেশি সময় তিনি এসব স্থানে অবস্থান করেন। সেখানকার মসজিদ-মাদরাসা ও মাজারসমূহ ঘুরে ঘুরে দেখেন। শিয়াদের শোক-মাতম, সভা ও তাজিয়া মিছিল দেখেন। বিভিন্ন ঘর মসজিদ মাদরাসায় উপস্থিত হন। মহররম মাসের দিনগুলোতে তিনি নাজাফ এলাকায় অবস্থান করেন। আশুরা ও অন্য দিনগুলোয় শিয়াদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন।

এ মহান আলেম সেখানে থেকে স্বচক্ষে যে বিষয়গুলো দেখে জেনে আসেন তার সারমর্ম নিম্নরূপ, শিয়াদের সব গ্রন্থেই এমন কিছু কথা আছে– যা উম্মাহ ধারণ ও লালন করে না। এমন অসংখ্য বিষয় আছে, উম্মাহ যেগুলো কখনো

---

[৫২] মাসআলাতুত তাকরীব বাইনা আহলিস সুন্নাহ ওয়াশ শিয়া : ২ : ২০১।
[৫৩] মাজাল্লাতুল মাজমায়িল ইলমি আল আরাবি : ৪ : ২৬৬।
[৫৪] মাসআলাতুত তাকরীব বাইনা আহলিস সুন্নাহ ওয়াশ শিয়া : ২ : ২০১।

মেনে নিতে পারবে না। এসবে উম্মাহর কোনো স্বার্থ নিহিত নেই; বরং অধিকাংশই ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থবিরোধী।

এ কিতাবগুলো এমনসব জঘন্য আলোচনায় ভরপুর– যেগুলো ওইসব কিতাবে থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ইমামগণ এসব বিশ্বাস লালন করতেন বলে ধারণা করা যায় না।[৫৫]

বিবেক-বুদ্ধি শিষ্টাচার ও ঐক্যের দাবি এসব সমর্থন করে না। এসব তো শত্রুতার অঙ্গারে ফুঁক দিয়ে অগ্নি প্রজ্বলন। ঐক্যের দাবি হচ্ছে, শিয়া চিন্তাবিদগণ তাদের কিতাবসমূহ থেকে এসব বিষয় বাদ দেবেন। যাতে মানুষের মন-মগজ থেকে এসব অবিবেচক কথাবার্তা শেকড়শুদ্ধ সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়।

অন্যথায় ঐক্য নিয়ে সব রকম চিন্তা ও বক্তব্য অর্থহীন থেকে যাবে। যতই সভা-সম্মেলন কনফারেন্স করা হোক পূর্ব শত্রুতাই বহাল থাকবে।[৫৬]

উক্ত মহান আলেমেদ্বীন গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেন, উম্মাহর ঐক্য চিন্তার আগে শিয়া আকিদার সমালোচনা ও স্বরূপ উন্মোচন বেশি প্রয়োজন। এর আগে ঐক্য সম্ভব নয়।[৫৭]

শিয়াদের কিতাবসমূহ পড়ে শিয়া সমাজে যেসব জঘন্য বিষয় ও কার্যকলাপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তাতে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ঐক্য প্রক্রিয়া চেষ্টায় তিনি প্রথম সাক্ষাৎ করেন শিয়া নেতা মুহসিন আমিন-এর সঙ্গে। ইরানের রাজধানী তেহরানে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তাদের মাঝে কিছুক্ষণ মতবিনিময় হয়। এক পর্যায়ে শায়েখ মুসা তার দিকে একটি কাগজ এগিয়ে দেন। তাতে লেখা ছিল,

এক. আমি শিয়া অঞ্চলসমূহে মসজিদসমূহ অবহেলিত পরিত্যক্ত পড়ে থাকতে দেখেছি। সেগুলোতে নামাজের জামাত হয় না। জামাতের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। জুমআর নামায একেবারেই পড়া হয় না। পক্ষান্তরে কবর ও মাজারসমূহকে ইবাদত-উপাসনার স্থান বানানো হয়েছে। এর কারণ কি?

---

[৫৫] আল-ওয়াশিআহ ফী নাকদি আকাইদিশ শিয়া : ২০।
[৫৬] মাসআলাতুত তাকরীব বাইনা আহলিস সুন্নাহ ওয়াশ শিয়া : ২ : ২০৩।
[৫৭] আল-ওয়াশিআ : ১৭।

দুই. আপনাদের ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থী বা আলেমসমাজ কাউকেই কুরআন হিফয করতে দেখা যায় না। কেউ কুরআন তেলাওয়াত করে না। শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে জানে না। আপনাদের দেশে দ্বীন-ধর্ম পরিহার ও অবহেলার এ করুণ অবস্থা কেন হয়েছে?

তিন. আমি দেখেছি, আপনাদের শহরের রাস্তাগুলোতে নারীদের বেহায়াপনা ও হারাম কাজ যেভাবে হচ্ছে। তা অন্য কোনো মুসলিম দেশে কল্পনাও করা যায় না। এর কারণ কী?

এ চিঠি প্রদানের তারিখ ছিল ২৬ শে আগস্ট ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ।

এরপর তিনি নাজাফের আলেমদের কাছে পত্র পাঠান। কাজেমী আলেমদের কাছেও একটি চিঠি পাঠান তিনি। তিনি তাতে লিখেন,

শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সত্যিকারের আশা ও ইচ্ছা নিয়ে নাজাফের আলেমদের কাছে পেশ করছি, এসবই মুসলিম বিশ্বের দুই দল শিয়া-সুন্নিদের ঐক্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছায় লেখা হয়েছে। আশা করি বিশিষ্ট আলেমগণ একজন বা সবাই নিজ নিজ দস্তখত ও সিলমোহরসহ এর কোনো উত্তর প্রদান করবেন।[৫৮]

এরপর তিনি কিতাবের নাম ও পৃষ্ঠা নং সহ শিয়াদের রচিত কিতাবসমূহে উদ্ধৃত বিকৃত বিষয়সমূহ উল্লেখ করেন। তিনি এমন কিছু বিষয় ও কথাও উল্লেখ করেন যেগুলো শিয়া-সুন্নি ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। যথা,

১. তাকফীরে সাহাবা বা সাহাবায়ে কেরামকে কাফের বলা।

২. প্রথম যুগের মুসলিমদের ব্যাপারে অভিসম্পাতমূলক শব্দ বাক্য ব্যবহার করা।

৩. কুরআনে কারিম বিকৃত করা।

৪. শিয়া গ্রন্থাবলির ভাষ্যমতে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বিচারকগণ এবং সকল আলেম তাগুতপন্থী।

৫. শিয়ারা ব্যতীত সকল ইসলামী দল কাফের অভিশপ্ত চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

---

[৫৮] মাসআলাতুত তাকরীব বাইনা আহলিস সুন্নাহ ওয়াশ শিয়া : ২ : ২০৩।

৬. শিয়া ইমাম, যার আনুগত্য অপরিহার্য, সে ব্যতীত অন্য কারো নেতৃত্বে জিহাদ করা হারাম। মৃত প্রাণী ও শুকর যেমন হারাম এটিও তেমন হারাম। শিয়ারা ছাড়া কেউ শহীদের মর্যাদা পাবে না। কোনো শিয়া যদি ঘরে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে তবুও সে শহীদের মর্যাদা পাবে। শিয়ারা ব্যতীত যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে তারা বরং নিজেদের দ্রুত জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়।

শিয়া মতাদর্শের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদি থেকে এসব বিষয়ে পর্যাপ্ত দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করার পর তিনি শিয়া আলেমদের উদ্দেশ্যে লিখেন, উক্ত ৬ টি বিষয় শিয়ারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। যদি এ-ই হয় তাদের আকিদা-বিশ্বাস; তবে কোনোভাবেই কি মুসলিম উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে? বা তোমার অন্তরে ঐক্যের ব্যাপারে কোন প্রকার আশা জাগবে? তারা যদি এইরূপ আকিদা লালন করে তবে কি কোনোভাবেই এটা সম্ভব হবে যে, আগামী দিনে ইসলামী দলগুলো সম্মিলিতভাবে ইসলামের বিজয় প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসবে?

এরপর তিনি শিয়াদের আরো কিছু বিকৃত বিষয় উল্লেখ করে বলেন, হে মহামান্য আলেমগণ! আপনারা উম্মাহর উপকারে এগিয়ে আসুন, যাতে উম্মাহ এক হয় এবং আল্লাহর কিতাব সামনে রেখে মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ হয়।

এই পত্র লেখার পর শায়েখ মুসা জারুল্লাহ এক বছরেরও বেশি সময় উত্তরের অপেক্ষায় থাকেন। কেবল বসরার বড় একজন শিয়া চিন্তাবিদ ছাড়া অন্য কোনো শিয়া আলেম তার পত্রের উত্তর দেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উক্ত ব্যক্তি তার দায়িত্ব আদায় করলেন এবং নব্বইয়ের অধিক পৃষ্ঠায় তার সকল উত্তর লিখে পাঠালেন। তার এই লেখায় প্রথম যুগের মুসলিমদের ব্যাপারে জঘন্য ধরনের কথাবার্তা লেখা ছিল। শিয়াদের গ্রন্থাদির ব্যাপারে তিনি কঠোর ভাষায় মন্তব্য করেন।

এরপর শায়খ মুসা জারুল্লাহ এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যার নাম, আল-ওয়াশিআ ফী নকদি আকাইদিশ শিয়া। তিনি বলেন, আমি উম্মাহর মর্যাদা ও দীনের সম্মান রক্ষার্থে এ গ্রন্থ লিখেছি। এর মাধ্যমে আমার ও উম্মাহর ওপর সাহাবায়ে কিরামের যে হক আছে, তা আদায়ের চেষ্টা করেছি।[৫১]

৩৬৯ হিজরীতে এই মহান আলেমেদ্বীন মিশরে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তার ওপর দয়া ও সন্তুষ্টি বর্ষিত করুন।

---

[৫১] প্রাগুক্ত : ৩৯; এ প্রসঙ্গে আমি একটি গঠনমূলক গ্রন্থ পড়েছি। নাম মাসআলাতুত তাকরীব বাইনা আহলিস সুন্নাহ ওয়াশ শিয়া- লেখক।

বর্তমান সময়ের শিয়াদের তৎপরতার আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করা হলো। এরা সিরিয়ার নাসিরিয়াদের সঙ্গে মিত্রতা করেছে। লেবাননে শিয়া মতাদর্শী দলের সঙ্গে সখ্যতা তৈরি করেছে। মুসলিম উম্মাহকে বিনাশ করার জন্য তারা গোপনে গোপনে ইহুদি-নাসারাদের সাথে চুক্তি করেছে। তাদের বিষয়ে অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমি দেখেছি যে, তারা উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছে। সেখানে তাদের রাজত্ব কায়েম করার টার্গেট করেছে। সেসব অঞ্চলে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছে।

মরক্কোয় তারা সফল হয়েছে। জায়ায়েরের কিছু যুবককে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছে। নিজেদের লক্ষ্য ও কৌশল বাস্তবায়নে ইরাক যুদ্ধে তারা লিবিয়ার সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে।

উত্তর আফ্রিকার কতিপয় তরুণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তেহরানে এনেছে। তাতে তারা তাদের অর্থায়নে পড়াশোনা করে তাদের চিন্তার বিষবাষ্প নিয়ে দেশে ফিরে যায় এবং গোপনে গোপনে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সরকার ও মুসলিমদের মধ্যে যেসব রক্তাক্ত বিষয় ঘটেছে সেগুলোকে তারা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছে। ইরানী গণমাধ্যম জায়ায়েরে ইসলামি আন্দোলনের প্রতি নিজেদের সমর্থন প্রকাশ করেছে। আমাদের অনেক ভাই গণমাধ্যমের এ নির্লজ্জ ভূমিকায় প্রভাবিত হয়েছে। যে সকল সচেতন তরুণ আধুনিক শিয়াদের সম্পর্কে জানার পরিধি বিস্তৃত করতে চায় তাদের দুটি বই অবশ্যই পড়া উচিত। ১. সাঈদ হাবি রচিত আল খোমেনিয়া; শুযূজুন ফিল আকাইদ ওয়াল মাওয়াকিফ। ২. আহমদ আব্দুল আজিজ হামদান রচিত মা ইয়াজিবু আন ইয়ারিফাহুল মুসলিমু আন আকাইদির রাওয়াফিযিল ইমামিয়্যাহ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ. وَاُمْلِيْ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ.

আমি ধীরে ধীরে এমনভাবে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে পারবে না। আমি তাদেরকে সময়-সুযোগ দেই। নিশ্চয় আমার কৌশল মজবুত।[৬০]

---

[৬০] সূরা কলম : ৪৪-৪৫।

## তিন. শিয়া ইসমাইলিয়া

ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মাদ-এর মৃত্যুর পর শিয়ারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

এক দল তার পুত্র মুসা কাজেম-এর ইমামত তথা নেতৃত্ব মেনে নেয়। এরাই শিয়া ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়।

আরেক দল তার নেতৃত্ব বা ইমামত অস্বীকার করে এবং জাফরের আরেক পুত্র ইসমাঈলের ইমামত বা নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এরা শিয়া ইসমাইলিয়া নামে প্রসিদ্ধ।

ইসমাইলিয়াদের সম্পর্কে আব্দুল কাদের বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এরা জাফরের ইমামত মেনে নেয় এবং ধারণা করে, তার পুত্র ইসমাইলই তাদের পরবর্তী ইমাম।[৬১]

আল্লামা শাহরাস্তানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুসাবী ও ইসনা আশারিয়া শিয়াদের সঙ্গে ইসমাইলীদের পার্থক্য হল, এরা ইসমাইলের ইমামতকে সত্য প্রতিপন্ন করে। সে জাফরের বড় পুত্র। যার কথা শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে।

তারা বলে, জাফর সাদেক ইসমাইলের মাকে বিয়ে করার পর তার উপস্থিতিতে আর কোনো রমণীকে বিয়ে করেননি বা কোনো দাসিকেও গ্রহণ করেননি। এক্ষেত্রে তিনি হযরত খাদিজা রা.-এর ক্ষেত্রে রাসূল সা.-এর এবং ফাতেমা রা.-এর ক্ষেত্রে আলী রাযিআল্লাহু আনহুর সুন্নত ও আদর্শ অনুসরণ করেছেন।[৬২]

ইসমাঈলিয়া সম্প্রদায় শিয়াদের একটি দল। ইসমাঈল বিন জাফর সাদিক তাদের প্রধান নেতা। ইসমাঈলিয়া ছাড়াও তাদের আরও অনেক উপাধি আছে। যেমন, বাতেনিয়া নামেও তারা পরিচিত। কারণ, তারা মনে করে, প্রত্যেক জাহির বা বাহ্যিক অবস্থার একটি বাতেন বা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আছে। প্রত্যেক অবতীর্ণ বিষয়ের একটি ব্যাখ্যা আছে। তাদেরকে কারামিতাও বলা হয়। ইরাকে তারা এ দুই নামে পরিচিত। খোরাসান অঞ্চলে তারা তালিমিয়া ও মুলহিদা নামে পরিচিত। এসব নামে পরিচিত হলেও তারা এ নামগুলো

---

[৬১] আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক : ৬২।

[৬২] আল-মিলাল ওয়ান নিহাল : ১ : ১৯১।

অপছন্দ করে এবং নিজেদেরকে ইসমাঈলিয়া নামে পরিচয় দিতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কারণ, এ নামেই তাদেরকে অন্যান্য শিয়াদের থেকে আলাদা করা হয়।[৬৩]

## ক. উম্মতের ওপর বাতেনিদের মারাত্মক প্রোপাগান্ডা

ইসলামি ইতিহাসের প্রিয় পাঠকমাত্রই জানেন, উম্মতকে দুর্বলকারী বিষয়গুলোর অন্যতম একটি হলো বাতেনি ফিরকা। তারা উম্মাহর শক্তি খর্ব করেছে। এ ফিরকা ইসলামে এমন কিছু ভ্রান্ত ও নষ্ট আকিদা বিশ্বাস ঢুকিয়েছে– যেগুলো প্রাচীন ফালসাফা ও নাস্তিক্যবাদী নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এসব দিয়ে তারা স্বল্পবুদ্ধির লোকদের ধোঁকায় ফেলেছে। মহান আল্লাহ তাআলা মনোনীত সঠিক দীনের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা খ্রিস্টান ও তাতারদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। তারা অস্ত্র ও সৈন্যবলে শক্তি অর্জনের পর বাহরাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। অতঃপর সেখানে এমন ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ, রক্তপাত ও লুণ্ঠনে মেতে ওঠেছে– যা শুনলে অন্তরাত্মা রীতিমতো কেঁপে ওঠে।

তারা আল্লাহর ঘরে আগত হাজিদের ওপর আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড ঘটানোর স্পর্ধাও দেখিয়েছে। তাদের নেতা আবু তাহের জানাবী হাজিদের ওপর আক্রমণ করে এক বীভৎস কর্মকাণ্ড করেছে। গণহত্যা চালিয়ে তাদের অসংখ্য লাশ যমযম কূপে নিক্ষেপ করেছে, অনেককে হারাম শরীফের নিজ নিজ আবাসস্থলে, অনেককে সরাসরি মসজিদে হারামে হত্যা করে।

উত্তর আফ্রিকায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর তারা তাদের বাতিল চিন্তাধারা প্রকাশ ও প্রচার-প্রসার করে। সেখানকার আলেমদের গণহারে হত্যা করে। আহলুস সুন্নাহর অনুসারী লোকজনকে নানানভাবে নিপীড়ন করে। সামনে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ। এটিই আমাদের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য।

আল্লামা বাগদাদী রহ. ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাতেনি ফিরকার শত্রুতা ও বিদ্বেষীমূলক আচরণের কথা সংক্ষিপ্ত ভাষায় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, বাতেনিরা মুসলিম দলগুলোর যত বড় ক্ষতি করেছে, ইহুদি, নাসারা ও মাজূসিরা সম্মিলিতভাবেও এতো বেশি ক্ষতি করেনি। বস্তুবাদি ও অন্যসব

[৬৩] প্রাগুক্ত : ১ : ১৯২।

কাফের জনগোষ্ঠীর চেয়েও এদের ক্ষতি মারাত্মক। শেষ যুগে দাজ্জাল এসে যেসব বিপর্যয় ঘটাবে তা–ও হয়তো এতো মারাত্মক হবে না। কারণ বাতেনি ফিরকার উদ্ভবের সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত যত মানুষ তাদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, দাজ্জালের বিপর্যয়ে এতো মানুষ পথভ্রষ্ট হবে না। কারণ, দাজ্জাল মাত্র চল্লিশদিন ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করবে। আর বাতেনিদের জঘন্যতার পরিমাণ হিসাবের বাইরে।[৬৪]

আবু তাহের জানাভির নেতৃত্বে তারা মক্কায় গিয়ে যেসব ঘৃণ্য অপকর্ম করেছে সে সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাছীর র. লিখেন, 'অতঃপর সে তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং গণহারে হাজিদের হত্যা করা বৈধ ঘোষণা করে। তারা মক্কার অলি-গলিতে, মসজিদে হারামে, কাবার অভ্যন্তরে অসংখ্য হাজি হত্যা করে। আবু তাহের কাবার দরজায় উপবিষ্ট থাকে। লোকজন তার সামনে ধরাশায়ী হতে থাকে। মানুষজন মসজিদে হারামে, পবিত্র মাসে মহান তারবিয়ার দিনে তরবারি চালাতে থাকে। এ সময় সে বলছিল,

أنا الله و بالله أنا ✪ أنا أخلق الخلق و أفنيهم أنا.

আমি আল্লাহ, আমি আল্লাহর মাধ্যমে, আমি সৃষ্টি করি। আমি ধ্বংস করি।

মানুষ তাদের আক্রমণ থেকে পালিয়ে কাবার গিলাফ ধরে ঝুলছিল। তা সত্ত্বেও রেহাই পাচ্ছিল না। সে অবস্থায়ই তাদেরকে হত্যা করা হয়। কেউ কেউ তাওয়াফ করছিল। তাওয়াফ অবস্থায়ই তাদের হত্যা করা হয়।

আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. আরও লিখেন, এ জঘন্য কর্মকাণ্ড ও গণহত্যা শেষ হওয়ার পর নিহতদের যমযম কূপে হারামের অধিবাসীদের তাদের আবাসস্থলে এবং মসজিদে হারামে দাফনের নির্দেশ দেয় আবু তাহের যানভি কারমাতি। তারা যমযমের খিলান ধ্বংস করে। কাবার ফটক উপড়ে ফেলে। কাবার গিলাফ খুলে কেটে নিজেরা ভাগ করে নেয়।[৬৫]

বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এদিন তারা তের হাজার ব্যক্তিকে হত্যা করে। কারও কারও মতে, নিহতের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। এটি হিজরী ৩১৭ সনের ঘটনা। (কাশফুল আসরারিল বাতিনিয়্যাহ : ৩৯; সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৫ : ৩২১)

---

[৬৪] আল ফারকু বাইনাল ফিরাক : ৩৮২।
[৬৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১ : ১৬০।

বাতেনিদের উদ্ভব কবে, এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মত রয়েছে। কারও মতে, ২০৫ হিজরী। কারও মতে ২৫০ হিজরী। এ মতবাদের অনুসারীরা কঠোরভাবে গোপনীয়তা নীতি অবলম্বন করার কারণে তাদের উদ্ভবের সময়কাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না।

ঐতিহাসিকদের মতামত প্রমাণ করে, দুইশত হিজরী সময়ের মধ্যে তাদের উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ, ইসলাম সম্পূর্ণরূপে বিস্তার ও বিজয়ী হওয়ার পর তাদের প্রকাশ ঘটে। ততোদিনে মাজুসি আগুন নিভে গেছে। ইহুদিবাদ ধ্বংস হয়েছে। মূর্তিপূজা মুছে গেছে এবং ক্রুসেডারদের পরাজয় ঘটেছে। ফলে এ পরাজিত গোষ্ঠিগুলো ইসলামবিদ্বেষের আগুন প্রজ্জলিত করার জন্য গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তারা কিছু কৌশল অবলম্বন করে। যেমন,

১. কুরআন-হাদিসের ভাষ্য ব্যাখ্যায় এমন সব ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করা, যেগুলো ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

২. শিয়া মতাদর্শ প্রকাশ করা। কারণ তারা জানত, একমাত্র শিয়া মতাদর্শই তাদের বক্তব্য ধারণ করে। শিয়া মতাদর্শ প্রকাশ বা শিয়া মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া ইসলামের ক্ষতি করার অন্য কোনো পথ নেই।[৬৬]

এই মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইমাম গাযালি রহ. বলেন, মাজুসি ও মুলহিদীনদের অন্যতম মাযদুকিয়্যা গোষ্ঠির সন্তানগণ, প্রাচীন নাস্তিক দার্শনিকদের একদল, খারমিয়া গোষ্ঠির একদল লোক এবং ইহুদি সম্প্রদায় এক সমাবেশে সমবেত হয়। নাদু শানু ইসলাম বিরোধী প্রোপাগাণ্ডা বাস্তবায়নের জন্য তাদেরকে একত্র করেছিল। সমাবেশে তাদের বক্তব্য ছিল, মুহাম্মদ আমাদের ওপর বিজয়ী হয়েছেন। আমাদের দীন বাতিল করে দিয়েছেন। তার ঐক্যবদ্ধ অনুসারীদের বিরুদ্ধে আমাদের মোকাবিলা সম্ভব নয়। মুসলমানদের হাতে অস্ত্র ও যুদ্ধ বলে যে দেশগুলো সংরক্ষিত আছে সেগুলো আমাদের ফিরে পাওয়ার সুযোগ নেই। এমনিভাবে তর্ক-বিতর্ক করেও তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ, তাদের মাঝে জ্ঞানী, আলেম, বিতার্কিক পণ্ডিত ও বিজ্ঞ গবেষক আছেন। সুতরাং

---

[৬৬] দেখুন! ফাযাইহুল বাতিনিয়্যাহ : ১৮-২০; বয়ানু মাযহাবিল বাতিনিয়্যাহ ওয়া বুতলানুহু : ১৯।

কৌশল অবলম্বন ব্যতীত কোনো উপায় নেই। অতঃপর তারা নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কৌশল অবলম্বন ও পরিকল্পনা তৈরি করে।

উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তাদের অন্যতম মাধ্যম ছিল, শিয়া মতাদর্শের মাধ্যমে মুসলিম ও রাফেযিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ। যদিও বাতেনিরা রাফেযিদের পথভ্রষ্টই মনে করে। তবে ইমাম গাযালির বক্তব্য অনুসারে তারা রাফেযিদেরকে সর্বাধিক স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন দুর্বলতম চিন্তার অধিকারী, অসম্ভব বিষয় গ্রহণে সহনীয় স্বভাবসম্পন্ন, মিথ্যা বানোয়াট বিষয়াদির সত্যায়নে অধিক অনুগত এবং ভিত্তিহীন মিথ্যা রেওয়ায়াত অধিক গ্রহণকারী মনে করে।[৬৭]

তাই তারা অনুসারী বাড়ানোর জন্য নিজেদের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও আকিদা-বিশ্বাস আড়াল করে বাহ্যত তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। ফলে তাদের বাহ্য দিক রাফেযি মতাদর্শ অনুসারে হলেও অভ্যন্তরে ছিল শুধুই কুফর। যেমনটি ইমাম গাযালি রহ. উল্লেখ করেছেন।[৬৮]

জনৈক আলেম বলেছেন, ইমামিয়া মতবাদ হলো বাতেনি মতাদর্শের চৌকাঠ। বাতেনি ও রাফেযিদের মাঝে আমরা যে কঠিন ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখি, এ-ই তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা।[৬৯]

২৭৮ হিজরীর ঘটনাবলি সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন, এ বছর কারামিতা সম্প্রদায় মাঠাচাড়া দিয়ে ওঠে। এরা ফালসাফা ও দর্শনের অনুসারী একদল যিন্দিক ধর্মহীন পারস্য অধিবাসী গোষ্ঠি। যারা যারাদাশত মুযদাকের নবুওয়াত বিশ্বাস করে। এরা হারাম বিষয়াবলিকে বৈধ মনে করে। তারা বাতিল চিন্তার অনুসারী। তাদের অধিকাংশই রাফেযি মতবাদে আনুগত্য স্বীকার করে এবং রাফেযি হিসেবেই বাতিল চিন্তা প্রকাশ করে। কারণ, রাফেযিরা মানুষ হিসেবে সবচেয়ে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন । ইসমাঈল বিন আরাজ বিন জাফর সাদিকের মতাদর্শের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তাদেরকে ইসমাঈলিয়া বলা হয়।[৭০]

---

[৬৭] ফাযাইহুল বাতিনিয়্যাহ : ১৯।
[৬৮] ফাযাইহুল বাতিনিয়্যাহ : ৩৭।
[৬৯] দেখুন! ফিরাকুন মুআসারা, ইওয়াজি : ১ : ২৭০।
[৭০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১ : ৬১।

## খ. বাতেনিদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস

বাতেনি মতবাদ, তাদের বিভিন্ন দল ও মাযহাবের তথ্য ও খবরাখবর অধ্যয়নকারী ব্যক্তি তাদের মতাদর্শে স্পষ্ট বিরোধ লক্ষ্য করেন। ভ্রান্ত বাতেনি ফিরকার অনুসারীরাই এর প্রধান হোতা। তাদের ইচ্ছাই ছিল, তাদের ব্যাপারে যেন মানুষের চিন্তা ও বক্তব্য পরস্পরবিরোধী হয়। এ চিন্তা থেকেই তারা যা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করে এবং যা ইচ্ছা সত্য বলে গ্রহণ করে। মিথ্যা, কূটকৌশল ও প্রতারণাই তাদের মতাদর্শের মূলভিত্তি। যেহেতু তারা বহুরূপী আকৃতি ধারণ ব্যতীত নিজেদের মতাদর্শ দাঁড় করাতে পারে না। এজন্যই ইমাম গাযালি রহ. বলেছেন, এ পর্যন্ত তাদের যে মতাদর্শ তুলে ধরেছি, তার নিশ্চিত দাবি হলো, তাদের থেকে বর্ণিত বিষয় ও মতামত বিরোধপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক হবে। কারণ, তারা কেবল একটি মাত্র কর্মপন্থায় মানুষকে সম্বোধন করে না। তাদের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে অনুসারীর সংখ্যা বাড়ানো। এজন্যই তাদের বক্তব্যগুলো সদা বিরোধপূর্ণ এবং মাযহাব বর্ণনায় তাদের মাঝে বৈপরিত্য পাওয়া যায়।[৭১]

পাঠকের কাছে এ কথা স্পষ্ট যে, বিভিন্ন মতাদর্শের কিছু বিকৃত চিন্তার সমষ্টিই হলো বাতেনি আকিদা বিশ্বাস। এর সবই এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, সাংঘর্ষিক ও বিরোধপূর্ণ বিষয়। তারা প্রয়োজন হলে কখনো কখনো বানোয়াট জাল হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করে আয়াতসমূহের ভাব ও বক্তব্য বিকৃত করে।

তাদের আকিদা বিশ্বাসের কিছু প্রধান দিক হলো,

১. মহান আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব অস্বীকার করা।

২. আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণসমূহ অস্বীকার করা।

৩. নবী ও রাসূলদের আনীত শরীয়ত ও শরয়ী বিধিবিধান বিকৃত করা। আর এ ক্ষেত্রেই তারা আহলে বাইতের সমর্থনের বা তাদের নতুন-পুরাতন ধ্যানধারণার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। প্রতীক ও মিথ্যা বানোয়াট বিষয় আবিষ্কারে তাদের সক্ষমতা ও বিস্ময়কর।

এসব আলোচনা অনেক বেশি সুবিস্তৃত। ইমাম গাযালি রহ. রচিত 'ফাযাইহুল বাতিনিয়্যাহ' এবং ইমাম আওযায়ী রহ. রচিত 'ফিরাকু মুআসারাহ' এ বিষয়ের খুবই উপকারী গ্রন্থ।

***

[৭১] ফাযাইহুল বাতিনিয়্যাহ : ৩৮।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ
# উত্তর আফ্রিকায় বাতেনী মতবাদ প্রচারকগণ

## আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ী

ইয়েমেনকে ইসমাঈলী শিয়া মতবাদের প্রচারকেন্দ্র হিসেবে নির্বাচন করা হয়। কারণ, ইয়েমেন আব্বাসীয় খেলাফতের দৃষ্টি থেকে দূরে ছিল। এখান থেকেই তারা গোপনে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করে। রুস্তম ইবনে হাওশাব নামে এক লোক ইয়েমেনে উক্ত সশস্ত্রবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সে কতিপয় পারসিককে কাছে টানতে সক্ষম হয়। যে পারসিকরা ছিল মুসলমানদের চরম শত্রুভাবাপন্ন। তার কাছে পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশসমূহকে শিয়া মতবাদ প্রচারের জন্য উর্বরভূমি মনে হয়। ইয়েমেন থেকে সে সুফিয়ান ও হালওয়ানী নামক তার দুই সমর্থককে শিয়া মতবাদ প্রচারের জন্য তারাবলুস ও তিউনিশিয়া পাঠায়। একজন ক্রান্সের গোত্রসমূহে নিজেদের বাতিল চিন্তা ছড়াতে সমর্থ হয়। এ গোত্রগুলো ছিল ব্যাপক সম্পদ, শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী। এরা আদারিসা রাজ বংশের অনুসরণে পশ্চিমাঞ্চলের প্রান্তে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল। যার রাজধানী হবে তিউনিস।

শিয়া মতবাদ প্রচারের জন্য ইবনে হাওশাব ইয়েমেনে যাদের নির্বাচন করে, আবু আবদুল্লাহ হাসান বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন যাকারিয়া শিয়ায়ী ছিল তাদের একজন। সে ছিল সানআর অধিবাসী। ইবনে হাওশাব তাকে নির্বাচনের কারণ ছিল, তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি সুস্পষ্ট ছিল। বিদ্যাবুদ্ধি এবং মানুষকে কাছে টানার যোগ্যতা ছিল তার।

আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ী ইয়েমেনী সানআনীকে পশ্চিমাঞ্চলে ইসমাঈলী রাফেযী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। শিয়া মতাদর্শের দুই প্রচারক আবু সুফিয়ান ও হালওয়ানীর মৃত্যুর পর আবু আবদুল্লাহকে প্রচারকের দায়িত্ব দিয়ে মরক্কোয় পাঠানো হয়। ইবনে হাওশাব তাকে বলে, মাগরিবের ভূমি চাষাবাদকৃত। হালওয়ানি ও সুফিয়ান তা চাষ করেছে। তারা মৃত্যুবরণ করেছে। তোমার জন্য এ ছাড়া অন্য কোনো ভূমি নেই। তুমি যাও, এ জমিন তোমার জন্য আবাদকৃত এবং প্রস্তুত।[৭২]

---

[৭২] দেখুন! মাওসুআতুল মাগরিবিল আরাবি, ড. আবদুল ফাত্তাহ : ২ : ৫৭।

২৮৮ থেকে ২৮৯ হিজরী সময়ের মধ্যে পথভ্রষ্ট, প্রতারক, ষড়যন্ত্রকারী এবং বিভিন্ন বিস্ময়কর কৌশল অবলম্বনকারী আবু আবদুল্লাহ মক্কা গমন করে। সেখানে হজে আগত মাগরিবের বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং মতবিনিময় করে। ওই অঞ্চলের হাজীদের কাছে সে নিজেকে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়। যুহদ, ফিকহ ও ইলম দেখিয়ে তাদের ঘনিষ্ঠ হয়। এই প্রতারক কাত্তানি শায়খদেরও মন জয় করে নেয়। সে তাদের ইঙ্গিত দেয় যে, সে শিশুদের কুরআন পড়ানোর জন্য মিসর যেতে চাচ্ছে। তারা তাকে মরক্কোয় যেতে আবেদন করে। তাদের অনুরোধে সে মরক্কোয় যেতে সম্মত হয়।

অতঃপর চক্রান্তের মাধ্যমে তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে কায়রাওয়ানে গমন করে। কায়রাওয়ানে অবস্থান করায় তার উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। যথা: আগালিবা সাম্রাজ্যের দুর্বল জায়গাগুলো চিহ্নিত করা, শক্তিশালী গোত্রসমূহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং মরক্কোয় প্রবেশের উপকারী পথ ও পন্থা সম্পর্কে জানা। সে নিশ্চিত হয়, মরক্কোয় কাত্তামিয়ারা সবচেয়ে শক্তিশালী সম্প্রদায়। তাই সে ইকজান যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে জানতে পারে, ইকজান হলো সাকতাতা সম্প্রদায়ের অধিবাস। আর তা কাত্তামা বংশেরই একটি গোত্র।[৭৩]

জীবদ্দশায় সে একজন দুনিয়াবিমুখ শিক্ষক, সংস্কারক ও মুত্তাকি ব্যক্তির ভাব ধারণ করে। এতে সে মানুষের মন জয় করতে সমর্থ হয়। চারদিকে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। বারবারিয়ান সম্প্রদায়গুলো তার কাছে আসতে শুরু করে। সে তাদের শিয়া মতাদর্শ শিক্ষা দেয়। ধীরে ধীরে সে রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে নিজের অবস্থান তৈরি করে।

লোকজন আগালিবা গোত্রের হাতে নিপীড়িত হওয়ার কারণে কিছু গোত্র শিয়া প্রচারক আবু আবদুল্লাহর দলে ভিড়ে। তারা আবু আবদুল্লাহকে নিজেদের ত্রাতা ও মুক্তিদাতা মনে করতে থাকে। অতঃপর আগালিবার সঙ্গে আবু আবদুল্লাহর সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। আবু আবদুল্লাহ তাজরূত অঞ্চলের আওরাস পর্বতের একটি কেল্লায় অবস্থান গ্রহণ করে। এখানে বসেই সে আগলাবিদের বিরুদ্ধে একের পর এক সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করতে থাকে। এতে সে আগলাবিদের দমন ও তাদের নিপীড়ন বন্ধে সমর্থ হয়। সে একথা ব্যাপকভাবে প্রচার করে যে, আগলাবিদের শাসনকার্য ইসলাম ও শরীয়ত বহির্ভূত। সে আগলাবি সাম্রাজ্য ও কিছু গোত্রের পুরোনো বিরোধ নতুন করে জাগিয়ে

---

[৭৩] প্রাগুক্ত : ২ : ৫৬।

তোলে। কতিপয় নেতা ও গোত্রপ্রধানের সঙ্গে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, ভবিষ্যতে তারাই ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যের অধিকারী হবে। এতে গোত্রসমূহ তার বশ্যতা শিকার করে এবং বিভিন্ন অঞ্চল তার অধীন হয়। বহু গনীমত লাভ করে এবং তার অনুসারীদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ শক্ত করতে থাকে। আগলাবিদের দুর্বলতা, আরাম ও বিলাসপ্রিয়তা এবং তাদের জুলুম অবিচারে মানুষ অতিষ্ট হওয়ার কারণে এটি তার পক্ষে আরও সহজ হয়। আবু আবদুল্লাহ যে সাহস, বীরত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সৈন্য নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়, তাতে তার সঙ্গে থাকা সেনা অফিসার ও সেনাসদস্যদের আস্থা ও নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। সে উপলব্ধি করে, তার দাওয়াত ও প্রচারকার্যের ঘোষণা দেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। যেখানে সে লোকজনকে রাসূল সা.-এর আলে বাইতের পক্ষাবলম্বনের দিকে আহ্বান করবে।

আবু আবদুল্লাহ আওরাস পর্বতে তার যে কেল্লা আছে, তা থেকে নিয়ে আগলাবিদের রাজধানী পর্যন্ত সবটুকু স্থানের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।

২৯৬ হিজরী মোতাবেক ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে জুমাদাল উলা মাসের প্রথমদিকে আবু আবদুল্লাহর সৈন্যদের হাতে আরিস শহর পদানত হয়। এ শহর ছিল ওই অঞ্চলের রাজনৈতিক রাজধানী কায়রাওয়ানের প্রবেশদ্বার। জুমাদাল উখরা ২৯৬ হিজরীতে যিয়াদাতুল্লাহ বাহিনী নিয়ে দ্রুত মিসর প্রত্যাবর্তন করে। আর আবু আবদুল্লাহ বিজয়ীবেশে কায়রাওয়ান প্রবেশ করে।[৭৪]

আগলাবিদের ওপর এ ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের পর আবু আবদুল্লাহ ঘোষণা করে, ওবায়দুল্লাহ মাহদী হলেন মুসলমানদের প্রকৃত নেতা ও ইমাম। অতিসত্বর তিনি মাগরিবে পৌঁছবেন। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এতে আগলাবি গোত্রের কতিপয় নেতা তার দলে ভিড়ে। ফলে তার সেনাবাহিনীতে সৈনিকের সংখ্যা দাঁড়ায় দুই লাখ। শিয়া ইসমাঈলী মতাদর্শের নতুন সাম্রাজ্য রক্ষায় এরা প্রস্তুত থাকে।

ইতিহাসের বিবরণ থেকে জানা যায়, প্রতিশোধ ও বিজয় সর্বদা মানুষকে প্রভাবিত করে। মানুষ ধারণা করতে থাকে, বিজয়ী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারীরাই সত্যের পক্ষে। শিয়া শক্তির বিস্তার ও বিজয় এবং প্রতীক্ষিত মাহদির প্রতি মানুষের ঈমানের ফলে তারা নিজেরাই একটি সৈন্যশক্তি হয়ে ওঠে। যাদের নিজস্ব কোনো বিচারবুদ্ধি ছিলো না। তারা হলো যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের ন্যায়।

---

[৭৪] প্রাগুক্ত : ২ : ৬০।

আবু আবদুল্লাহ নিজের মতাদর্শ প্রচারে লেখালেখি, বক্তব্য ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরামের সঙ্গে বিতর্কের কৌশল গ্রহণ করে। একবার শায়খ উসমান ইবনে সাঈদ হাদ্দাদের সঙ্গে তার বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

তবে ওলামায়ে কেরাম তার ও তার প্রচারকদের বিরুদ্ধে দলিল-প্রমাণ পেশ করলে তাদের কাছে সে হেরে যায়। এতে আবু আবদুল্লাহর ভাই আবুল আব্বাস উত্তর আফ্রিকার রাজধানী থেকে আহলুস সুন্নাহর মাযহাব উৎপাটনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। আহলুস সুন্নাহর ওলামায়ে কেরামকে বিভিন্নভাবে শাস্তি দেয় এবং তাদের ওপর বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন চালায়। ফকীহদের বেত্রাঘাত করে, কাউকে হত্যা করে, কারও জিহ্বা কেটে নেয়। কারো শরীর কেটে টুকরো টুকরো করে। কাউকে শূলিতে চড়ায়। জোরপূর্বক সম্পদ কেড়ে নেয়। দাসদের পদদলিত করতে নির্দেশ দেয়।

মাযহাবগত সংঘর্ষ ভয়াবহরূপ নিলে এবং নতুন জন্ম নেওয়া সাম্রাজ্য হুমকির সম্মুখীন হলে আবু আবদুল্লাহ বিতর্কসভা নিষিদ্ধ করে এবং তার ভাই আবুল আব্বাসকে কায়রাওয়ানের ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে।

কাত্তামা গোত্রের নেতাদের মাধ্যমে আবু আবদুল্লাহ কায়রাওয়ানে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। বিশেষত তাদের নেতা গাযবিয়া বিন ইউসুফ, তার ভাই ও অন্যদের মাধ্যমে। সে ওবায়দুল্লাহ মাহদী ও তার পুত্র কাসেমকে কায়রাওয়ানে আমন্ত্রন জানায়। উবায়দুল্লাহ সিরিয়ার সালমিয়া শহর থেকে নিজের গাট্টি-বোচকা গুটিয়ে মিসর চলে আসে। এরপর সে ব্যবসায়ী বেশে গোপনে তারাবলুসে গমন করে। আব্বাসিয়া খেলাফতের আমীরদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সিজিলমাসার বনু মিদরারের আমীরদের হাতে বন্দী হওয়া প্রসঙ্গে তার চমকপ্রদ কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত আছে।

২৯৭ হিজরী মোতাবিক ৯১০ খ্রিস্টাব্দ সনে আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ী একটি বিরাট বাহিনী তৈরি করে। এর মাধ্যমে সে বনু মিদরারকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়। সে উবায়দুল্লাহ মাহদী ও তার পুত্রকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে। ফেরার পথে সৈন্যবাহিনী তাহেরা দিয়ে গমন করে। তারা ২৯৭ হিজরী মোতাবিক ৯১০ খ্রিস্টাব্দে বনী রুস্তমের সাম্রাজ্য পরাভূত করে। ফলে মধ্য মরক্কো থেকে তিলমাসান পর্যন্ত উবায়দিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে।

উবায়দুল্লাহ মাহদী ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করে। সে মানুষকে ধোঁকা ও বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ সা.-এর একমাত্র কন্যা ফাতিমাতুয যাহরার

নামের সাথে সম্পৃক্ত করে নিজ সাম্রাজ্যের নামকরণ করে আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়্যাহ।

উক্ত কল্পিত ফাতেমি সাম্রাজ্য আব্বাসি খিলাফত নির্মূলের চেষ্টা শুরু করে। বিশেষত সিজিলমাসায় বনু মিদরার সাম্রাজ্য, তাহেরাতে রুস্তম সাম্রাজ্য এবং আফ্রিকায় (তিউনিস) আগালিবা সাম্রাজ্য ধ্বংসে সমর্থ হওয়ার পর তাদের এ প্রচেষ্টা আরও বেড়ে যায়।

২৯৭ হিজরী মোতাবেক ৯১০ খ্রিস্টাব্দে কায়রাওয়ানে উবায়দুল্লাহ মাহদীর বাইআত সম্পন্ন হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, দশ বছর স্থায়িত্ব লাভের পর আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ীর শাসনামল শেষ হয়।

বিদ্রোহের স্বভাবসিদ্ধ নীতি অনুযায়ী একের পর এক চক্রান্তের মধ্য দিয়ে উবায়দুল্লাহ মাহদী এবং তার সহযোগীবৃন্দ আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ী, তার ভাই আবুল আব্বাস ও গাববিয়া ইবনে ইউসুফের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে।

বর্তমানকাল ও প্রাচীনকালের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে বোঝা যায়, যদি কিছু ভালো ও কিছু অসৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে সকল বন্ধুভাবাপন্ন লোক ও ঘনিষ্ট লোকের শক্তিশালী কোনো অবস্থান থাকে তারা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং পরস্পরে সারিবদ্ধ হয়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ফ্রান্স বিপ্লব, জাযায়ের বিপ্লব, সিরিয়া, মিসর, লিবিয়া ও ইরাক বিপ্লবে এমনটিই ঘটেছে। প্রাচীনকালে ও বর্তমানকালেও ব্যাপারটি একইভাবে ঘটছে।

আমার কাছে মনে হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি সমাজ ও রাষ্ট্রসমূহে মহান আল্লাহর জারিকৃত বিধান من أعان ظالما سلطه الله عليه অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোনো অত্যাচারীকে সাহায্য করে, আল্লাহ তার ওপর অন্য কাউকে চাপিয়ে দেন-এই নীতির আলোকেই বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

এমনিভাবে আমি পাপীদেরকে একে অপরের সাথে যুক্ত করে দেব– তাদের কাজকর্মের কারণে।[৭৫]

---

[৭৫] সূরা আনআম : ১২৯।

—৫

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, উবায়দুল্লাহ মাহদী ও আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ীর মধ্যে বিরোধ তৈরি হয় অর্থ-সম্পদকে কেন্দ্র করে। যে সম্পদ হঠকারী মিথ্যুক উবায়দুল্লাহ মাহদী আত্মসাৎ করে। কারো কারো মতে, উবায়দুল্লাহ মাহদীর ব্যাপারে এক সময় আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ীর এ সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, সে প্রতীক্ষিত মাহদী নয়।

মাওসূআতুল মাগারিবিল আরাবিয়া প্রণেতা আবদুল ফাত্তাহ মুকাল্লিদ গানামী দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন, তবে কোনো কারণকে তিনি অগ্রাধিকার দেননি।[৭৬]

অতঃপর তিনি উবায়দিদের বংশ পরম্পরা সমর্থন করেন এবং তারা ফাতেমাতুয যাহরা রা.-এর বংশধর– এ মত ব্যক্ত করেন।

তিনি ওইসব লোককে আক্রমণ করেন, যারা উবায়দিদের বংশ নিয়ে অপবাদ আরোপ করে অথবা তাদেরকে ইহুদি বা অগ্নিপূজকদের সাথে সম্পৃক্ত করে। যারা তাদেরকে এ অপবাদ দেয় যে, তারা বাগদাদে আব্বাসী খিলাফতের এবং আন্দালুসে উমাইয়া খিলাফতের মিত্র ছিল এবং এই দুই খিলাফতই উবায়দিদের বংশের ওপর তীব্র আক্রমণ চালায়।

আমি বলবো, আল্লামা ইবনে কাসির রহ., যিনি আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে উবায়দি বংশের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের অভিযোগের কথা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রমাণের অধিকারী। সনদের দিক থেকে মজবুত। সাম্রাজ্যসমূহ ও সেগুলোর প্রতিষ্ঠাতাদের বিষয়ে সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন। তিনি সত্যবাদিতা ও চূড়ান্ত পর্যায়ের আমানত রক্ষার বিষয়ে প্রসিদ্ধ। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে তার বক্তব্য স্পষ্ট। বিপরীতে ইবনুল আসীর রহ. দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলেননি। তিনি মূল কথা স্পষ্ট না করে তাদের বংশ প্রমাণের দিকে ঝুঁকেছেন। আল-কামিল ফিত তারীখ গ্রন্থে তিনি এমনটি করেছেন।[৭৭]

তিনি শিয়া মতবাদে অনুরাগী হিসেবে পরিচিত। ইবনে তাইমিয়া রহ. তার ফতোয়ায় দৃঢ়তার সঙ্গে স্পষ্টভাবে তাদের ফাতেমি বংশ প্রমাণিত না হওয়ার কথা বলেছেন। শক্তিমান ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকানের সাক্ষ্য আপনার সামনে পেশ করছি। তিনি বলেন, বিজ্ঞ গবেষকগণ তার বংশীয় দাবি প্রত্যাখান করেন। তারা লিখেন, ফাতেমি এই গোষ্ঠীটি যে নিজেদেরকে ফাতেমি বংশের

---

[৭৬] প্রাগুক্ত : ৭০।

[৭৭] দেখুন, আল-কামিল ফিত তারীখ : ৫ : ১১।

দিকে সম্পৃক্ত করে তা তাদের মুখের দাবি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তারা শামের সালমিয়া এলাকার এক ইহুদির বংশোদ্ভূত। কাদ্দাহ ছিল তার পিতার উপাধি। কারণ সে চোখের ডাক্তার ছিল। সে চোখে সুরমা লাগিয়ে দেওয়ার কাজ করতো। ৩২২ হিজরীতে উবায়দুল্লাহ মৃত্যুবরণ করে। তখন তার নাতি মুঈয মিসরের ক্ষমতা দখলে সমর্থ হয়। প্রায় দুই শতক পর্যন্ত উবায়দিরা ক্ষমতায় বহাল থাকে। সর্বশেষ ৫২৪ হিজরীতে ইসলামের মহাবীর সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহ. তাদের সমূলে উৎপাটন করেন। তিনি মিসর থেকে উবায়দিদের সকল চিহ্ন মুছে দেন। মানুষের ওপর থেকে তাদের মন্দাচার দূর করেন। তাদের থেকে আল্লাহর বান্দাদের শান্তি প্রদান করেন।[৭৮]

যাইহোক, তাদের কাজ ও আকিদা-বিশ্বাস একথা প্রমাণ করে যে, নবী বংশের মুসলিম সন্তানগণ, তাদের নেককার পবিত্র আলেমগণ এবং তাদের শ্রেষ্ঠ ফকিহগণ তাদের এ সকল জঘন্য উক্তি ও নিকৃষ্ট কাজ থেকে মুক্ত।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ীর কাছে যখন একথা স্পষ্ট হয় যে, উবায়দুল্লাহ মাহদী একজন ক্ষমতালোভী ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি, সে তার সম্মান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, এমনকি সে তার নিজ দাবি থেকে দূরে তখন সে তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করে। সে তার আশপাশের লোকজনকে বোঝাতে শুরু করে যে, সে ওই ব্যক্তি নয়- যা সে নিজের সম্পর্কে দাবি করে। কিন্তু উবায়দুল্লাহ মাহদী ছিল তার চেয়েও বেশি ধুরন্ধর। সে-ই প্রথম আবু আবদুল্লাহ থেকে নিষ্কৃতি পেতে সমর্থ হয়। তার বংশের বিষয়ে সুস্পষ্ট সত্য কথা হল, সে তার বংশ বিষয়ে মিথ্যা দাবিদার। আহলে বাইতের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তার জীবনী আলোচনায় এ বিষয়ে তথ্য-প্রমাণ উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

***

[৭৮] ফিরাকুন মুআসারা : ১ : ২৮৯।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## প্রথম রাফেযি শিয়া খলিফা উবায়দুল্লাহ মাহদি

(২৯৮-৩২২ হিজরী মোতাবিক ৯১০-৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ)

সিয়ারু আলামিন নুবালা গ্রন্থে ইমাম যাহাবি রহ. উবায়দুল্লাহ মাহদীর জীবনচরিত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ আবু মুহাম্মদ খারেযি উবায়দিয়া বাতেনি মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম খলিফা। যারা ইসলামকে পরিবর্তন করে, রাফেযি মতবাদ ধারণের ঘোষণা দেয়। ইসমাঈলিয়া মতাদর্শকে লুকিয়ে রাখে। তারা বিশ্বের দিকে দিকে নিজ নিজ মতবাদ প্রচারকদের ছড়িয়ে দেয়। তারা বেদুইন ও অজ্ঞ মানুষদের বিভ্রান্ত করতে থাকে।[৭৯]

ইমাম যাহাবী রহ. তার বংশ সংক্রান্ত বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেন, বিজ্ঞ গবেষকদের বক্তব্য হলো, সে মিথ্যাবাদি। তা এভাবে যে, সায়্যিদ ইবনে তাবাতাবা যখন তাদের নেতা মুঈযকে তার বংশের কথা জিজ্ঞাসা করলেন তখন সে বলল, আগামীকাল তা আপনাকে বের করে দেব। অতঃপর এ ঘটে যে, সে একটি স্বর্ণের টুকরা নিক্ষেপ করে। তরবারি খাপ থেকে অর্ধেক টেনে বের করে আর বলে, এ আমার বংশ তালিকা। আর লোকদেরকে স্বর্ণ কেড়ে নিতে আদেশ করে বলে, এ হলো আমার বংশীয় গৌরব।[৮০]

তবে লিবিয়ার মুফতি শায়খ তাহের যাভি রহ. উবায়দুল্লাহ মাহদীর জীবনী উল্লেখ করে বলেন, সে উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেখানকার প্রথম শাসক। সে ইরাকী বংশোদ্ভূত। ২৬০ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করে। এরপর উত্তর শামে ইসমাঈলী বাতেনিদের কেন্দ্র সালমিয়া শহরে আত্মগোপন করে। জন্মের পর থেকে সালমিয়াতেই অবস্থান করে। সেখানে তার নাম ছিল, সাঈদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মায়মূন আল কাদ্দাহ।

ইসমাঈলিয়াদের প্রাণকেন্দ্র সালমিয়া শহরে মৃত্যুবরণ করে আলি বিন হাসান বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন জাফর সাদেক। ইসমাঈলিরা তার নামে অনেকগুলো গোপন মাজার প্রতিষ্ঠা করে। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, আধ্যাত্মিক

---

[৭৯] দেখুন! সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৫ : ১৪১।

[৮০] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৫ : ১৪২।

বিবাহের মাধ্যমে ইসমাইল বিন জাফর সাদেকের বংশ থেকে তাদের সন্তানের দিকে ইমামত স্থানান্তর করা হবে।[৮১]

মুফতি তাহের যাভি রহ. এরপর বলেন, এ হলো উবায়দুল্লাহ মাহদীর আসল রূপ। এ হলো তার দিকে সম্বন্ধিত উবায়দিদের আসল সত্য।

মরক্কো ও অপরাপর অঞ্চলের সব মুসলমান ইসমাঈল বিন জাফর সাদিকের দিকে তাদের বংশীয় নিসবতের বিরোধিতা করেছেন। তাদের এই বংশ যারা প্রত্যাখ্যান করেছেন তাদের মাঝে সর্বাগ্রে রয়েছেন আলি রা. এর বংশের মহান ব্যক্তিগণ। তারা মূলত সাঈদ বিন আহমদ কাদ্দাহের দিকে সম্বন্ধিত। তারা দাবি করে, সে আধ্যাত্মিক বিবাহসূত্রে ইসমাঈল বিন জাফর সাদিকের সন্তান। ইতিপূর্বে আমরা সে কথা উল্লেখ করেছি।

উবায়দুল্লাহ মাহদী তার প্রতিপক্ষ থেকে নিষ্কৃতি লাভের পর কায়রাওয়ান ও উত্তর আফ্রিকায় তার মাযহাব প্রচারের ইচ্ছা করে। কিন্তু আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সম্মুখ সারির আলেমগণ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তারা মানুষকে বোঝাতে সমর্থ হন যে, উবায়দি সাম্রাজ্য ইসলামি শরীয়ত বিরোধী একটি কাফের সাম্রাজ্য। উবায়দিয়া ও আহলুস সুন্নাহর মাঝে কয়েকটি বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফলে উবায়দিয়া মাহদী মাহদিয়া নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করার পর সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। উক্ত দুর্গ নির্মাণ ও মজবুত করতে সে বহু সম্পদ ব্যয় করে। তবে উত্তর আফ্রিকার স্থিরতা ও শান্তিকামী জনগণ উবাদিয়াদের এড়িয়ে চলে। কারণ আহলুস সুন্নাহর উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। তাই সে অস্ত্র শক্তিবলে কিছু শহর নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেয় এবং মিসরে রাজ্য স্থানান্তরের চিন্তা করে। মিসর দখলে একাধিকবার সেনাভিযান পরিচালনা করে। তবে আব্বাসী সৈন্যবাহিনীর সামনে সবগুলোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ যুদ্ধগুলোতে মুআন্নিস খাদিম আব্বাসী সেনাদের নেতৃত্ব দেন।

মিসরের ওপর এ আক্রমণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ আক্রমণ হয় ৩২১ হিজরীতে। মুহাম্মদ ইখশিদির চেষ্টার বদৌলতে আব্বাসীরা এ আক্রমণ ঠেকাতে সমর্থ হয়।[৮২]

---

[৮১] তারীখুল ফাতহিল আরাবি ফী লিবিয়া : ২৫৩।
[৮২] মাওসূআতু তারীখিল মাগরিবী : ২ : ৭৬।

উবায়দুল্লাহ তার শাসন ক্ষমতায় ধারাবাহিক বহাল থাকার পর ৩২২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তার সাম্রাজ্যের সময়কাল ছিল ২৫ বছর কয়েক মাস।[৮৩]

এদের এ বিষয়ে অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মাসামিদ ও কাত্তামা গোত্রসমূহ উবায়দিয়াদের মতবাদ সমর্থন করে। কারণ, তাদের ধারণায় সে ছিল প্রতীক্ষিত মাহদী। ইসলামি ইতিহাসের অনেকগুলো বিদ্রোহ এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ আকিদা বিশ্বাসকে ভিত্তি করে। তাই আমার কাছে খুবই সঙ্গত ও গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে, এ মাসআলায় আহলুস সুন্নাহর নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত সহিহ আকিদা বর্ণনা করে প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদী বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব। যাতে মিথ্যাবাদী দাজ্জালদের চিনতে মানুষের সুবিধা হয়। সুতরাং উবায়দুল্লাহ মাহদির জীবনী উল্লেখ করার পর আমরা ইমাম মাহদী বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকিদা উল্লেখ করবো।

আমরা দেখতে পাই, উবায়দুল্লাহ মাহদী তার ভ্রান্ত দাবির ওপর নির্ভর করে নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে। এমনকি আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ী তার ব্যাপারে বারবার মানুষের বিশ্বাস ওলটপালট করে দেওয়ার পরও সে এই দাবির ওপর বহাল থাকতে সমর্থ হয়।

একবার তার কাছে কাত্তামা গোত্রের সর্দার উপস্থিত হলো, সে উবায়দুল্লাহ মাহদীকে বললো, আমরা আপনার বিষয়ে সংশয়ে পড়েছি। আপনি নিজের সত্যতার ওপর প্রমাণ পেশ করুন। মাহদী তার জবাবে এমন কিছু উত্তর দিল, যেগুলো তার কাছে যৌক্তিক মনে হলো। মাহদী বললো, এখন তোমরা নিশ্চিত হয়েছো। আর নিশ্চয়তা কেবল নিশ্চয়তা দিয়েই দূর হয়। সন্দেহ বা সংশয় দিয়ে নয়।

আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ী ইমাম মাহদী সম্পর্কিত যে সকল সংশয়পূর্ণ বিষয় কাত্তামা গোত্রের নেতাদের সামনে পেশ করে তা হলো, ইমাম কোনো ঘটনা ঘটার আগে সে সম্পর্কেও জানতে পারেন। তার সঙ্গে তার দুই ছেলেও রয়েছে। সে বলেছে, তার পরে ইমাম হবে তার ছোটো পুত্র। অথচ তার ভবিষ্যদ্বাণীর বিশ দিন পর সে মৃত্যুবরণ করেছে। (সুতরাং সে প্রতীক্ষিত মাহদী নয়)। কাত্তামা গোত্রের প্রধান নেতা যখন উবায়দুল্লাহ মাহদীকে তার পুত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তখন সে বলল, সে (তার শিশুপুত্র) এখনো মারা

---

[৮৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৫ : ১৫১।

যায়নি। নিশ্চয় সে তোমাদের ইমাম হবে। আর ইমামগণ স্থানান্তর হন। সে অন্য একটি এলাকা সংশোধন করতে স্থানান্তরিত হয়েছে। তখন কাত্তামা গোত্রের প্রধান সর্দার বলল, আমি বিশ্বাস করলাম।

আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ী বলল, ইমাম রেশম ও স্বর্ণ পরেন না। অথচ উবায়দুল্লাহ দুটোই পরে। স্ত্রীদের ব্যতীত অন্য কারও সঙ্গে মিলন করে। কাত্তামা গোত্রের প্রধান যখন উবায়দুল্লাহ মাহদীকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তখন সে বলল, আমি শরীয়তের স্থলাভিষিক্ত। আমার যা ইচ্ছা নিজের জন্য তা হালাল করে নেব। সব সম্পদ আমার। আর যিয়াদুল্লাহ ছিল আত্মসাৎকারী।[৮৪]

এসব বর্ণনা এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মিথ্যাবাদিরা এসব ক্ষেত্রে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে অপ্রতুল মনে করে। তাদের অজ্ঞতা, আহলে বাইতের প্রতি সম্মান, প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদীর প্রতি ঈমানের কারণে তারা ইমামগণের কথাবার্তার ওপর মানুষের বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে তাদেরকে বিপথগামী করে। এ প্রেক্ষিতে পরবর্তী পরিচ্ছেদে প্রতীক্ষিত মাহদী বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকিদ-বিশ্বাস উল্লেখ করা হলো।

***

---

[৮৪] প্রাগুক্ত : ১৫ : ১৪৬।

## ইমাম মাহদি[৮৫]র ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা

সহিহ হাদিসের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, মহান আল্লাহ তাআলা শেষ যুগে আহলে বাইত থেকে এমন একজন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটাবেন– যার মাধ্যমে তিনি দীনকে শক্তিশালী করবেন। তিনি সাত বছর রাজত্ব করবেন। ইনসাফ ও শান্তি দিয়ে তিনি ভূপৃষ্ঠ ভরে দেবেন। যেমন এখন তা অবিচার ও অত্যাচারে ভরে গেছে। তার সময়ে উম্মতে মুহাম্মদী এত বেশি নেয়ামত পাবে, যা ইতোপূর্বে এ উম্মত পায়নি। জমিন ফসল উৎপন্ন করবে। আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করবে। আল্লাহ তাআলা অসংখ্য অগণিত সম্পদ দান করবেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, তার যুগে অধিক পরিমাণে ফল-ফলাদি, প্রচুর ফসল ও পর্যাপ্ত অর্থ-সম্পদ হবে। অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা হবে। দীন হবে প্রতিষ্ঠিত। শত্রু হবে বাধ্যগত। তার শাসনকাল জুড়ে কল্যাণ স্থায়ী হবে।[৮৬]

### নাম ও বৈশিষ্ট্য

তার নাম হবে রাসূল সা. এর নামে। তার পিতার নামও রাসূল সা.-এর পিতার নামানুসারে হবে। সুতরাং তার নাম হবে, মুহাম্মদ বা আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ। তিনি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ সা. এর পুত্র হযরত হাসান রা. এর বংশে জন্মগ্রহণ করবেন।

ইবনে কাসীর রহ. ইমাম মাহদী সম্পর্কে বলেন, তিনি হলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আলাভী ফাতেমি হাসানি রহ.। তার বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি উজ্জ্বল চেহারা ও বাঁকানো নাকের অধিকারী হবেন।[৮৭]

### আবির্ভাবের স্থান

পূর্ব দিক থেকে ইমাম মাহদির আবির্ভাব হবে। হাদিস শরিফে এসেছে,

---

৮৫.ইমাম মাহদী সংক্রান্ত সকল আলোচনা আমি আশরাতুস সাআ নামক গ্রন্থ থেকে চয়ন করে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। এটি ড. ইউসুফ ওয়াবিলের ডক্টরেটের থিসিস গ্রন্থ।

৮৬ আন-নিহায়াহ, ড. তহা যাইনী সম্পাদিত : ১ : ৩১।

৮৭ প্রাগুক্ত : ১ : ২৯।

১. হযরত সাওবান রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন,

يقتل عند كنزكم ثلاثة، كلهم ابن خليفة، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم.

তোমাদের খনির কাছে তিনজন নিহত হবে। তিনজনই খলিফার পুত্র। অতঃপর পূর্ব দিকে কালো ঝাণ্ডাসমূহ উত্তোলিত হবে। তারা তোমাদের ওপর ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড চালাবে, যা ইতোপূর্বে কেউ করেনি।

রাসূল সা. আরও কিছু কথা বললেন। আমার কাছে তা সংরক্ষিত নেই। অতঃপর তিনি বলেন,

فإذا رأيتموه فبايعوه و لو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي.

তোমরা তাকে দেখলে তার হাতে বায়আত হবে। বরফে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও বায়আত হবে। সে আল্লাহর খলিফা মাহদি।[৮৮]

আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. বলেন, উক্ত হাদিসে কানয বা খনি দ্বারা কাবার কানয উদ্দেশ্য। তিন খলিফা পুত্র তা নেওয়ার জন্য তার নিকটে যুদ্ধ করবে। এটি শেষ যুগ হবে। তখন মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে। তার আবির্ভাব হবে পূর্বাঞ্চল থেকে। সারাদিবে সামিরা থেকে তার আবির্ভাব হবে না। যেমনটি মূর্খ রাফেযিরা মনে করে। তাদের বিশ্বাস, তিনি এখনো সেখানে বিদ্যমান আছেন। তারা শেষ যুগে তার আবির্ভাবের অপেক্ষা করছে। এটি এক প্রকার অর্থহীন প্রলাপ ও নৈরাশ্য- যা শয়তান অপেক্ষা মারাত্মক। কারণ, কুরআন বা হাদিসে এর পক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণ নেই। সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধিও তা গ্রহণ করবে না।

ইবনে কাসির রহ. এ পর্যন্ত এসে বলেন, আহলে মাশারিকের একদল মানুষের মাধ্যমে তার শক্তি বৃদ্ধি করা হবে। তারা তাকে সহযোগিতা করবে। তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করবে। তার ভিত সুসংহত করবে। তাদের ঝাণ্ডাও হবে কালো। তা এমন একটি বস্ত্র খণ্ড- যাতে সম্মান ও গাম্ভীর্য থাকবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সা. এর ঝাণ্ডাও কালো ছিল। তাকে ইকাব বলা হতো।

---

[৮৮] সুনানে ইবনে মাজাহ : ২ : ১৩৬৭; মুস্তাদরাকে হাকিম : ৪ : ৪৬৪; তিনি বলেছেন, হাদিসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. এর শর্তানুযায়ী সহিহ। ইমাম যাহাবি রহ. তাদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এরপর তিনি বলেন, হাদিসের ভাষ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রতীক্ষিত ও প্রশংসিত মাহদী শেষ যুগে পশ্চিম দিক থেকে আবির্ভূত হবেন। বায়তুল্লাহর কাছে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করা হবে। যেমনটি কোনো কোনো হাদিসের ভাষ্য থেকে বুঝে আসে।[৮৯]

২. ইমাম বুখারি রহ. হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم و إمامكم منكم!

ওই সময় তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. অবতরণ করবেন। আর তোমাদের ইমাম হবেন তোমাদের থেকেই?[৯০]

৩. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি,

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة.

আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের পক্ষে স্পষ্টভাবে জিহাদ করে যাবে। তিনি এটাও বলেছেন,

فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، فيقول أميرهم: تعال صل بنا فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة.

অতঃপর ঈসা আ. অবতরণ করবেন। এরপর তাদের আমির বলবেন, আসুন, আমাদের ইমামতি করুন। আমাদের সঙ্গে নামায পড়ুন। তিনি বলবেন, তোমরা সকলে একে অন্যের ওপর আমির। এ হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ উম্মতের সম্মান।[৯১]

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত এ সকল হাদিসমালা থেকে দুটি বিষয় বুঝে আসে,

---

[৮৯] আন-নিহায়া : ১ : ৩১।
[৯০] সহিহ বুখারি; ফাতহুল মুলহিম : ৬ : ৪৯১।
[৯১] সহিহ মুসলিম : ২ : ১৯৩।

ক. হযরত ঈসা আ. আসমান থেকে অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে উম্মতে মুহাম্মদীর কেউ একজন নেতৃত্বে থাকবেন।

খ. উক্ত আমিরের নামাযের জন্য উপস্থিত হওয়া, মুসলমানদের নিয়ে নামাযে ইমামতি করা এবং ঈসা আ. এর অবতরণের সময় তাকে ইমামতি করতে বলা, একথা প্রমাণ করে যে, উক্ত ইমাম সঠিক। তিনি হিদায়াতের ওপর থাকবেন।

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত উক্ত হাদিস সমূহের ব্যাখ্যায় হাদিসের সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসগুলো প্রমাণ করে, উক্ত সৎকর্মশীল ব্যক্তির নাম হবে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। তাকে মাহদী বলা হবে। আর মূলনীতি আছে, এক হাদিস অন্য হাদিসের ব্যাখ্যা করে।

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন,

منا الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه.

আমাদের থেকে এমন ব্যক্তিও হবে, যার পেছনে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. নামায পড়বেন।[৯২]

২. হযরত জাবির রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন,

ينزل عيسى ابن مريم، فيقول أميرهم المهدي : تعال صل بنا، فيقول : لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله هذه الأمة.

হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. অবতরণ করবেন। তাদের আমির মাহদী বলবেন, আসুন, আমাদের সঙ্গে নামায পড়ুন। তিনি বলবেন, না। তাদের একে অন্যের আমীর। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি এই উম্মতের সম্মান।[৯৩]

৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন,

المهدي مني أجلى الجبهة، أقني الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما و جورا، يملك سبع سنين.

---

[৯২] আবু নুআইম : ৫ : ৭১৭০।
[৯৩] আল-মানারুল মুনীফ, ইবনুল কায়্যিম : ১৪৭-১৪৮।

ইমাম মাহদি হবেন আমার উম্মত থেকে। তার কপাল হবে উজ্জ্বল, নাক সরু। ভূ-পৃষ্ঠকে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়তায় পূর্ণ করে দেবেন তিনি। যেমনিভাবে আগে তা জুলুম ও অবিচারে পূর্ণ হয়েছে। তিনি সাত বছর রাজত্ব করবেন।[১৪]

## এক. ইমাম মাহদি সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসের তাওয়াতুর

১. আল্লামা শাওকানী রহ. বলেন, প্রতীক্ষিত মাহদির আবির্ভাব সম্পর্কে বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহের মুতাওয়াতির হাদিসের সংখ্যা ২৫। এর মধ্যে সহিহ, হাসান, যয়ীফ সবরকম হাদিস আছে। উসূলের কিতাবসমূহে লিখিত সবরকম পারিভাষিক সংজ্ঞার বিচারেই এটি মুতাওয়াতির পর্যায়ভুক্ত। এছাড়া মাহদি সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত স্পষ্ট হাদিসের সংখ্যাও অনেক বেশি। কারণ, এ বিষয়ে ইজতিহাদের সুযোগ নেই। (আত-তাওযীহ ফী তাওয়াতুরি মা জা-আ ফিল মাহদিল মুনতাযার ওয়াদ্দাজ্জাল ওয়াল মাসীহ)

২. নবাব সিদ্দীক হাসান খান রহ. বলেন, বিভিন্ন প্রকার রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে প্রতীক্ষিত মাহদি সম্পর্কিত হাদিসের সংখ্যা অনেক বেশি। যেগুলো অর্থগত তাওয়াতুরের স্তরে পৌঁছে। সুনান, মুজাম, মুসনাদ ইত্যাদি ইসলামের তথ্য-গ্রন্থাদিতে এ হাদিসগুলো বিদ্যমান রয়েছে। (আল-ইযাআতু লিমা কানা ওয়া মা য়াকূনু বাইনা য়াদাইস সা-আ : ১১২)

৩. হযরত মুহাম্মদ বিন জাফর কাত্তানি রহ. বলেন, সারকথা হলো, প্রতীক্ষিত মাহদি সম্পর্কিত হাদিসসমূহ মুতাওয়াতির। এমনিভাবে দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসসমূহও মুতাওয়াতির। এমনিভাবে হযরত ঈসা আ. এর অবতরণ সংক্রান্ত হাদিসসমূহও তাওয়াতুরের স্তরে উন্নীত। (নাযমুল মুতানাসির মিনাল হাদীসিল মুতাওয়াতির : ১৪৭)

হাদিসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি যেমন সুনানে আরবাআ, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে আবু ইয়ালা, মুসনাদে হারিস ইবনে আবু উসামা, মুস্তাদরাকে হাকেম, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, সহিহ ইবনে

[১৪] সুনানে আবি দাউদ : ৪২৬৫।

খুযাইমা ইত্যাদি হাদিসের গ্রন্থাবলিতে ইমাম মাহদি সম্পর্কিত হাদিস থাকলেও উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন।[৯৫]

এগুলোতে তারা মাহদি সম্পর্কিত হাদিসের বিশাল ভাণ্ডার একত্র করেছেন।

## দুই. ইমাম মাহদি সম্পর্কিত হাদিস অস্বীকারকারী এবং তাদের মত খণ্ডন

দুঃখের বিষয় হলো, একদল লেখক যেমন তাফসিরে মানার প্রণেতা মুহাম্মদ রশিদ রেজার মতো ব্যক্তি ইমাম মাহদি সম্পর্কিত হাদিসসমূহকে বিরোধপূর্ণ ও বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। তাদের মতে, ইমাম মাহদির বিষয়টি শিয়াদের আবিস্কৃত একটি উপাখ্যান ব্যতীত কিছু নয়। পরবর্তীতে আহলুস সুন্নাহর কিতাবসমূহে এটি প্রবেশ করেছে।[৯৬]

অস্বীকারকারীদের মধ্যে আরও আছেন, 'দায়িরাতুল মাআরিফিল করনিল ইশরীন' প্রণেতা মুহাম্মদ ফরীদ ওয়াজদী।[৯৭]

আহমদ আমীনও 'দুহাল ইসলাম' গ্রন্থে ঠিক এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবনে খালদূন ইমাম মাহদি সম্পর্কিত হাদিসগুলোকে যয়ীফ বলেছেন। সেখান থেকেই এ সকল লেখক প্রভাবিত হয়েছেন।

যদিও এটা জানা কথা যে, ইবনে খালদূন এ ময়দানের নীতিনির্ধারক নন। হাদিসকে সহিহ বা যয়ীফ বলার ক্ষেত্রে তার মতামতও গ্রহণযোগ্য নয়। এতদসত্ত্বেও তিনি ইমাম মাহদি সম্পর্কিত অনেক হাদিস উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলোর অধিকাংশের সনদ সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপনের পর বলেছেন, এ হলো ইমাম মাহদি সম্পর্কে ইমামদের বর্ণিত হাদিসের সমষ্টি। আমার মতে হাদিসগুলোর স্বল্পসংখ্যক বা খুব কম সংখ্যকই সমালোচনায় উত্তীর্ণ।[৯৮]

শায়খ ইউসুফ আল-ওয়াবিল 'আশরাতুস সাআ' গ্রন্থে ইবনে খালদূনের বক্তব্যের টীকায় বলেছেন, ইমাম মাহদির আবির্ভাবের পক্ষে যদি একটিমাত্র

---

[৯৫] আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল আছার ফিল মাহদিল মুনতাযার লিল ইবাদ : ১৬৬-১৬৮।

[৯৬] তাফসীরুল মানার : ৯ : ৪৯৯-৫০৪।

[৯৭] দায়িরাতুল মাআরিফিল করনিল ইশরীন : ১০ : ৪৮০।

[৯৮] মুকাদ্দিমাতু ইবনি খালদূন : ১ : ৫৭৪।

হাদিসও সহিহ প্রমাণিত হয় তবে প্রমাণ হিসেবে সেটিই যথেষ্ঠ। তা কীভাবে হতে পারে, অথচ সেখানে তার সম্পর্কে অনেকগুলো মুতাওয়াতির হাদিস বর্ণিত আছে।[৯৯]

ইবনে খালদূনের বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে শায়খ আহমদ শাকের বলেন, জারাহ তাদিলের আগে মুহাদ্দিসগণের এ মূলনীতি ইবনে খালদূন ভালো বুঝেননি। যদি তিনি মুহাদ্দিসদের বক্তব্যগুলো জানতেন এবং সেগুলো ভালোভাবে বুঝতেন তবে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটা দিতেন না। হতে পারে তিনি জানতেন এবং বুঝতেন। কিন্তু তার সময়ের যে রাজনৈতিক চিন্তা তার ওপর প্রভাব ফেলেছে তার ওপর নির্ভর করে তিনি ইমাম মাহদি সম্পর্কিত হাদিসসমূহ যয়ীফ সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন।[১০০]

আহমাদ শাকের রহ. এরপর বর্ণনা করেছেন, ইবনে খালদূন (রহ.) ইমাম মাহদি বিষয়ে যে আলোচনা পেশ করেছেন, তা আসমায়ে রিজাল বিষয়ক ভুলে ভরপুর। তিনি এ সংক্রান্ত ইলালও নকল করেছেন। অতঃপর তিনি তার পক্ষ থেকে এ ওজর পেশ করেছেন যে, এ ভুলগুলো হয়তো প্রতিলিপিকার ও সম্পাদকদের উদাসীনতার কারণে হয়েছে।

মুহাম্মদ রশীদ রেজা, ইবনে খালদূন ও মুহাম্মদ ফরীদ ওয়াজদি রহ. যে মত পেশ করেছেন, তা সঠিক নয়। কিতাবুল্লাহ ও রাসূল সা.-এর সুন্নাহয় এর বিশদ প্রমাণ রয়েছে। ইমাম মাহদি আবির্ভাব সম্পর্কিত হাদিসসমূহ সহিহ এবং অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। এটাই যথেষ্ট। তবে এটা ঠিক যে, হাদিসগুলোর মধ্যে কিছু ইসরাঈলী বর্ণনা প্রবেশ করেছে। কিছু আছে শিয়াপ্রভৃতি গোড়া দলগুলোর তৈরিকৃত জাল হাদিস। কিন্তু হাদিসের ইমামগণ কোন হাদিস সহিহ, কোনটি সহিহ নয়, তা স্পষ্ট করেছেন। মওযু ও যয়ীফ বর্ণনা সম্পর্কে তারা বড় বড় গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। রিজালশাস্ত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নীতিমালা তৈরি করেছেন। এমনকি এমন কোনো বিদআতি মিথ্যাবাদী নেই, যার সম্পর্কে তারা স্পষ্ট কথা বলে যাননি। সুতরাং আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে সুন্নাহকে তামাশাকারীদের তামাশা থেকে, সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে এবং বাতিলের জোচ্চুরি থেকে হেফাযত করেছেন। এভাবেই মহান আল্লাহ এই দীন-ইসলামকে হেফাযত করেন।

---

[৯৯] আশরাতুস সা-আ, ওয়াবিল : ২৬৭।

[১০০] তালীকু আহমাদ শাকের আলা মুসনাদিল ইমাম আহমাদ : ৫ : ১৯৭-১৯৮।

ইমাম মাহদি সম্পর্কে কেবলই গোড়ামী থেকে উদ্ভূত কিছু জাল বর্ণনা আছে বলে আমরা বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলো বর্জন করতে পারি না। বিশুদ্ধ রেওয়ায়াতসমূহে তার বৈশিষ্ট্য, নাম ও পিতার নাম এসেছে। এখন যদি কেউ কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট মনে করে যে, সে-ই মাহদি এবং এ সম্পর্কিত হাদিস সমূহের সাহায্য না নেয় তবুও তা হাদিসে বর্ণিত ইমাম মাহদির অস্বীকারের দিকে যাবে না। শেষ কথা হলো, কেউ তার জন্য মানুষকে ডাকবে, এমন কিছুর প্রতি ইমাম মাহদি মুখাপেক্ষী হবেন না; বরং মহান আল্লাহ যখন ইচ্ছা তাকে প্রকাশ করবেন। মানুষজন কিছু কিছু আলামত দেখে তাকে চিনতে পারবে।

বর্ণনাসমূহ বিরোধপূর্ণ হওয়ার যে দাবি করা হয়েছে তার উৎপত্তি সহিহ নয় এমন কিছু বর্ণনাকে কেন্দ্র করে। আলহামদুলিল্লাহ, এ বিষয়ে বর্ণিত সহিহ হাদিসগুলোর মাঝে কোনো বিরোধ নেই। আহলে সুন্নাহর সাথে শিয়াদের যে বিরোধ– তা এখানে ধর্তব্য নয়। কুরআন ও সহিহ হাদিসই এক্ষেত্রে সঠিক বিচারক। তাছাড়া শিয়াদের বানোয়াট মিথ্যা ও বাতিল বিষয়গুলো দিয়ে রাসূল সা. থেকে প্রমাণিত হাদিস খণ্ডন করা বৈধ নয়।[১০১]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. ইমাম মাহদি সম্পর্কে এক বক্তব্যে বলেন, ইমামিয়া রাফেযিদের চতুর্থ একটি বক্তব্যও রয়েছে। তা হলো, প্রতীক্ষিত মাহদি হচ্ছেন মুহাম্মদ ইবনে হাসান আসকারী। যিনি হযরত হুসাইন ইবনে আলী রা. এর বংশধর। হযরত হাসান রা. এর বংশধর নন। তিনি শহরসমূহে বিদ্যমান। লোকচক্ষুর অন্তরালে আছেন। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে একটি লাঠি পাবেন। তিনি পাঁচশ বছরেরও অধিক সময় আগে সামিরা সুড়ঙ্গে শিশু অবস্থায় প্রবেশ করেছেন। এরপর কোনো চোখ তাকে দেখেনি। কোনো খবর বা সংবাদ তার সম্পর্কে জানা যায়নি। তারা প্রতিদিন তার জন্য অপেক্ষা করে। ঘোড়া নিয়ে সুড়ঙ্গের পথে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা চিৎকার করে বলেন, হে আমাদের মাওলা! বের হয়ে আসুন। হে আমাদের মাওলা! বের হয়ে আসুন। এরপর তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। এ হলো তাদের অবস্থা! কবি চমৎকার বলেছেন,

ما آن للسرداب أن يلد الذي ✪ كلمتموه بجهلكم ما آنا

فعلى عقولكم العفاء فإنكم ✪ ثلثتم العنقاء والغيلانا.

---

[১০১] দেখুন, আশরাতুস সা-আ : ২৬৭।

গিরি-সুড়ঙ্গের এমন সময় আসেনি যে, সে এমন ব্যক্তিকে এনে দেবে, অজ্ঞতাবশত তোমরা যার ব্যাপারে বলেছ যে, সে এখনো এলো না?

তোমাদের আকল-বুদ্ধির জন্য করুণা হয়, কেননা তোমরা তো আনকা পাখি ও গায়লান গোত্রকে তোমাদের তৃতীয় সঙ্গী বানিয়ে নিয়েছ!

এসব ব্যক্তিবর্গ বনী আদমের জন্য এমন লজ্জাকর ব্যক্তি ও হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছেন যে, প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তিই তাদের কার্যক্রম দেখে হাসতে থাকে।[১০২]

এখানে আমি কেবল সংক্ষিপ্তাকারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের কাছে ইমাম মাহদী সম্পর্কিত আকিদা-বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করলাম। এর দ্বারা নিজেকে ইমাম মাহদি হিসেবে দাবি করা প্রতিটি গণ্ড-মূর্খের অপতৎপরতা যাচাইয়ের সঠিক মাপকাঠি পাঠকবৃন্দের সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠবে।

উত্তর আফ্রিকাঞ্চলে বাতেনীদের বিরাট অপতৎপরতা চালানোর সুযোগ পাওয়ার অন্যতম কারণ, সেখানকার লোকেরা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান এবং তা থেকে উদ্ভূত বিষয়াদির বাস্তবতা যাচাইয়ের মানদণ্ড সম্পর্কে অজ্ঞ-অনবহিত। এ কারণেই আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ীর পক্ষে কাত্তামিয়া গোত্রকে নিজের ভ্রান্ত রাফেযি বাতেনি চিন্তাধারার দিকে পরিচালিত করা সহজতর হয়েছে।

***

[১০২] দেখুন, আল মানারুল মুনীফ : ১৫২-১৫৩।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার গোত্রসমূহের বিরোধ

## প্রথম অনুচ্ছেদ

### তারাবলুসে হাওয়ারা গোত্রের বিদ্রোহ

উবায়দুল্লাহ মাহদি তারাবলুস দখল করার পর মাকনূন বিন দাবারা লাহইয়ানী কাত্তামীকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করে। ব্যাপারটি যথাযথ না হওয়ায় হাওয়ারা গোত্র তারাবলুসের নতুন প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তারা উত্তর আফ্রিকার পরিস্থিতিকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণের চেষ্টা করে।

উক্ত বিদ্রোহে যানাতা, লিমায়া প্রভৃতি বারাবারিয়ান গোত্র হাওয়ারা গোত্রের সঙ্গে যোগ দেয়। তারাবলুসে উবায়দিয়াদের বিরুদ্ধে উক্ত বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয় আবু হারুন হাওয়ারি। তারা সম্মিলিতভাবে তারাবলুস অবরোধ করে। মাকনূন শহরের প্রাচীরের সাহায্যে আত্মরক্ষা করে।

উবায়দুল্লাহ মাহদি তাম্মাম ইবনে মাআরিফ (আবু যাকী-মাকনূনের ভ্রাতুষ্পুত্র) এর নেতৃত্বে একটি সেনাদল পাঠিয়ে মাকনূনকে সাহায্য করে। উবায়দি সেনাদল এবার বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হয়। উবায়দুল্লাহ মাহদি মাকনূনকে ইঙ্গিতে নির্দেশ করে, সে যেন তাম্মাম ইবনে মাআরিককে হত্যা করে। কারণ, তার ধারণা হয় যে, সে মাকনূনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে।

নির্দেশনা মোতাবেক মাকনূন তার ভ্রাতুষ্পুত্র তাম্মামকে ২৯৮ হিজরীর জিলহজ মাসের শুরুর দিকে হত্যা করে এবং শহরের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনে। অতঃপর সে শাসনক্ষমতায় স্থায়ী হয়ে স্বীয় গোত্র কাত্তামার লোকদের জনসাধারণের সম্পদ লুণ্ঠনের, তাদের সম্মানহানি এবং তাদের কাজকর্মে অন্যায় হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দেয়। ফলে ৩০০ হিজরীতে তারাবলুসবাসী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং সেখান থেকে তাদের বের করে দেয়। এখান থেকে বের হয়ে সে রাকাদায় দিয়ে মাহদির সঙ্গে মিলিত হয়। মাকনূনের সহযোগী যে সকল কাত্তামী তারাবলুসে ছিল, তারাবলুসবাসী তাদের সকলকে হত্যা করে এবং শহরে প্রবেশের সকল পথ বন্ধ করে দেয়।

উবায়দুল্লাহ মাহদি তাদের বিরুদ্ধে একটি নৌবহর প্রেরণ করে। তারাবলুসের নৌবাহিনী উক্ত নৌবহরকে সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম হয়। ফলে ভেতরে অবস্থানরত সকল সৈনিক মারা যায়।

ব্যর্থ হয়ে উবায়দুল্লাহ তার পুত্র আবুল কাসিমের নেতৃত্বে আরমৃম বাহিনীকে স্থলপথে প্রেরণ করে। পথিমধ্যে হাওয়ারা গোত্র তাদের প্রতিরোধ করে। তবে আবুল কাসিম হাওয়ারা গোত্রকে পরাজিত করতে সমর্থ হয় এবং শহরের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সে তারাবলুস অবরোধ করে রাখে। এতে শহরে মানুষের খাদ্য ফুরিয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তাদেরকে মৃতপ্রাণী পর্যন্ত খেতে হয়। ইবনে ইসহাকের পক্ষে এই যুদ্ধে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি এতোটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়লে তারাবলুসের নেতৃস্থানীয় লোকজন আবুল কাসিমের সঙ্গে যোগ দেয়। তাদের কাছে নিজেদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। সে একটি শর্তে তাদের নিরাপত্তা দিতে রাজি হয়। তা হলো, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, মুহাম্মদ ইবনে নাসর ও অপর এক ব্যক্তি, যার নাম-হাওহাহ্, এই তিনব্যক্তিকে তার হাতে সমর্পণ করতে হবে। তারা এই শর্ত গ্রহণ করে এবং এই তিনজনকে তার হাতে তুলে দেয়। আবুল কাসিম শহরে প্রবেশ করে এবং জনসাধারণের ওপর তিন লক্ষ দিনার আর্থিক জরিমানা ধার্য করে। শহরে আগলাবি গোত্রের যে সকল লোক ছিল সে তাদের হত্যা করে। হত্যার পক্ষে তার দাবি ছিল, তারাই বিদ্রোহের মূল উস্কানিদাতা।

খলিল ইবনে ইসহাক নাসের একজনকে জরিমানার অর্থ উসূলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সে ছিল তারাবলুস সেনাবাহিনীর সদস্য।

জরিমানার অর্থ যে উসূল হয় তা দিয়ে সে উবায়দি শাসনামলে তারাবলুসের বড় জামে মসজিদ নির্মাণ করে এবং তার মিনারা তৈরি করে। ইবনে কাইদাদ ৩২২ হিজরীতে কায়রাওয়ানের গভর্নর হওয়ার পর ওই ব্যক্তি তার হাতে নিহত হয়।

তারাবলুসের পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার পর আবুল কাসিম রাকাদা ফিরে যায়। তারাবলুসে যে তিন ব্যক্তিকে তার হাতে সমর্পণ করা হয় তাদের উটে বসিয়ে কায়রাওয়ানের মহাসড়কসমূহে ঘোরানো হয়। এরপর তাদের হত্যা করা হয়।[১০৩]

এ অকালপক্ক বিদ্রোহ থেকে স্পষ্ট হয়, তারাবলুসবাসী তাদের শাসনে আগ্রহী

---

[১০৩] দেখুন, তারীখুল ফাতহিল আরাবি ফী লিবিয়া : ২৪৬-২৪৭।

ছিল না। কেবল অস্ত্রের বলেই তারা তাদের পদানত করতে পেরেছে।

শিয়া চিন্তা, রাফেযিদের মতাদর্শ বিস্তার ও বাতেনি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তারাবলুসের উলামায়ে কেরাম ও ফকিহদের অনন্য ভূমিকা ও জিহাদের কথা ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়েছে। উত্তর আফ্রিকার এই বাতেনি মতবাদ প্রসারের দায়িত্ব নিয়েছিল উবায়দিয়া সাম্রাজ্য।

***

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## বারাকা অভিমুখে উবায়দিয়াদের অভিযান

তারাবলুসের পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার পর হাব্বাসা ইবনে ইউসুফ কাত্তামীর নেতৃত্বে উবায়দুল্লাহ বারাকার দিকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। হাব্বাসা ছিল অত্যন্ত নির্দয় ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তার অন্তরে সামান্য পরিমাণও দয়া ছিল না। ৩০১ হিজরীর দিকে সে সুরতের দিকে রওয়ানা হয়। কারণ, তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত আগালিবা গোত্রের শাসনাধীনে ছিল। সে কোনোপ্রকার যুদ্ধ-বাধা ছাড়াই তাতে প্রবেশ করে।

সেখানে আব্বাসী ও আগলাবিদের যে সেনাদল ছিল তারা সবাই শহর ছেড়ে চলে যায়। হাব্বাসা এরপর আজদাবিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। সেখান থেকেও আব্বাসী ও আগলাবি সৈন্যরা সরে যায়। সেখানকার জনগণ তার কাছে নিরাপত্তা কামনা করে। সে তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং কোনো যুদ্ধ ছাড়াই তাতে প্রবেশ করে। এভাবে সে বারাকাও দখল করে নেয়।

হাব্বাসা কোনো অঙ্গীকারই রক্ষা করতো না। যখনই সে কোনো শহরে প্রবেশ করত তখনই সে শহরের লোকজনকে হত্যা করত, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করত এবং নারীদের বন্দী করে রাখত। তার সবচেয়ে বীভৎস যে কাজটি ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে এসেছে তা হলো, জনাকয়েক মানুষ বারাকায় কবুতর নিয়ে খেলছিল। সে তাদের আগুনের পাশে বসানোর নির্দেশ দেয়। তাদের শরীর থেকে গোশত কেটে কেটে ভুনা করতে আদেশ করে। অতঃপর তাদের আগুনে নিক্ষেপ করে।

এই বীভৎস পৈশাচিক কর্মকাণ্ড থেকে বোঝা যায়, আহলে সুন্নাহর সামান্য গন্ধ আছে এমন ব্যক্তিদের প্রতি উবায়দিয়াদের কী পরিমাণ বিদ্বেষ ছিল? তাদের ভ্রান্ত ও বিকৃত বিশ্বাস থেকে তারা এটাকে সাওয়াবের কাজ মনে করত।

তার জঘন্যতম কাজগুলোর একটি হলো, সে বারাকায় ঘোষণা করে, যে ব্যক্তি উপঢৌকন নিতে চায়, সে যেন আমাদের কাছে আসে। পরদিন এক হাজার মানুষ তার কাছে উপস্থিত হয়। সে তাদের হত্যার নির্দেশ দেয়। তাদের সকলকে হত্যা করা হয়। হত্যার পর লাশ স্তূপ করে রাখা হয়। তার সিংহাসন এনে লাশগুলোর ওপর রাখা হয় এবং সে তাতে উপবেশন করে। সে নগরীর সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে আসতে আদেশ দেয়। তাদেরকে বন্দী করে এবং লাঞ্ছিত করে। এ ভীতিকর অবস্থা দেখে তাদের মধ্যে কতিপয় মৃত্যুবরণ করে।

সে তাদের বলে, যদি আগামীকাল এক লক্ষ মিসকাল স্বর্ণ না এনে দাও, তবে তোমাদের সকলকে হত্যা করা হবে। ফলে তারা উক্ত পরিমাণ স্বর্ণ তার সামনে উপস্থিত করে।

বারাকা শহরে জামাল মাযযাতির দুই পুত্র হারেস ও নাযযার থেকে তাদের চাচাদের সন্তানদের একদলের সামনে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তাদের নারীদের বিক্রি করে দেয়। তাদের সম্পদ ও উৎকৃষ্ট সব সামগ্রী লুণ্ঠন করে। বারাকার জনসাধারণ এ সব ঘৃণ্য ও ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডে চিন্তিত হয়ে উবায়দুল্লাহ মাহদীর কাছে পত্র প্রেরণ করে। ওই অভিশপ্ত তাদের কাছে মিথ্যা শপথ করে বলে, সে এমন কিছু করার নির্দেশ দেয়নি। সে হাব্বাসার কাছে পত্র লিখে পাঠায়। তাকে বারাকা ছেড়ে চলে যেতে বলে। সেখান থেকে সে মিসর গমন করে এবং সেখানে বারাকার চেয়েও জঘন্য কর্মকাণ্ড করে।

৩০২ হিজরীতে আবুল কাসেম রাফেযির সেনাদল আলেকজান্দ্রিয়া আগমন করে। তবে সে ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ হয় এবং পরাজিত হয়ে ফিরে যায়।

আবুল কাসেম নিজ পরিবার ও তাদের পাওয়া রাজত্ব নিয়ে গৌরব করে একটি কবিতা লিখে বাগদাদে পাঠায়। কবি সূলি তার পাঠানো কবিতা অনুসরণ করে আরেকটি কবিতা তাদের কাছে লিখে পাঠান। সুলির পাঠানো কবিতার একটি চরণ নিম্নরূপ :

فلو كانت الدنيا مثالا لطائر ✪ لكان لكم منها بما حزتم الذنب.

পৃথিবী যদি একটি পাখির মতো হয়, তবে তোমরা যা পেয়েছ তা ওই পাখির লেজ।

এই কবিতা পড়ে সে খুবই ক্ষুব্ধ হয়। বলে, আল্লাহর কসম! এই পাখির বক্ষ ও মাথা না পাওয়া পর্যন্ত আমি লড়াই চালিয়ে যাব অথবা মৃত্যুবরণ করব।

## উবায়দিয়াদের বিরুদ্ধে বারাকাবাসীর বিদ্রোহ

এই বছর (৩০২ হিজরী) বারাকাবাসী উবায়দিদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। উবায়দিদের গভর্নর ও কাত্তামা গোত্রের অনেক পুরুষকে হত্যা করে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ৩০৩ হিজরীতে মাহদী তার সৈন্যদল পাঠায়। আবু মাদিনী ইবনে ফররুখ লাহিফি এ বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়। ১৮ মাস বারাকা শহর অবরোধ করে রাখার পর ৩০৪

হিজরীতে শক্তি প্রয়োগ করে সে তাতে প্রবেশ করে। অতঃপর সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীকে হত্যা করে। তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। তাদের নারীদের সম্মানহানি করে। বন্দীদের উবায়দুল্লাহর কাছে পাঠায়। সে তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেয়। আবু মাদিনী আমৃত্যু (৩০৬ হিজরী) বারাকা শহরে অবস্থান করে।

৩০৪ হিজরীতে উবায়দিয়ারা সিসিল উপদ্বীপের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৩০৬ হিজরীর জিলকদ মাসে মিসরে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করে এবং আলেকজান্দ্রিয়া ও অধিকাংশ মালভূমি দখল করে নেয়। তবে সেখানে তারা স্থিতিশীল থাকেনি; বরং প্রত্যাবর্তন করে।

৩০৮ হিজরীতে মাহদিয়া কেল্লার নির্মাণ শেষ হলে মাহদী সেখানে চলে যায়। ৩১০ হিজরীতে নুফুসা গোত্র উবায়দুল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে আবাবিতা গোত্র তাদের দমনে এগিয়ে আসে। এতে তাদের ক্ষমতা ও শান-শওকত আরও বৃদ্ধি পায়। আবাবিতাদের ধর্মমত ছিল ইবাযি। সে নুফুসার বিরুদ্ধে আলী ইবনে সুলায়মানের নেতৃত্বে একটি সেনাদল পাঠায়। এ যুদ্ধে উবায়দিয়ারা পরাজিত হয়। সেনাপ্রধান আলী তারাবলুসে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে সে পুনরায় নুফুসার ওপর আক্রমণ করে এবং তা দখল করে।

সে মুহাম্মদ ইবনে ওমর নাফতীকে তারাবলুসে বিচারপতি নিযুক্ত করে। উবায়দিয়ারা অস্ত্রবলে উবায়দুল্লাহর অধীনে এককভাবে আফ্রিকার তারাবলুস, বারাকা ও সিসিলি দ্বীপে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

***

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## উবায়দিয়াদের বিরুদ্ধে আবু ইয়াযীদ খারেযির বিদ্রোহ-অভিযান

তার নাম মাখলাদ বিন কাইদাদ আল ইয়াফরানী বিন সাদুল্লাহ বিন মুগীস বিন কিরমান বিন মাখলাদ বিন উসমান বিন ইয়াফরান। ইয়াফরান ছিল মিগরাও এর ভাই। মিগরাভা গোত্র তার দিকেই সম্পৃক্ত করা হয়। তার মা ছিল উম্মু ওয়ালাদ বা দাসী। নাম ছিল সায়্যিকা। সে সুদানের অধিবাসী ছিল। মাখলাদের পিতা সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসা-যাওয়া করত। এক সফরে তাকে দাসী হিসেবে ক্রয় করে আনে।[১০৪]

আবু ইয়াযীদ প্রথম দিকে দরিদ্র ছিল। পরে সে খারেযি মতাদর্শ গ্রহণ করে এবং নাক্কারিয়াদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।[১০৫]

কর্মজীবনের সূচনাভাগে সে ছিল কুরআনুল কারিমের হিফয শিক্ষক। জীবনের বেশিরভাগ সময়ই সে শিক্ষকতায় কাটিয়েছে। প্রাথমিক সময়ে বেশ-ভূষা ও আচার-ব্যবহারে তাকে দুনিয়াবিমুখ যাহেদ বলে মনে হত। সে গাধার পিঠে চড়ে লোকালয়, পাহাড়ে ও বন-বাদাড়ে ঘুরত। এ কারণে তাকে 'গাধাওয়ালা' নামে ডাকা হত।

কোনো কোনো ইতিহাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়, সে যখন উবায়দিয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তখন তার বয়স ছিল ৯০ বছর। যানাতা ও উবায়দিয়াদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ ছিল, রাফেযি সাম্রাজ্যে কর ও খাজনা আদায়ে বাড়াবাড়ি করা হত। জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তারা আগালিবাদেরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রাফেযিরা যখন মিম্বারে মিম্বারে, সভা-সমাবেশে এবং জুমার খুতবায় দুই মহান সাহাবী হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রা. কে প্রকাশ্যে গালিগালাজ করতে শুরু করল, তখন বারবারিয়ানরা প্রবলভাবে তাদের প্রতিরোধ করে এবং তাদের বিরোধিতা করতে শুরু করে। তখন আবু ইয়াযীদ জারিদ অঞ্চলে নিজ বাহিনী তৈরি করে। পরিণতিতে উত্তর আফ্রিকা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

সে উবায়দুল্লাহর শাসনামলে তারাবলুসের দিকে বিদ্রোহ শুরু করে। আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শী লোকদের উপর মুহাম্মদ বিন উবায়দুল্লাহ মাহদী অবর্ণনীয়

---

[১০৪] প্রাগুক্ত : ২৪৮।
[১০৫] প্রাগুক্ত : ২৪৯।

জুলুম নির্যাতন করার কারণে অসংখ্য বারবারিয়ান লোক তার সঙ্গে বিদ্রোহে সম্পৃক্ত হয়।

আহলুস সুন্নাহর আলেম ও ফকীহগণ বনী উবায়দের পরিবর্তে আবু ইয়াযীদের পক্ষে লড়াই করা সঙ্গত মনে করেন। তারা বলেন, এরা (অর্থাৎ আবু ইয়াযীদের লোকজন) কিবলার অনুসারী। আর তারা (বনু আদুবিল্লাহ) কিবলার অনুসারী নয়।[১০৬]

আবু ইয়াযীদ নিজের নাম দিয়েছিল শাইখুল মুমিনীন বা মুমিনদের নেতা। কিন্তু সে আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শীদের ব্যাপারে মনে মনে চরম বিদ্বেষ লালন করত। কেননা, সে ছিল নাক্কারী মতাদর্শের অনুসারী। আর নাক্কারিয়া হচ্ছে খারেযিদের একটি শাখা দল।

সে আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শীদের ধন-সম্পদ ও স্ত্রীদেরকে নিজের জন্য বৈধ মনে করত। সে মুহাম্মদ বিন উবায়দুল্লাহর কারণে আহলুস সুন্নাহর ওপর নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করত না। সে মানুষের কাছে তার আকিদা-মতাদর্শ গোপন রাখত। উপরে উপরে তাদের সাথে বন্ধুত্ব ভাব দেখাত। যখনই সে শক্তি-ক্ষমতায় একটু বলীয়ান হয়ে উঠল, তখনই সে আহলুস সুন্নাহর সাথে প্রতারণা করতে শুরু করল। সে মুহাম্মদ বিন উবায়দুল্লাহকে সুযোগ করে দিল, যাতে সে তাদেরকে হত্যা করে, তাদের নারীদের ধরে নিয়ে সম্ভোগ করে এবং তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে নেয়। যদি সে এই আশংকা না করত যে, সে নিজ সহযোগী লোকদেরকে হত্যা করছে বলে অপরাপর লোকেরা তাকে ছেড়ে চলে যাবে– তবে সে আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শীদের সঙ্গে এমন নির্মম আচরণ করত– যা ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়ে পরিণত হত।

কিন্তু এক সময় তার ব্যাপারটি জনসাধারণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মানুষজনও তার পাশ থেকে সরে গেল। আবু ইয়াযীদ খারেযি ছিল নির্দয় পাষাণ ও মারাত্মক প্রভাবশালী লোক। শায়খ আবু তাহের যাভি রহ. বলেন, তার কর্মতৎপরতা থেকে বুঝে আসে, সে দীন-ধর্মের কোনো তোয়াক্কা করত না। মানবাধিকারের কোনো পরোয়া করত না। সে যখন কায়রাওয়ানে প্রবেশ করেছে, তখন পুরো শহর তছনছ করেছে। পুরুষদেরকে হত্যা করেছে। নারীদেরকে বন্দী করেছে, তাদের যৌনাঙ্গ কেটে ফালা ফালা করেছে। গর্ভবতীদের পেট কেটে ফেলেছে। মানুষ উলঙ্গ-অনাবৃত ও খালি পায়ে

---

[১০৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৫ : ১৫৫।

কায়রাওয়ানের গলি-ঘুপচিতে আশ্রয় নিয়েছে। অধিকাংশই ক্ষুধা-পিপাসা ও অনাহারে মৃত্যু বরণ করেছে। কেউ কেউ তার কাছে শহরের ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে অভিযোগ করলে সে তাদেরকে উপহাস ভরে জবাব দিয়েছে, যদি মক্কা ও বায়তুল মুকাদ্দাস শহর বিপর্যস্থ হত তখন কী করতে?![১০৭]

মানুষের ভেতর থেকে সুষ্ঠ চিন্তা-চেতনা ও ঐশী জ্ঞান-গরীমা বিলুপ্ত হয়ে গেলে সে এমনই বন্য ও বর্বর প্রকৃতির হয়ে ওঠে। সে তখন কোনো নীতি-আদর্শ মেনে চলে না। বিবেক তাকে সুপথে পরিচালিত করে না। শরীয়তের বিধি-নিষেধেও সে কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না।

আবু ইয়াযীদ খারেযির ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসও তাকে প্রতারক, প্রবঞ্চক ও স্বৈরশাসকে পরিণত করেছে। কারো প্রতি তার কোনো দায়বোধ ছিল না। কোনো অঙ্গীকার রক্ষায়ও তার কোনো মনোযোগ ছিল না। এর দ্বারাই বুঝে আসে যে, তার সুষ্ঠ বোধ-বিবেক লুপ্ত হয়ে গেছে। তার মন-মস্তিষ্ক এমন পূতিঃগন্ধময় বাতিল মতাদর্শে আচ্ছাদিত হয়ে গেছে- যা দুই ঐশী নূর তথা কুরআন-সুন্নাহর আলোকবিভা থেকে অনেক দূরে।

রাফেযি উবায়দিয়াগণ ইসমাঈল মুহাম্মদ মাহদীর শাসনামলে আবু ইয়াযীদের বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়। ইসমাঈলের উপাধি ছিল মানসূর। মানসূর আবু ইয়াযীদের সৈন্যসামন্ত ও অর্থসম্পদের বিপুল ক্ষতি করে। একের পর এক আক্রমণে সে তাদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। আবু ইয়াযীদ এই শোকে মৃত্যুবরণ করে। মানসূর তার শরীরের চামড়া খুলে নেয়। তাতে তৃণ ঘাসপাতা ভরে রাখে। আর তাকে শূলিতে চড়িয়ে দেয়।[১০৮]

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে উবায়দিয়ারা একটি কবিতা রচনা করেছিল। এর লেখক ছিল আলী বিন মুহাম্মদ আল-আয়াদি। কবিতাটি নিম্নরূপ :

فارتقى الملعون من خيفته ✪ في ذرى اعيط عال مصعد.

*মানসূরের ভয়ের দরুণ অভিশপ্ত (আবু ইয়াযীদ) নিজেকে ছুরির এমন অগ্রভাগে স্থাপন করেছে- যা সূক্ষ্মভাবে ধার করা হয়েছে।*

في ذري حلقاء ملساء على ✪ ذلك المعقل ليست بصد.

---

১০৭ দেখুন! তারীখুল ফাতহিল আরাবি ফী লিবিয়া : ২৫১।
১০৮ সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৫ : ১৫৭।

ছুরির অগ্রভাগ তার গলার খাদ্যনালির উপরিভাগে রাখা হয়েছিল– যেখানে অন্য কিছু প্রতিবন্ধক ছিলো না।

معقل من فوقه الله ومن ✪ تحته المنصور في جيش معد.

কণ্ঠনালির উপরিভাগে ছুরি রাখা অবস্থায় তার উপরে ছিলেন কেবল আল্লাহ তাআলা। আর তার নিচে ছিল মানসূরের প্রস্তুত বাহিনী।

فارتقى المنصور بالسيف له ✪ يوم طعن كشآبيب البرد.

মানসূর ছুরি নিয়ে এত সহজেই ছুরি চালালো যে, তার মনে হলো, যেন তার শরীর দিয়ে বরফকণা ছুঁয়ে আসা হিমশীতল হাওয়া বয়ে গেল।

فإذا مخلد في كف الردى ✪ موثق الجيد بحبل من مسد.

তার হাত ছিল কড়াবদ্ধ আর শরীর ছিল মোটা রশি দিয়ে বাঁধা।

فأبى الله سوى إعجاله ✪ وعذاب الله للجسم أهد.

আল্লাহ তার প্রাণবায়ু বের করে নিতে বিলম্ব করলেন না। আর শরীরের জন্য আল্লাহর দেওয়া শাস্তি তো খুবই ভয়াবহ।

فيفى عنه أبد ما دنسا ✪ كان قد أسرف فيه ومرد.

মানসূর তার থেকে নিজের ময়লা হাত গুটিয়ে নিলো এবং তাকে মারাত্মকভাবে জখম করলো।

كأديم التيس لما لم يطب ✪ ريحه جرد منه فانجرد.

যেন তা এমন পুরোনো পাঠা– যার শরীরে খুবই নিকৃষ্ট গন্ধ থাকে। মানসূর তার গায়ের চামড়া খুলে আলগা করে নিলো।

وحشاه سالخوه سعفا ✪ ماليا ما بين كعب وكند.

কাব ও কিন্দের ঘটনা স্মরণ করে সে তার চামড়ার ভেতরে তৃণ ঘাস ও লতাপাতা দিয়ে ভরে রাখলো।

ثم رقاه على مستحضد ✪ باسق أجرد ما فيه أود.

এরপর সেটাকে ফসল কাটার স্থানে নিক্ষেপ করলো। ফলে তা ফেটে গিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেলো।

তাকে শূলিতে চড়িয়ে রাখা হয়। শেষে তার গোশত গলে পঁচে যায়। বাতাসে সেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। এই ঘটনা ঘটেছিল ৩৩৬ হিজরীর মহররম মাসে। তার পুত্র পিতার এই নির্মম হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ বিদ্রোহের ডাক দেয়। মানসূর তাকে দমানোর জন্য সেনাপতি জিরি বিন মুনাদকে প্রেরণ করে। সে গিয়ে তাকে হত্যা করে। এর মাধ্যমে আবু ইয়াযীদ খারেযি ও তার পুত্রের জীবনাবসান ঘটে।[১০৯]

আবু ইয়াযীদের বিদ্রোহের সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য ও পট-পরিকল্পনা ছিল না। তার রাষ্ট্র গঠনেরও সুনির্ধারিত কোনো ইচ্ছা-অভিপ্রায় ছিল না। এতদসত্ত্বেও সে তার বাহিনী দিয়ে উবায়দিয়াদের বিরাট ক্ষতি করতে পেরেছিল। তাদের শহর-নগর ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে মাহদিয়্যায় অবরুদ্ধ করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়াও সে অপরাপর গোত্রের লোকদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেছিল। যদ্দরুন তারা তার ব্যাপারে আস্থা হারিয়ে ফেলে। তার পাশ থেকে সরে যায়। তার বিদ্রোহের ধরন থেকে বুঝা যায় যে, বিরোধীপক্ষ থেকে ঘৃণ্য প্রতিশোধ গ্রহণ এবং তাদের রক্তবন্যা বইয়ে দেওয়া ছিল তার অন্যতম উদ্দেশ্য। যারাই তার বিরোধিতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে সে জিঘাংসামূলক প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। তার এই কালো বিদ্রোহের স্থায়িত্বকাল ছিল প্রায় চৌদ্দ বছর। উবায়দিয়া রাফেযিদের সাম্রাজ্য তার বিদ্রোহ-অভিযানে বারবার পর্যুদস্ত হয়েছে।

সম্ভবত এটাই মহান আল্লাহ তাআলার অমোঘ নীতি যে, তিনি এক জালেমকে পরাস্ত করার জন্য আরেক জালেমকে তার ওপর চাপিয়ে দেন। এই উভয় পক্ষের দ্বন্দ্ব-বিবাদ, বিদ্রোহ ও লড়াইয়ে প্রায় হাজার খানেক লোক নিহত হয়েছে। একইসঙ্গে উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে মারাত্মকভাবে।

***

[১০৯] দেখুন! তারীখুল ফাতহিল আরাবি ফী লিবিয়া : ২৫১।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## রাফেযীদের দ্বিতীয় খলিফা আল কায়িম বি আমরিল্লাহ আবুল কাসেম নাযযার ইবনে উবায়দুল্লাহ (৩২২-৩৩৪ হিজরী মোতাবিক ৯৩৪-৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ)

তার নাম আবুল কাসেম মুহাম্মদ বিন মাহদী ইবনে উবায়দুল্লাহ। তিনি ২৭৮ হিজরী সনে সালিমা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ৩২২ হিজরী সনে রাফেযীরা তার হাতে খেলাফতের বায়আত গ্রহণ করে।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন খুবই প্রভাবশালী ও সাহসী। তবে তার চিন্তা-চেতনা ও মনমানসিকতা ছিল খুবই নিকৃষ্ট। কল্যাণকর কাজেও ততটা অগ্রসর ছিলো না। ৩০২ হিজরী সনে আবু ইয়াযীদ মাখলাদ ইবনে কাইদাদ আল-বারবারী আল-খারেযি তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তাদের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়। মাখলাদ তাকে মাহদিয়া নামক স্থানে অবরুদ্ধ করেন। তাকে পর্যুদস্ত করেন। তার দেশ দখল করেন। এরপর কায়েম বিল্লাহ ওয়াসওয়াসায় পড়ে যান। তিনি কাজেকর্মে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। তার মেধা ও বুঝ-বুদ্ধি লোপ পায়। তিনি ছিলেন সাক্ষাত শয়তানরূপী। মুরতাদ হওয়ার কথা বলতেন। প্রকাশ্যে নবীদেরকে গালিগালাজ করতেন। তার অনুসারীরা চিৎকার করে বলতো,

العنوا الغار وما حوى.

গুহা ও তার চারপাশে যা আছে তার ওপর অভিশাপ দাও।

তিনি অনেক উলামায়ে কেরামকে পথভ্রষ্ট করেছেন। তিনি বাইরাইনের কারামেতাদের কাছে চিঠিপত্র পাঠাতেন। তিনি মসজিদ ও কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন।

আবু ইয়াযীদ আল খারেযি আবুল কাসিমের কুফুরীর ব্যাপারটি বাড়াবাড়ি গণ্য করেন। তিনি মরক্কোর ডানপন্থী দল, তথাকার সকল বংশের লোক এবং কায়রাওয়ানের ফকিহ ও দরবেশ প্রকৃতির লোকদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলেন। পরে আবু ইয়াযীদ সমগ্র মরক্কোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে সক্ষম হন। কায়রাওয়ান ইউনিভার্সিটির সম্মুখে তার নামে একটি তোরণ নির্মিত রয়েছে। তাতে লেখা আছে,

لا إله إلا الله لا حكم إلا لله আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই। আল্লাহর বিধান ব্যতীত কোনো শাসন নেই। এর উপর দুটি হলুদ পতাকা লাগানো ছিল। তাতে লেখা ছিল, نصر من الله و فتح قريب সাহায্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে। আর দীনের বিজয় অতি সন্নিকটে।

আবু ইয়াযীদের নামে একটি পতাকা ছিল। তাতে লেখা ছিল, اللَّهُمَّ انصر وليك على من سب نبيك হে আল্লাহ! আপনার নবীকে যে গালিগালাজ করে তার বিরুদ্ধে আপনি আপনার প্রতিনিধিকে সহায়তা করুন।[১১০]

উবায়দি খলিফা আল-কায়িম সাহাবায়ে কেরামকে প্রকাশ্যে গালমন্দ করত। নবী কারীম সা.-কে ভর্ৎসনা করত। এমনকি সে হোটেল-মোটেলে গণ্ডারের মাথা ঝুলিয়ে তাতে একথা লেখার নির্দেশ দিত যে, এটা অমুক সাহাবীর মাথা। উবায়দিদের এসব কুফরী অপকর্মের দরুণ জনৈক কবি বনী উবায়দের নিন্দা করে লিখেছেন,

الماكر الغادر الغاوي لشيعته ✪ شر الزنادقة من صحب و تباع

العابدين إذا عجلا يخاطبهم ✪ بسحر هاروت من كفر وإبداع

لو قيل للروم أنتم مثلهم لبكوا ✪ أو لليهود لسدوا صمخ أسماع.

ধূর্ত, প্রতারক ও নিজ দলের লোকদের জন্য প্রবঞ্চক, যারাই তার সঙ্গ দিয়েছে এবং তার অনুসরণ করেছে তারাই নিকৃষ্ট যিন্দীকে পরিণত হয়েছে। আবেদদেরকে যখন তারা সম্বোধন করত তখন তাদেরকে হারুতের কুফরী ও বিদআতী কর্মকাণ্ডসম্পন্ন যাদু দিয়ে সম্বোধন করত। যদি রোমবাসীকে বলা হতো, তোমরা তাদের অনুরূপ, তবে এ কথা শুনে তারা কান্না করত। কিংবা ইহুদিদেরকে বলা হলে তারা আঙুল দিয়ে নিজেদের কানের ছিদ্র বন্ধ করে দিত।[১১১]

***

[১১০] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৫ : ১৫২-১৫৬।
[১১১] প্রাগুক্ত : ১৫ : ১৫৬।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## উত্তর আফ্রিকায় শিয়া রাফেযিদের তৃতীয় খলিফা আল মানসূর বি নাসরুল্লাহ আবু তাহের ইসমাঈল (৩৩৪-৩৪১ হিজরী মোতাবিক ৯৪৫-৯৫২ হিজরী)

বাতেনি উবায়দি মতাদর্শী আবু তাহের ইসমাঈল ইবনুল কায়িম আল মাহদি ছিলেন মরক্কোর অধিপতি।

তিনি তার পিতার তিরোধানের পর রাফেযিদের খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় পিতা আবু ইয়াযীদ আল খারেযির ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটান।

ইমাম যাহাবি রহ. তার ব্যাপারে বলেন, তিনি ছিলেন দুরন্ত সাহসী, আগ্রহ-উদ্দীপনায় টইটম্বুর, স্পষ্টভাষী, দ্রুত বক্তৃতায় পারদর্শী। সার্বিকভাবে তার ভেতরে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ বিরাজিত ছিল। যা মূলত তার নাস্তিক পিতার কর্মতৎপরতার বিপরীত ছিল।[১১২]

আমি বলি, ইমাম যাহাবির উক্তি 'তার ভেতরে সামগ্রিক ইসলামি মূল্যবোধ বিরাজিত ছিল'- এ কথায় আপত্তি রয়েছে।

ইমাম যাহাবি রহ. তার গুণকীর্তণ করে বলেন, একবার তিনি তার সৈনিকদের ও প্রজাবৃন্দের প্রায় দশ হাজার পুত্র সন্তানকে একত্র করেন। তাদেরকে উন্নতমানের পোশাক পরিধান করান। তাদের জন্য এমন বিরাট ভোজের আয়োজন করেন, যা ইতোপূর্বে কেউ কখনো করেছে বলে শোনা যায়নি। এরপর তিনি সকলকে মুসলমানি করিয়ে দেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের বয়স বিবেচনা করে কাউকে একশ দিনার কাউকে পঞ্চাশ দিনার উপহার দেন।

তার আরেকটি গুণ হলো, তিনি মুহাম্মদ বিন আবুল মানযূর আনসারীকে কায়রাওয়ানের বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের মুহাদ্দিস। তিনি কাযি ইসমাঈল ও হারিস বিন আবি উসামার সাথে সাক্ষাত করেছেন। তিনি বলেন, আমি এই শর্তে বিচারকের পদ গ্রহণ করবো যে, আমি এর জন্য কোনো বেতন-ভাতা নেবো না। কোনো বাহনও গ্রহণ

---

[১১২] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৫ : ১৫৭।

করবো না। তখন তিনি এসব শর্ত মেনেই তাকে বিচারক পদে নিযুক্ত করেন। এর ফলে তিনি জনগণের দেখভাল করতেন। একবার এক ইহুদি (নবী সা.-কে) গালিগালাজ করায় তাকে তার সামনে উপস্থিত করা হলো। তিনি তাকে আটক করলেন। পরে তিনি তাকে এতই প্রহার করলেন যে, সে মারা গেল। তিনি এমনটি করেছেন। কারণ, তিনি জানতেন, যদি বিচারটি খলিফা মানসূর পর্যন্ত গড়ায় তবে তিনি তাকে হত্যা করবেন না। ফলত বিচারক তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে গিয়ে এমনভাবেই প্রহার করলেন যে, সে ঘটনাস্থলেই মারা গেল।

তিনি (মানসূর বি নাসরিল্লাহ) ৩৪১ হিজরী সনে বিরাট শীত ও প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুতে ইন্তিকাল করেন। তখন তিনি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে অবকাশ যাপন করছিলেন।

তিনি তার প্রজাসাধারণের প্রতি বিপুল অনুরাগী ছিলেন। তিনি শিয়া মতাদর্শ প্রচার প্রসার করা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন। তার মৃত্যুর পর তারই পুত্র মুঈয খেলাফতের মসনদে সমাসীন হয়।[১১৩]

***

[১১৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৫ : ১৫৮।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## আল মুঈয লি দীনিল্লাহ আবু তামীম সাদ (যিলহজ্জ ৩৪১ হিজরী থেকে রবিউল আউয়াল ৩৬২ হিজরী)

তার নাম মাআদ বিন ইসমাঈল আল মানসূর। উপনাম আবু তামীম। তিনি ৩১৯ হিজরী সনে রমযানের ১১ তারিখে মাহদিয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা তাকে তার পরবর্তী শাসক হিসেবে মনোনীত করেন। তিনি ৩৪১ হিজরী সনের জিলহজ্জ মাসে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। উত্তর আফ্রিকায় শাসন করা উবায়দিয়া মতাদর্শী খলিফাদের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থতম খলিফা।

তিনি উত্তরাঞ্চলের সর্বত্র নিজের ইচ্ছা-অভিপ্রায় ও মিশন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হন। ৩৪২ হিজরী সনে তিনি বাসিল সকলিকে সূরত অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। আর ইজদাবিয়্যায় ইবনে কাফি আল কাত্তানিকে দায়িত্ব প্রদান করেন। আফ্লাহ নাসিবকে বারাকা ও তার আশেপাশের অঞ্চলের দায়িত্ব দেন। ৩৫৪ হিজরী সনে ইহুদিরা আফ্রিকাঞ্চলে প্রবেশ করে। তার রাজত্বের সীমানা মিসরের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর ফলে তিনি ব্যাপকভাবে মিসরের শাসকবর্গ ও আমীর-উজিরদের খবরাখবর জানতে সক্ষম হন। কার্যত এটাই তাকে মিসরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ করে।

৩৫৫ হিজরী সনে কাফূর ইখশীদির মৃত্যুতে মিসরের অভ্যন্তরে ব্যাপক গোলযোগ সৃষ্টি হয়। মুঈয এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করেন। তিনি কালবিলম্ব না করে দ্রুত পরিকল্পনা করেন। তিনি কায়রাওয়ান থেকে মিসরের সীমানা পর্যন্ত অসংখ্য বাঙ্কার ও সেনাছাউনি তৈরি করেন। তিনি এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন। বিপুল অর্থসামগ্রী মওজুদ করেন।

তিনি প্রায় এক লক্ষ সৈনিকের ওই বাহিনীর প্রধান হিসেবে জাওহার সকলিকে মনোনয়ন দান করেন। তিনি সকলির বাহিনীতে সম্পৃক্ত তার সকল আমীর উমারাদেরকে নির্দেশ দেন, তারা যেন সকলির নির্দেশনা অনুগতচিত্তে মেনে নেয়। এরপর উবায়দিয়া বাহিনী বাতেনি মতাদর্শ মিসর ভূমিতে ছড়িয়ে দেওয়ার মিশন নিয়ে যাত্রা করে। যাতে তারা মিসরভূমিকে আলেম উলামাদের সাথে দীর্ঘসময় ধরে চলমান সমস্যা-সংকট, দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধের অবসান ঘটাতে পারে। তারা মিসরে আব্বাসিয়া খেলাফতের অনুসারী ইখশীদির মতাদর্শ পরিহার করেন। তখন মুঈয তার দিকে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ

করেছেন। মিসরের দিকে নিজ বাহিনী প্রেরণ করেছেন। যাতে তার সহায়তাকারী বাহিনী ও অনুচররা বিপুল মহিমায় বিভূষিত আব্বাসিয়া খেলাফতের পতন ঘটাতে পারে।

মুঈয সুন্নী মতাদর্শী আন্দালুসকে নিজ শাসনাধীন করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার বিশেষ উপদেষ্টাগণ তাকে এই ইচ্ছা পরিহার করতে বলেন।

৩৫৮ হিজরী সনে মুঈয এর সৈন্যবাহিনী বিশিষ্ট সেনাপতি মুঈয এর একান্ত অনুগত জাওহার সকলির নেতৃত্বে মিসরে প্রবেশ করে। সে মিসরকে উবায়দিয়াদের সাম্রাজ্যভুক্ত করতে কোনো চেষ্টাই বাদ রাখেনি।

এই জাওহার সকলিই ৩৬১ হিজরী সনে জামে আযহার নির্মাণ করেন। যাতে তা বাতেনিদের ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা চর্চার এবং বাতেনি মতাদর্শ প্রচার-প্রসারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হতে পারে। পরবর্তীতে মিসরের উবায়দিয়া সাম্রাজ্য উৎখাতকারী সুলতান সালাহউদ্দীন এর প্রচেষ্টায় এটি আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শী আলেম-উলামা ও জনসাধারণের একটি বিরাট দূর্গে পরিণত হয়।

উবায়দিয়া বাহিনী উবায়দিয়াদের অন্যতম নেতা জাফর বিন খাল্লাফের নেতৃত্বে ৩৫৮ হিজরী সনে দামেশকে প্রবেশ করে।[১১৪]

## মিসর অভিমুখে মুঈয এর সফর

মিসরভূমি যখন মুঈয উবায়দির জন্য অনুকূল হলো তখন তিনি তার বাহিনী, অনুচর, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ নিয়ে উত্তর আফ্রিকা ছেড়ে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হন। যাতে তিনি সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করতে পারে। এ পর্যায়ে তিনি জায়নবাদী শাসক বলকীন বিন জিরির হাতে উত্তর আফ্রিকা তুলে দেন।

মুঈয মিসরভূমির সঙ্গে পুরো তারাবলুস, সুরত ও বারাকা অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তার সঙ্গে ছিল নাস্তিক কবি মুঈয বিন হানী আন্দালুসি। সে মুঈযের ব্যাপারে বাড়াবাড়িমূলক গুণকীর্তণ করে যে কাব্য রচনা করেছিল- তার কিয়দাংশ নিম্নরূপ-

فكأنما أنت النبي محمد ✪ و كأنما أنصارك الأنصار

[১১৪] আল ফাতহুল আরাবী ফী লিবিয়া : ৩৬২।

ما شئت أنت لا ما شاءت الأقدار ✪ فاحكم فأنت الواحد القهار
هذا الذي تجدي شفاعته غدا ✪ حقا وتخمد أن تراه النار.

যেন আপনিই নবী মুহাম্মদ। আর আপনার সহযোগীরা যেন আনসারবাহিনী।

আপনি যা চান তা তাকদীরের চাওয়া নয়। সুতরাং আপনি হুকুম করুন। কেননা, আপনি তো একক ক্ষমতাধর।

যে ব্যক্তির জন্য আগামীকাল সত্য সত্যই শাফাআত প্রয়োজন, আপনি তাকে জাহান্নামে দেখা বাঞ্ছিত নয়।

মুঈয এর প্রশংসা করে আরেক কবিতায় বলেন,

النور أنت وكل نور ظلمة ✪ والفوق أنت وكل فوق دون
فارزق عبادك فضل شفاعة ✪ و أقرب بهم زلفى فأنت مكين

আপনি তো নূর। আপনি ছাড়া অন্য সকল আলোই অন্ধকার। সবার উর্ধ্বে আপনি। আপনি ছাড়া সকল কিছুই আপনার নিম্নে অবস্থিত।

আপনি আপনার বান্দাদেরকে উত্তম শাফায়াত দান করুন। আপনি তাদের নিকটে থাকুন। কেননা আপনি তো স্বস্থানে সমাসীন।

আরেকটি কবিতা হলো,

تدعوه منتقما عزيزا قادرا ✪ غفارا موبقة الذنوب صفوحا
أقسمت لولا أن دعيت خليفة ✪ لدعيت من بعد المسيح مسيحا
شهدت بمفخرك السموات العلا ✪ و تنزل القرآن فيك مديحا

তাকে আপনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী, সম্মানিত, ক্ষমতাবান ও ক্ষমাশীল ব্যক্তি রূপে ডাকুন। তিনি বিরাট বিরাট পাপও ক্ষমা করে দেন।

আমি কসম করছি, যদি আপনাকে খলিফা নামে ডাকা না হত, তবে হযরত মাসীহের পর আপনাকেই মাসীহ বলে ডাকা হত। আমি আপনার আকাশসম উচ্চ গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছি। আর কুরআন আপনার প্রশংসায় বাণী অবতীর্ণ করছে।

আরেকটি কবিতা হলো,

وعلمت من مكنون سر الله ما ✪ لم يؤت في الملكوت ميكائيلا

لو كان آتي الخلق ما أوتيته ✪ لم يخلق التشبيه والتأويلا

আপনি আল্লাহর রহস্যজ্ঞানের এমন কিছু জানেন, যা কোনো ফেরেশতাকে জানানো হয়নি। যদি সৃষ্টিজীবকে সে জ্ঞানের কথা জানানো হত তবে এতটুকু পরিমাণ জানানো হত না। আর কোনো তাশবীহ ও তাবীলের বিষয়ও সৃষ্টি করা হতো না।

মুঈয ও তার পূর্বসূরিরা স্বেচ্ছায় এ ধরনের কুফরী কথাবার্তাসুলভ কাব্য-পঙক্তি শুনতে পছন্দ করত। তারা এর জন্য নিষেধাজ্ঞামূলক কোনো প্রতিক্রিয়াও দেখাতো না; বরং নিজেদেরকে কবিতার কাঙ্ক্ষিত মানস ভাবতেই তৃপ্তিবোধ করতো। মিসর অভিমুখে মুঈয সফর করেছিলেন ৩৬২ হিজরী সনে।

৩৬২ হিজরীর রজব মাসেই বারাকার মাকবারায়ে মালাহিদায় যিন্দীক কাফের ইবনে হানীকে হত্যা করা হয়। তার বয়স ছিল ৪২ বছর। বারাকা সমুদ্রের তীরে তার লাশ কুকুরের ন্যায় নিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।

মুঈয তার হত্যার সংবাদ শুনে খুবই আফসোস করেছিলেন। বলেছিলেন, আমরা পশ্চিমাঞ্চলের কবিরা এই লোকটি নিয়ে গর্ববোধ করার আশা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের সে সৌভাগ্য হলো না।[১১৫]

মুঈয পথ চলতে চলতে মিসর সীমান্তের নিকটবর্তী হয়ে গেলেন। তিনি ৩৬২ হিজরীর শাবান মাসের ২৩ তারিখে ইস্কান্দারিয়ায় পৌছেন। মিসরের অসংখ্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তা, বাহিনীপ্রধান ও শুভাকাঙ্ক্ষীবৃন্দ তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

মুঈয এর রাজত্বের সীমানা পাশ্চাত্যের সিবতা থেকে প্রাচ্যের মক্কা পর্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল। আটলান্টিক উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহের অধিবাসীদের তিনি ছিলেন ব্যাপক ক্ষমতাধর এক শাসনকর্তা।

মুঈয মাত্র আড়াই বছর মিসরে থাকতে পেরেছেন। তিনি ৩৬৫ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের ৭ তারিখে কায়রোয় মৃত্যুবরণ করেন। আফ্রিকা ও মিসরে প্রায় ২৩ বছর তার শাসনব্যবস্থা চালু ছিল।[১১৬]

---

[১১৫] আল ফাতহুল আরাবি ফী লিবিয়া : ৩৬২।

[১১৬] আল ফাতহুল আরাবি ফী লিবিয়া : ৩৬২।

শায়খ তাহের যাভি রহ. বলেন, ফাতেমি সাম্রাজ্য টিকে ছিল ২৬০ বছর। ৫২ বছর মরক্কোয়। ২০৮ বছর মিসরে। তাদের শাসক বা খলিফা ছিল ১৪ জন। প্রথম খলিফার নাম উবায়দুল্লাহ মাহদি। শেষজনের নাম ছিল আল আযিদ। সে ৫৬৭ হিজরী সনে ১০ই মুহাররম মিসরে মৃত্যুবরণ করে।

তার মৃত্যুর মাধ্যমেই পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমাঞ্চল ফাতেমিদের শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ তাআলারই। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে রাজত্ব দান করেন। আর যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন।[১১৭]

ইমাম যাহাবি রহ. বলেন, এ সময়ই রাফেযিরা আত্মপ্রকাশ করে। তারা ক্রমে ক্রমে দল ভারি করতে থাকে। মিসর, সিরিয়া, হিজাযে উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাতে থাকে। ইরাক, জাযিরা ও আজম বা অনারবে বনী বুইয়া রাজত্ব করে। খলিফা মুতি বনী বুইয়ার ব্যাপারে দুর্বল ছিল। এরপর তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয় এবং একেবারেই কর্মক্ষম হয়ে যায়। তখন লোকেরা তাকে অপসারণ করে। তার পুত্র আত-তাই লিল্লাহকে মসনদে বসায়। সে তার নামে মুদ্রা চালু করে। খুতবায় তার নাম সংযুক্ত করে। আর অল্পস্বল্প কাজ করে। সুতরাং ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, খলিফা মুঈয এর রাজত্বই ছিল সবচে সুদীর্ঘ ও স্থিতিশীল।[১১৮]

মুঈয কবিতাও লিখতেন। তার একটি কবিতা নিম্নরূপ :

لله ما صنعت بنا ✪ تلك المحاجر في المعاجر

أمضى و أقضى في النفو ✪ س الخناجر في الحناجر

ولقد تعبت ببينكم ✪ تعب المهاجر في الهواجر

আল্লাহর কসম! আপনি আমাদের সঙ্গে ওইরূপ কোনো অসদাচরণ করেননি। যেরূপ শ্বাসনালিতে খঞ্জর চালালে তা জীবনাবসান করে দেয়। আপনি তো নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের দরুণ এমন কষ্টক্লেশ সহ্য করেছেন- যা কেবল খা খা ধূসর মরুভূমিতে ক্লান্ত পথিকই সহ্য করে থাকে।

ইমাম যাহাবি রহ. মুঈয সম্পর্কে বলেন, তিনি ৪৬ বছর বেঁচেছেন। তার জন্মস্থান মাহদিয়া। তাকে ৩৬৫ হিজরী সনে কায়রোর জাতীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।[১১৯]

***

---

[১১৭] আল ফাতহুল আরাবি ফী লিবিয়া : ২৬২।

[১১৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৫ : ১৬৪।

[১১৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৫ : ১৬৬।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## উত্তর আফ্রিকায় উবায়দিয়াদের অন্যায়-অপরাধসমূহ

শিয়া বাতেনি রাফেযি সম্প্রদায়ের লোকেরা উত্তর আফ্রিকায় বসবাসরত আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে এমন জঘন্য ও মর্মান্তিক আচরণ করেছে, যা শুনলে যুবক বৃদ্ধ হয়ে যাবে। মানববিবেক হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। তারা বিশেষত আলেম-উলামাদের উপরই নিজেদের সকল রাগ ও গোস্বা উগড়ে দিয়েছে।

১. উবায়দুল্লাহ যখন নিজেকে রাসূল দাবি করল, তখন কায়রাওয়ানের দুজন ফকীহকে তার সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। সে তার রাজকীয় মসনদে বসা ছিল। সে তার এক ভৃত্যের কানে কিছু নির্দেশনা দিলে সে শায়েখদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, ইনি আল্লাহর রাসূল? তারা রাগত স্বরে বললেন, আল্লাহর কসম! যদি সে তার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র নিয়ে আসে, আর সে যদি বলে, সে আল্লাহর রাসূল, তবুও আমরা এরূপ কথা বলব না। তখন সে রাগে ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের উভয়কে হত্যা করার নির্দেশ দেয়।[১২০]

পশ্চিমাঞ্চলের সেই দুই মহান শায়েখের নাম, ইবনে হুযাইল ও ইবনে বারদূন।

ইমাম যাহাবি রহ. ইবনে বারদূন রহ. সম্পর্কে বলেন, তিনি হলেন শহীদ ইমাম মুফতী আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে বারদূন আয-যাভি। তিনি আফ্রিকার মালেকীদের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন এবং আবু উসমান আল হাদ্দাদের বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন।[১২১]

তাকে হত্যা করতে নিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কি আপনার মত পরিবর্তন করবেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি কি ইসলাম থেকে ফিরে আসব?

বলা হয়, এ ঘটনা ঘটেছিল ২৯৯ হিজরী সনে।[১২২]

---

[১২০] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৪: ২১৭।
[১২১] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৪ : ২১৫।
[১২২] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৪ : ২১৫।

যিন্দীক মুরতাদ উবায়দুল্লাহ মাহদি কেবল নিজেকে নবী দাবি করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং সে তার অনুসারীদেরকে এমনভাবে প্ররোচিত ও প্রভাবিত করেছে, যাতে তারা তাকে খোদার মর্যাদা দেয়। তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার ছিল এই, দৃশ্য ও অদৃশ্যের সংবাদ জানার অধিকারী কেবল আমাদের এই মহান অভিভাবকেরই আছে।

অদৃশ্যের সংবাদ ও জ্ঞান সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা হলো, অদৃশ্যের সংবাদ কেবল আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। এটি ঐশ্বরিক গুণবৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ গায়বের সংবাদ জানে বলে দাবি করে তবে সে স্পষ্ট শিরক ও কুফরি করল। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন,

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.

তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তা তিনিই জানেন। কোনো পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোনো শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোনো আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে।[১২৩]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ.

বলুন, আল্লাহ্ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে কেউ গায়বের খবর জানে না। আর তারা এটাও জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে।[১২৪]

মাখলুক বা সৃষ্টির নামে কোনো কসম বা অঙ্গীকার করা যায় না। বরং স্রষ্টার

---

[১২৩] সূরা আনআম : ৫৯।
[১২৪] সূরা নামল : ৬৫।

নামেই অঙ্গীকার করতে হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت... যে ব্যক্তি কসম করতে চায় সে যেন আল্লাহ তাআলার নামেই কসম করে। অন্যথা যেন চুপ করে থাকে।

বক্ষ্যমাণ হাদিসে পূর্বপুরুষদের নামে কসম অঙ্গীকার করতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।[১২৫]

২. উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের কবিগণ খলিফাদের নিয়ে এমন উলঙ্গ প্রশংসা করতো যে, কখনো কখনো তা কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যেত। তারা সেগুলো মানুষের কাছে প্রচার-প্রসারও করত। যেমন ইতোপূর্বে মুঈযের প্রশংসা করে কবি ইবনে হানী আন্দালুসির কবিতা উল্লেখ করা হয়েছে।

উবায়দি কবিদের একজন খলিফা উবায়দুল্লাহর প্রশংসা করে বলেছে,

حل برقادة المسيح ✪ حل بها آدم و نوح
حل بها الله ذو المعالي ✪ فكل شيء سواه رايح.

রাকাদায় হযরত মাসীহ আগমন করেছে। নবী আদম ও নূহ এখানে এসেছে। এখানে উচ্চ মর্যাদাবান আল্লাহ এসেছেন। সুতরাং তাকে ছাড়া আর সবকিছুই অবান্তর।

একইভাবে তাদের কবিরা রাজধানী মাহদিয়াকে মক্কা মুকাররমার এবং মাহদিয়া প্রাসাদকে কাবার সঙ্গে তুলনা করে বলেছে,

هي المهدية الحرم الموق ✪ كما بتهامة البلد الحرام
وان لثم الحجيج الركن أضحى ✪ لنا بعراص قصركم التثام

এই মাহদিয়া (আমাদের কাছে) এমনই সম্মানিত ও সুষমামণ্ডিত, যেমন তিহামায় (মক্কায়) পবিত্র ভূমি (মাসজিদুল হারাম)। যদিও কোনো বিবাদী আমাদের কাছে তোমাদের প্রাসাদের মনিমুক্তা সুস্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়, তবুও তা আমাদের কাছে গৌণ।

---

[১২৫] কিতাবুত তাওহীদ, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব : ৯০।

৩. তারা আহলুস সুন্নাহর সঙ্গে সর্বক্ষণ দ্বন্দ্ব লাগিয়ে রাখত। তারা মেষ গাধার মাথা দোকানপাট ও বাহনজন্তুর মাথায় স্থাপন করত। সেগুলোতে সাহাবায়ে কেরামের নাম লিখত। আল্লাহ তাআলা তাদের যথাবদলা দিন। তারা সাহাবায়ে কেরামকে গালমন্দ করত। তারা মনে করত, নবী কারীম সা.-এর ইন্তিকালের পর তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। তারা বাজারে বাজারে দাওয়াত দেওয়ার জন্য নিজেদের বিশেষ দাঈ নিয়োগ করত।

কেউ কোনো সাহাবীর ভালো গুণের কথা বললে কিংবা কাউকে হযরত আলি রা.-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলে তাকে হত্যা করত বা কারাবন্দী করে রাখত।[১২৬]

৪. উবায়দিয়ারা তাদের পূর্ববর্তী সুন্নী খলিফাদের অনন্য অবদান ও অমরকীর্তিমালার অসংখ্য স্মৃতি মুছে দিয়েছে। উবায়দুল্লাহ এক নির্দেশবলে দুর্গ ও মসজিদের ফলকে যেসব শাসকের নাম ছিল তা মুছে ফেলেছে। তাদের পরিবর্তে সেখানে নিজের নাম খোদাই করিয়েছে। এই নরপিশাচ রাফেযি শাসক কারাবন্দীদের ধনসম্পদ ও দুর্গের অস্ত্রশস্ত্র কুক্ষিগত করে নেয়। সে যিয়াদ আগলাবির প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণকারী অসহায় অনাথদেরকে তাড়িয়ে দেয় এবং নিজের অস্ত্রশস্ত্র রাখার গুদাম বানায়।[১২৭]

৫. উবায়দিয়ারা নিজেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে যে কোনো ধরনের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। এ কারণে তারা একটি নির্যাতন সেল তৈরি করে। যেখানে রাতের প্রথম প্রহরে লোকদের ধরে এনে নির্যাতন করা হত। এরপরও কেউ নিবৃত্ত না হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হত। একইভাবে কোনো আলেমের মৃত্যুতে লোকজন জানাযায় সমবেত হলে তারা দ্রুতই তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিত।[১২৮]

এ ধরনের অপতৎপরতা বোয়েলসীয় দর্শনেও প্রচলিত রয়েছে। আর এর উপমা কেবল গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী স্বৈরশাসকদের বেলায়ই পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

[১২৬] মাদরাসাতুল হাদিস ফী কায়রাওয়ান : ১ : ৭৩।
[১২৭] দেখুন, রিয়াযুন নুফূস : ২ : ৫২।
[১২৮] রিয়াযুন নুফূস : ২ : ২৯।

مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ.

আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তা-ই বোঝাই। আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই।[১২৯]

৬. তারা আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শী আলেমদের রচনাবলি ধ্বংস করে দিয়েছে। মানুষকে সেগুলোর সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসার থেকে নিষেধ করেছে। যেমন তারা আবু মুহাম্মদ ইবনে আবু হাশিম আত তুজীবি (মৃত্যু ৩৪৬ হিজরী) এর গ্রন্থাবলির ক্ষেত্রে এরূপ আচরণ করেছে। মৃত্যুর সময় তিনি প্রায় সাত আলমারি ভর্তি কিতাব রেখে গিয়েছিলেন। এর সবগুলোই হাতে লিখিত ছিল। এগুলো বনী উবায়দের সুলতানের সামনে আনা হলে সে ওগুলো ক্রোক করে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষবশত মানুষকে সেগুলো সংরক্ষণ করতে নিষেধ করে দেয়।[১৩০]

৭. তারা ফকীহদেরকে মালেকী মাযহাব অনুসারে ফতোয়া দিতে নিষেধ করে দেয়। এ কাজকে তারা এমন কঠোর অপরাধ গণ্য করে যে, এর জন্য প্রহার, কারাবন্দী, ক্ষেত্রবিশেষে হত্যার বিধান চালু করে। কখনো কখনো মানুষকে প্রভাবিত করে এমন শাস্তিও দেওয়া হয়। যেমন নিহত ব্যক্তির মাথা কায়রাওয়ানের বাজারে বাজারে ঘোরানো হত। ঘোষণা দেওয়া হত, যে ব্যক্তি ইমাম মালেকের মাযহাব গ্রহণ করবে তার পরিণতি এমনই হবে।

কেউ কেবল তাদের নিজেদের মতাদর্শ অনুসারে ফতোয়া দিলে তার ফতোয়া দেওয়া বৈধ ছিল। যেমনটি তারা ফকীহ হুযালী নামে পরিচিত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্বাস বিন ওয়ালিদ (মৃত্যু ৩২৯ হিজরী) এর সাথে করেছে।[১৩১]

৮. তারা আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শী আলেম উলামাদেরকে মসজিদে দরস-তাদরিস ও ইলমের প্রচার-প্রসার করতে বাধা দিত। ছাত্রদের নিয়ে মজমা করতে নিষেধ করত। তখন বনী উবায়দের লোকদের ভয়ে লোকেরা ঘরের নিভৃত কোণে বসে কুরআন-সুন্নাহর কিতাবাদি অধ্যয়ন করত। আবু

---

[১২৯] সূরা মুমিন : ২৯।
[১৩০] রিয়াযুন নুফূস : ২ : ৪২৩।
[১৩১] রিয়াযুন নুফূস : ২ : ৫৬।

মুহাম্মদ বিন আবু যায়েদ ও আবু মুহাম্মদ বিন আল বাত্তান ও অন্যান্যরা কায়রাওয়ানের হাদিসশাস্ত্রের শায়খ আবু বকর ইবনে লাব্বাদ এর কাছে সঙ্গোপনে আসতেন। তারা বনী উবায়দের ভয়ে দু রানের চিপায় এমনভাবে বইপত্র রাখতেন যে, তাদের রগে টান পড়ত।[১০২]

চলমান ইসলামি বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রও এ ধরনের মনোবৃত্তি লালন করে। নিজেদের সুবিধার জন্য তারা সর্বধরনের বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আদর্শ প্রচার-প্রসারে বাধা দেয়। কেউ কেউ আবার রাষ্ট্রের লক্ষ্য-আদর্শের পথে অন্তরায় নয় এমন কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দিলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে।

৯. তারা মানুষকে নিজেদের মতাদর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য করত। যারা তাদের দাওয়াত গ্রহণ করত তারা মুক্তি পেয়ে যেত। কখনো কখনো ব্যক্তিবিশেষকে ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন করত। আর যে দাওয়াত পরিহার করত তাকে হত্যা করত। যেমনটি তারা সর্বপ্রথম করেছে কায়রাওয়ানে উবায়দুল্লাহর প্রথম ভাষণ দানের পর। তখন কায়রাওয়ানবাসী ও উবায়দিয়াদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়।

তখন শিয়ায়ী জনসাধারণ থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ দেয়। অসংখ্য বিতর্ক মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। তখন আহলুস সুন্নাহর আলেমদের বিরাট ত্যাগ-কুরবানি ও কষ্ট-সংগ্রাম করতে হয়। হাজার হাজার আলেম কেবল ইসলামি ধর্মাদর্শ গ্রহণ এবং সুন্নাহর বিপরীত কর্মতৎপরতা প্রতিরোধ করার কারণে নিহত হন বা ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলেন।

আল-কাবিসী রহ. বলেন, মাহদিয়াতে উবায়দিয়াদের অনুপ্রবেশের পর থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত উবায়দিয়াদের জেলখানা দারুল বাহরে প্রায় চার হাজার লোক নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেছে। তাদের কেউ ছিলেন পণ্ডিত আলেম। কেউ ছিলেন সাধকপুরুষ। আর কেউ ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও নেককার মানুষ।[১০৩]

এই সংখ্যা হলো, যারা জেলখানার বাইরে নিহত হয়েছে তাদের। তাদেরকে কায়রাওয়ানের রাস্তায় গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হত। নির্যাতনের এই পন্থা জনমানুষের জীবনে মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করে। আবু

---

[১০২] দেখুন, মাদরাসাতুল হাদিস ফী কায়রাওয়ান : ১ : ৭৬।
[১০৩] মাদরাসাতুল হাদিস বিল কায়রাওয়ান : ১ : ৭৪।

মুহাম্মদ আল ওয়ারদানীর ন্যায় অসংখ্য আলেম- যারা ইসলাম বিরোধী ফিতনা দমনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন, নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তাদের নাম ও অবদান তখন ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়নি।[১০৪]

যাইহোক, এই অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়ন উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী খাঁটি মুসলিমদের মনোবল ও ধৈর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের নীতি-আদর্শকে মনে-প্রাণে আঁকড়ে ধরতে প্রেরণা যুগিয়েছে।[১০৫]

১০. যে সকল লোক তাদের মতাদর্শ গ্রহণ করেছে তারা তাদের থেকে শরীয়তের ফরয বিধিবিধান পালন শিথিলযোগ্য করে দিয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে শরয়ী বিধান তাদের থেকে রহিত করে দিয়েছে। যাতে তাদের দূরভিসন্ধি বাস্তবায়িত হয়। তারা লোকদেরকে প্রভাবিত করে নির্জনকক্ষে নিয়ে যেত। সেখানে উবায়দুল্লাহ দু হাত পা ছেড়ে চাদর উল্টিয়ে পরিধান করে প্রবেশ করত। তাদের বলত, বাহ্! এরপর তাদেরকে নির্জন কক্ষ থেকে বের করে আনা হত। তখন সে তাদেরকে তার কর্মক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলত, এই যে আমি স্বশরীরে তোমাদের কাছে আসলাম। এর কারণ, আমি তোমাদেরকে জানাতে চাই, তোমরা হলে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। তোমাদের কোনো কিছুই করতে হবে না। না অযু, না নামায, না যাকাত। কোনো ফরয বিধানই পালন করতে হবে না। সব ফরয কাজ তোমাদের থেকে রহিত হয়ে গেছে। আর চাদর উল্টিয়ে পরিধান করার কারণ, আমি তোমাদেরকে এ কথা জানাতে এসেছি যে, তোমরা আজ থেকে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করছ। আমি তোমাদেরকে বাহ বলেছি। এর কারণ, আমি তোমাদেরকে এ কথা জানাতে চাচ্ছি যে, আজ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায় যেমন ব্যভিচার, মদপান ইত্যাদি সবই তোমাদের জন্য বৈধ।[১০৬]

এ পর্যায়ে আমি বনী উবায়দের নিন্দা ব্যক্ত করে উত্তর আফ্রিকার আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শী কবি আবুল কাসিম ফাযারির কবিতা উদ্ধৃত করা খুবই সঙ্গত মনে করছি। কবিতাটি নিম্নরূপ,

---

[১০৪] মাদরাসাতুল হাদিস বিল কায়রাওয়ান : ১ : ৭৪।
[১০৫] মাদরাসাতুল হাদিস বিল কায়রাওয়ান : ১ : ৭৫।
[১০৬] রিয়াযুন নুফুস : ২ : ৫০৪।

عبدوا ملوكهم وظنوا أنهم ✪ نالوا لهم سبب النجاة عموما.

তারা তাদের রাজা-বাদশাদের পূঁজা করেছে। মনে করেছে, তারা তাদের জন্য মুক্তির সমূহ কারণ-উপকরণ অর্জন করে নিয়েছেন।

وتمكن الشيطان من خطواتهم ✪ فأراهم عوج الضلال قويما.

শয়তান তাদের কর্ম-পদক্ষেপে সুযোগ নিয়েছে। ভ্রান্ত পথকে তাদের সামনে সুপথ রূপে দেখিয়েছে।

رغبوا عن الصديق والفاروق ✪ في أحكامهم لا سلموا تسليما.

তারা নিজেদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে হযরত সিদ্দিকে আকবার ও উমর ফারুক রা. থেকে বিমুখ থেকেছে। তারা তাদেরকে কিছুতেই গ্রহণ করেনি।

واستبدلوا بهما ابن أسود نابحا ✪ وأبا قدرة واللعين تميما.

তারা তাদের পরিবর্তে গ্রহণ করেছে অভিশপ্ত তামীমকে ও ইবনে আসওয়াদ নাবীহকে। তারা কুদরতকে অস্বীকার করেছে।

تبعوا كلاب جهنم وتأخروا ✪ عمن أصارهم الإله نجوما.

তারা জাহান্নামের কুকুরকে অনুসরণ করেছে। তারা এমন ব্যক্তিদের অনুসরণ থেকে পিছিয়ে রয়েছে- আল্লাহ তাআলা যাদেরকে আকাশের তারকাতুল্য বানিয়েছেন।

ياليت شعري من هم إن جهلوا ✪ دنيا، ومن هم إن عددت صميما.

হায়! আমার বুঝে আসে না, তারা কোন শ্রেণির, যদি দুনিয়াকে ভুলে যায়? তারা কোন শ্রেণির, যদি তুমি স্বচ্ছ চিন্তা-চেতনার অধিকারীদের কথা ভাবো?

أمن اليهود؟ أم النصارى؟ أم هم ✪ دهرية جعلوا الحديث قديما.

তারা কি ইহুদি? নাকি নাসারা? নাকি তারা এমন অর্বাচীন- যারা নশ্বরকে অবিনশ্বর বানিয়েছে?

أم هم من الصابين أم من عصبة ✪ عبدوا النجوم وأكثروا التنجيما.

নাকি তারা অগ্নিপূঁজারী, নাকি এমন গোষ্ঠি- যারা তারকার পূঁজা করে এবং অধিকহারে তারকাপুঞ্জ খুঁজে বেড়ায়?

أم هم زنادقة معطلة رأوا ✪ أن لا عذاب غدا ولا تنعيما.

*নাকি তারা নিরেট যিন্দীক, যারা মনে করে, আগামীকাল (আখেরাতে কর্মের জন্য) কোনো আযাব বা প্রতিদান নেই।*

أم عصبة ثنوية قد عظموا ✪ النورين عن ظلماتهم تعظيما.

*নাকি তারা আলোপূঁজারী গোষ্ঠি- যারা অন্ধকারের বিপরীতে দুটি আলোকেই বেশি সম্মান দিয়ে থাকে।*

من كل مذهب فرقة معلومة ✪ أخذوا بفرع وادعوه أروما.

*প্রতিটি মতবাদেই কিছু নির্দিষ্ট দল-উপদল আছে। যারা সেই মতবাদের কিয়দাংশ গ্রহণ করে বলে, আমরাই সকল পুণ্যের ভাগিদার।*[১৩৭]

সামনে তার আরো একটি কবিতা উল্লেখ করা হবে। যেখানে তিনি বনী উবায়দের নিন্দা করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে কীভাবে তাদের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন– তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

১১. তারা আযানের মধ্যে حي على خير العمل বাক্য সংযুক্ত করেছে। ফজরের আযান থেকে الصلاة خير من النوم বাক্য বাদ দিয়েছে। মানুষকে রমযানের কিয়ামুল লাইল নামায পড়তে নিষেধ করেছে। বনী উবায়দের পক্ষে এই নামায পড়া বা কাউকে পড়তে দেখা দুঃসহ যন্ত্রণা ছিল। তারা চাশতের নামায পড়তে নিষেধ করেছে। মানুষকে ফিতনায় ফেলার জন্য যোহরের নামাযের সময় এগিয়ে দিয়েছে। জুমার খুতবায় সাহাবায়ে কেরামকে গালিগালাজ এবং কুফরী বাক্য সংযুক্ত করেছে। যদিও মানুষ সেটা মেনে নেয়নি। তাদের যুগে মসজিদগুলো বিরান করে দেওয়া হয়েছে। তাদের কোনো কোনো ইমাম রাকাদার দিকে ফিরে নামায পড়ত। উবায়দুল্লাহ যখন মাহদিয়ায় আগমন করে, তখন তারা সেদিকে ফিরে নামায পড়তে থাকে।[১৩৮]

অধিকাংশ বছরই তারা মানুষকে শাওয়ালের চাঁদ দেখার আগেই ঈদুল ফিতর উদযাপন করতে বাধ্য করত। (মাদরাসাতুল হাদিস ফিল

---

[১৩৭] *প্রাগুক্ত : ২ : ৪৯৪-৪৯৫।*

[১৩৮] দেখুন, মাদরাসাতুল হাদিস বিল কায়রাওয়ান : ১ : ৭৩।

কায়রাওয়ান : ১ : ৭৩)

বরং কেউ যদি চাঁদ দেখা ছাড়া ঈদুল ফিতর উদযাপন বৈধ নয় বলে ফতোয়া দিত, তবে তাকে হত্যা করত। যেমনটি তারা বারাকা শহরের বিচারপতি ফকীহ মুহাম্মদ বিন হুবলার সঙ্গে করেছে।

ইমাম যাহাবি রহ. তার জীবনী উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, মহামান্য শহীদ ইমাম মুহাম্মদ বিন হুবলা ছিলেন বারাকা শহরের বিচারপতি। একবার বারাকা শহরের প্রশাসক তার সঙ্গে দেখা করতে এসে বললেন, আগামীকাল ঈদ।

তিনি বললেন, যতক্ষণ না আমরা ঈদের চাঁদ দেখব ততক্ষণ ঈদ নয়। মানুষও রোযা ভেঙ্গে ঈদ পালন করতে পারবে না। আপনি কি তাদের গোনাহের বোঝা নিজের কাঁধে নেবেন?

প্রশাসক বললেন, মানসূরের পত্রে এমন নির্দেশই এসেছে। উবায়দিয়াদের সিদ্ধান্ত হলো, তারা দিন গুণে ঈদ করবে। তারা চাঁদ দেখা ধর্তব্য করে না। তখন আর চাঁদ দেখা হলো না। সকাল বেলা প্রশাসক ঢোল-তবলা ও ঈদের দফ বাজালেন।

বিচারপতি বললেন, আমি বের হব না এবং নামায়ও পড়ব না। তখন প্রশাসক এক লোককে নির্দেশ দিলে সে খুতবা পড়ে এবং মানসূরের পক্ষ থেকে পাঠানো চিঠি পড়ে শোনায়।

এরপর প্রশাসক বিচারপতিকে তলব করেন। তাকে বললেন, আপনি আপনার মত পরিবর্তন করুন। আমি আপনার পক্ষ থেকে সুলতানের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব। বিচারপতি তা থেকে বিরত থাকেন। এর শাস্তিস্বরূপ প্রশাসক তাকে সারাদিন সূর্যের নিচে দাঁড় করিয়ে রাখেন। এক পর্যায়ে তিনি নিদারুণ পিপাসায় কাতর হয়ে পানি খেতে চান। কিন্তু তাকে পানি দেওয়া হয়নি। এরপর তারা তাকে একটি কাঠখণ্ডে ঝুলিয়ে শূলিতে চড়ায়। জালিমদের ওপর আল্লাহ তাআলার অভিশাপ নাযিল হোক।[১৩৯]

১২. উবায়দুল্লাহর অসংখ্য অপকর্মের অন্যতম একটি হলো, সে তার ঘোড়া মসজিদে রাখত। তখন খানসামাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি কীভাবে

---

[১৩৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৫ : ৩৭৪।

ঘোড়া নিয়ে মসজিদে প্রবেশ কর?

লোকেরা বলল, এর পেশাব ও মূত্র পবিত্র। কেননা এটা তো মাহদীর ঘোড়া। মসজিদের দায়িত্বশীল তাদের এ অপকর্মটির প্রতিবাদ জানালে তারা তাকে মাহদির কাছে নিয়ে গেল। তখন সে তাকে হত্যা করল।

ইবনে আযারী রহ. বলেন, উবায়দুল্লাহ শেষ জীবনে নানান রোগে আক্রান্ত হয়। তার পায়খানার রাস্তায় কীট জন্মায়। যা পায়খানার রাস্তার সব গোশত খেয়ে ফেলেছিল। শেষে সে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করে।[১৪০]

মুসলমানদের এক বৃহদাংশ, যারা উবায়দিয়াদের ইতিহাস পড়েন তারা কেবল তাদের রাজনৈতিক ইতিহাসটুকুই জানেন। অর্থাৎ, কার পরে কে ক্ষমতায় এসেছে। তারা একটি জ্ঞানপিয়াসী জাতি। তারা বিপুল গ্রন্থাবলি প্রকাশ করেছে। যদিও সেগুলো কেবল দর্শনশাস্ত্রীয় বইপুস্তক। কিন্তু তারা আহলুস সুন্নাহর আলেমগণের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়নের যে স্ট্রীম রোলার চালিয়েছে সে কথা কেউ উল্লেখ করেনি। বরং যে সকল ছাত্র ইসলামি ইতিহাস অধ্যয়ন করে তারা মুঈয উপনামধারী মাআদ বিন ইসমাঈলের কথা গর্বভরে স্মরণ করে। বরং তাকে কালের মহানায়ক আখ্যা দিয়ে থাকে![১৪১]

এর প্রকৃত কারণ, আমাদের ইসলামি আদর্শের ইতিহাস ঐতিহ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। যে সকল ঐতিহাসিক আমাদের ইতিহাস রচনা করেছেন, তারা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের রচনাবলি থেকে কিংবা শিয়া মতাদর্শী লেখকদের রচনা থেকে তথ্য উপাত্ত আহরণ করেছেন। কিংবা তাদের পেছনে অর্থকড়ি ঢালা হয়েছে, যাতে ইতিহাসের ঐসকল মহান বীরদের অমরকীর্তি ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয় এবং তাদের অবদানগুলোকে দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যাওয়া হয়।

কিন্তু এটা সত্য যে, সুষ্ঠু চেতনা কখনো দমিয়ে রাখা যায় না। যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে তা নবরূপ ধারণ করে। ইসলামের শত্রুরা সদাসর্বদা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে দিন-রাতের সর্বক্ষণে ইসলামের ওই সুমহান আদর্শ ও চেতনা দুমড়ে মুচড়ে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, যে আদর্শ আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শী

---

[১৪০] ইতিহাস কি আবার ফিরে আসবে? মুহাম্মদ আবাদা : ৩৯।
[১৪১] ইতিহাস কি আবার ফিরে আসবে : মুহাম্মদ আবাদা কৃত : ৪০।

আলেম-উলামাগণ যুগ পরম্পরায় প্রিয়নবী সা. ও তার উত্তম সঙ্গীদের কাছ থেকে আহরণ ও ধারণ করেছেন।

***

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

## আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শী আলেমদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শী আলেম-উলামাগণ দাওয়াত-তালিম তথা শিক্ষাদীক্ষা, আলোচনা, আহ্বান ও দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে এবং দুরাচারী জালেমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের মাধ্যমে উবায়দি রাফেযিদের ভিত উৎপাটনে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাদের গৃহীত পদক্ষেপ ও কর্মপন্থা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। যথা :

ক. উবায়দিয়াদের কর্মতৎপরতার বিরোধিতা করে আলেম ও ফকীহগণ নিদারুণ কষ্ট সহ্যকরণ, কারাবরণ, শহীদ হওয়ার পথ বেছে নিয়েছেন। আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শী সাধারণ মুসলমানগণও এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলেন না। উবায়দিয়ারা আলেমগণকে ক্ষমতা ও পদ-পদবির লোভ দেখিয়ে কিংবা জনবিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে বারবার নিবৃত্ত করার অপকৌশল গ্রহণ করেছে।

খ. আলেমগণ উবায়দিয়াদের সকল প্রশাসন ও সংস্থাকে বয়কট করেছেন। সুতরাং তারা তাদের আদালতে বিচার নিয়ে যেতেন না। তাদের ইমামদের পেছনে নামায পড়তেন না। তাদের কোনো সম্মানীয় স্থানে যেতেন না। তাদের সাথে উত্তরাধিকার সম্পর্ক রাখতেন না। তাদের মৃতদের জানাযার নামায পড়তেন না। তাদের সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতেন না।[১৪২]

এই সাহসী কাজটি সর্বপ্রথম করেন ফকীহ আবু ইউসুফ জাবালা বিন হাম্মূদ বিন আবদুর রহমান। তিনি জামে কায়রাওয়ানে বনী উবায়দের পক্ষে প্রদত্ত প্রকাশ্য ভাষণেই উবায়দিয়াদের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন। তিনি যখন তাদের গর্হিত কথাবার্তা শুনতে পেলেন এবং পুরো ব্যাপারটি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল তখন তিনি সটান দাঁড়িয়ে এর বিরোধিতা করলেন। তিনি নিজের মাথা তুলে ধরলেন, যাতে মানুষ তাকে দেখতে পায়। বক্তব্য শেষে তিনি জামে কায়রাওয়ানের সর্বশেষ ফটকের দিকে হাঁটতে লাগলেন। মানুষ তার দিকে তাকিয়ে ছিল। তিনি দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতে যেতে বলতে লাগলেন, তারা আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করেছে। আল্লাহ তাদেরকে টুকরো টুকরো করে দিন।

তখন থেকে আলেমগণ উবায়দিয়াদের সমাবেশ বয়কট করতে শুরু করেন।

---

[১৪২] দেখুন, মাদরাসাতু আহলিল হাদিস ফী কায়রাওয়ান : ১ : ৭৮।

তিনিই সর্বপ্রথম মানুষদেরকে উবায়দিয়াদের ষড়যন্ত্র ও ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।[১৪৩]

গ. উত্তর আফ্রিকার আলেমগণ ফতোয়া প্রচার করেন, তাতে দলিল-প্রমাণসহ বনী উবায়দের কুফরী মতাদর্শ উপস্থাপন করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, তারা কিবলাধারী নয়। স্বেচ্ছায় যারা তাদের দাওয়াতে সাড়া দেবে তারাও কাফের। যারা তাদের মতাদর্শের পক্ষে কথা বলবে তারাও কাফের। এই ফতোয়া ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল। সাধারণ ও গুণীজন সকলেই এ ফতোয়ার কথা জানতেন। সুতরাং তা রাফেযিদের আহ্বানে সাড়া দান ও জনসাধারণের মাঝে বিরাট প্রতিবন্ধকতার কাজ করেছিল। সেই নাজুক ও সংকটময় মুহূর্তে উত্তর আফ্রিকার যে সকল আলেম-উলামা জনসাধারণকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতাদর্শের ওপর অটল-অবিচল রাখতে প্রত্যয়ী ভূমিকা পালন করেছিলেন- তাদের অন্যতম হলেন, শায়খ আবু ইসহাক সিবায়ী রহ.। তিনি পর্যালোচনা করে দেখেছিলেন যে, খারেযিরা আহলুল কিবলা। তখন তিনি উবায়দিয়াদের পরিবর্তে তাদের সঙ্গে অবস্থান করার পথই অবলম্বন করেন।

শায়খ ফকীহ আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান আল খাওলানী রহ. বলেন, শায়খ আবু ইসহাক সিবায়ী রহ. আফ্রিকার মাশায়েখদের সঙ্গে আবু ইয়াযীদের সঙ্গে সংঘটিত বনী আদুবিল্লাহর যুদ্ধে গমন করেন। তখন আবু ইসহাক রহ. আবু ইয়াযীদের সৈন্যবাহিনীর দিকে ইশারা করে বলেন, এরা হলো কিবলার অনুসারী। আর বনু আদুবিল্লাহর সৈনবাহিনীর দিকে ইশারা করে বললেন, এরা কিবলার অনুসারী নয়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, আমরা কিবলার অনুসারী নয় ওই বনু আদুবিল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কিবলার অনুসারী খারেযিদের সঙ্গে বের হব। যদি আমরা যুদ্ধ বিজয়ী হই তবে আমরা আবু ইয়াযীদের অধীনে যাব না। কেননা সে খারেযি। আল্লাহ তাআলা তার ওপর একজন ন্যায়পরায়ণ শাসককে চাপিয়ে দেবেন। তিনি তাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবেন এবং তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।

তার সঙ্গে যেসব ফকীহ ও আবিদ অংশগ্রহণ করেন, তারা হলেন, আবুল আরব ইবনে তামীম। আবু আবদুল মালিক মারওয়ান ইবনে নাসরাওয়ান, আবু ইসহাক সিবায়ী, আবুল ফযল মুসাম্মা ও আবু সুলাইমান রবী আল কাত্তান।[১৪৪]

---

[১৪৩] দেখুন, রিয়াযুন নুফূস, মালিকী : ২ : ৪৩।
[১৪৪] রিয়াযুন নুফূস লিল মালেকি : ২ : ৪৩।

হযরত রবী আল কাত্তান রহ. ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি উবায়দিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার দাবি করেন। তিনি এর জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও প্ররোচিত করেছেন।

জুমার নামাযের সময় হলে ইমাম মিম্বরে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন আহমদ বিন মুহাম্মদ ইবনে আবুল ওয়ালিদ। তিনি এক আবেগঘণ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি মানুষকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। তাদেরকে এমন এমন কাজ ও আমল করতে উৎসাহ দেন, যাতে বিপুল সাওয়াব রয়েছে। তিনি ভাষণের শুরুতে সূরা নিসার ৯৫ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন।

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-যাদের কোনো সঙ্গত ওযর নেই- (তারা আর যুদ্ধে গমনকারীদের মর্যাদা) সমান নয়।[১৪৫]

এরপর তিনি বলেন, হে লোকসকল! তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহর কুফরী করে। যারা মনে করে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো মাবুদ রয়েছে। যারা আল্লাহর বিধান ও শরীয়ত পরিবর্তন করে এবং যারা আল্লাহর নবীকে, তার সঙ্গীদেরকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে গালিগালাজ করে।

তার খুতবা শুনে লোকেরা হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। তিনি খুতবায় আরও বলেন, হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই এই কারামেতারা কাফের। তারা ইবনে উবায়দুল্লার নামে পরিচিত। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইলাহ দাবি করে। আপনার নেয়ামতসমূহ অস্বীকার করে। আপনার প্রভূত্ব অস্বীকার করে। আপনার নবী-রাসূলকে গালি দেয়। আপনার নবী মুহাম্মদ সা. ও আপনার উম্মতের শ্রেষ্ঠ লোকদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আপনার নবীর সাহাবীদেরকে, নবীপত্নী উম্মাহাতুল মুমিনীনদেরকে গালি দেয়। আপনার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এবং আপনার সহনশীলতার গুণকে তুচ্ছ করে আপনার উম্মতের সম্মানহানী করে।

হে আল্লাহ! আপনি তাদের ওপর কঠোর অভিশাপ দিন। তাদেরকে দীর্ঘ সময় লাঞ্ছিত করুন। সকাল-সন্ধ্যা তাদের ওপর আযাব নাযিল করুন। তাদেরকে জাহান্নামে পাঠান এবং তাদের পরিণতি অশুভ করুন। দুনিয়াতে তাদেরকে

---

[১৪৫] সূরা নিসা : ৯৫।

অন্যান্য লোকদের জন্য শিক্ষণীয় উপমা বানান। পরবর্তীদের মাঝে তাদের ভয়াবহ দুর্দশার আলোচনা বাকি রাখুন।

হে আল্লাহ! আপনি তাদের পুরো দলকে ধ্বংস করুন। তাদের মুখের বুলি ছিন্নভিন্ন করে দিন। তাদের ঐক্য ও একতা ছিন্ন করে দিন। তাদের শক্তি-ক্ষমতা চূর্ণ করে দিন। মুমিনদের অন্তরসমূহে প্রশান্তি দান করুন।

এরপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে জুমার দু রাকাত নামায পড়ালেন। সালাম ফিরিয়ে বললেন, ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল শনিবার আমরা যুদ্ধে বের হব।[১৪৬]

রবী আল কাত্তান নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হন। ঘোড়ার পিঠে যুদ্ধ সরঞ্জাম ছিল। তার গলায় কুরআন কারীম ঝুলানো ছিল। তার চারপাশে ছিল কায়রাওয়ানবাসীর একদল যোদ্ধা। যারা আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল। তাদের গায়ে ছিল যুদ্ধাস্ত্র। আল কাত্তান তাদের দিকে তাকিয়ে খুশি হলেন। বললেন, সকল প্রশংসা ওই মহান সত্তার, যার দয়ায় আমি মুমিনদের এমন একদল লোককে পেয়েছি– যারা তার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং তার দীনের মর্যাদা বুলন্দ করতে সংঘবদ্ধ হয়েছে। হে আল্লাহ কোন নেক আমলের কারণে আমি আজকে এই পর্যায়ে উপনীত হতে পেরেছি, তা একমাত্র আপনিই জানেন। এরপর তিনি অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। চোখের অশ্রু তার দাড়ি ভিজিয়ে দিল। এরপর তিনি সঙ্গীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, যদি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সা. তোমাদেরকে এ অবস্থায় দেখতে পেতেন তবে খুবই খুশি হতেন। পরিশেষে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। জেনে রাখো, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।[১৪৭]

---

[১৪৬] রিয়াযুন নুফূস : ২ : ৩৪৩-৩৪৪।
[১৪৭] সূরা তাওবা : ১২৩।

আরও তিলাওয়াত করলেন,

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ . وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের অঙ্গীকার এবং সংকল্প নিয়েছে রাসূলকে বহিস্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ্, যদি তোমরা মুমিন হও। যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ্ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১৪৮]

এরপর তিনি লোকদের দিকে ইশারা করে বললেন, তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো তিনিও তোমাদেরকে স্মরণ করবেন। তখন লোকেরা তাকবীর ধ্বনি দিলো, তারা হাঁটতে হাঁটতে ময়দানে প্রবেশ করল এবং আল্লাহর শত্রু বিরুদ্ধে লড়াই করল। তিনি ৩৩৪ হিজরী সনে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হন। তার সঙ্গে অসংখ্য নেককার আবেদ ও জ্ঞানী পণ্ডিতও শাহাদাত বরণ করেন।[১৪৯]

ঘ. উবায়দিয়াদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন বা তাদের পক্ষাবলম্বন করেছেন আলেম-উলামাগণ এমন ফকীহদেরকে বয়কট করেছেন। এ কারণেই তারা আবুল কাসেম আল বারাযীর গ্রন্থাবলি না পড়তে ফতোয়া দিয়েছেন।[১৫০]

ঙ. উলামায়ে কেরাম সাধারণ মানুষের জন্য নিজেদের বাড়ির দরজা উন্মুক্ত করে দেন। যাতে তারা বাতেনী উবায়দিয়াদের মতাদর্শ খণ্ডন করতে পারেন। শায়খ আবু ইসহাক সিবায়ী রহ. নিজের দরজা উন্মুক্ত করে রাখতেন। তিনি উবায়দিয়াদেরকে ভর্ৎসনা করতেন। লোকদেরকে তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক

---

১৪৮ সূরা তাওবা : ১৩-১৫।
১৪৯ রিয়াযুন নুফূস : ২ : ৩৪৩-৩৪৪।
১৫০ মাদরাসাতুল হাদিস ফিল কায়রাওয়ান : ১ : ৭৮।

করতেন। তিনি অধিক হারে সাহাবায়ে কেরামের ফযীলত বর্ণনা করতেন এবং তাদের গুণকীর্তণ করতেন। লোকজন তার ঘরে বেশি বেশি আসা যাওয়া করার কারণে তা মসজিদের ন্যায় হয়ে গিয়েছিল।

একই অবস্থা শায়খ আহমাদ বিন নসর আল হাওয়ারী ও শায়খ আহমদ বিন ইয়াযীদ আদ দাব্বাগ এরও। উবায়দিয়ারা তাদেরকে মসজিদে দরস দান করতে নিষেধ করায় তারা বাধ্য হয়ে ঘরেই পাঠ দান ও অন্যান্য কাজকর্ম আঞ্জাম দিতেন। উলামায়ে কেরামগণ জনসাধারণের মন-মগজে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের চিন্তা-আদর্শ ও রীতিনীতি গভীরভাবে প্রোথিত করার সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করেছেন।[১৫১]

আল্লাহওয়ালা দাঈ ও ফকীহগণ যুগে যুগে এ পন্থাই অবলম্বন করেছেন। যখন জালেম শাসক বা কুফরী শক্তি তাদের বিরুদ্ধে সমূহচক্রান্ত করতে চেয়েছে। কেননা মানুষকে সত্যপথের দিশা দান এবং তাদেরকে দীনের সঠিক শিক্ষা প্রদান করার কোনো না কোনো পথ তো অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

চ. আহলুস সুন্নাহর আলেমগণ উবায়দিয়াদের কর্মচারী কাত্তামিয়্যীন, সনহাজিয়্যা ও বারবারিয়্যাদের সন্তানদের মনে আহলুস সুন্নাহর উসূল ও আদর্শ দৃঢ়মূল করতে চেষ্টা করেছেন। এ কাজে নিরত ছিলেন আল্লামা আবু ইসহাক আল জাবনিয়ানী ও অন্যান্য আলেমগণ। তারা উবায়দিয়া মতাদর্শ ধারণকারীদের সন্তানদেরকে অতি সুকৌশলে শিক্ষা দান করতেন। তারা তাদের থেকে কোনো পারিশ্রমিক নিতেন না। যাতে তারা তাদের কথা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেয়।[১৫২]

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, সর্বযুগেই ইসলামবিরোধী শক্তির রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মতৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তিদের এবং সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের প্রতি গুরুত্বারোপ করা, তাদেরকে টার্গেট করে কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা এবং দীনকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই কৌশল অবলম্বনের কোনো বিকল্প নেই। ইসলামবিদ্বেষীদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ করা, আর তাদের সন্তানদেরকে শয়তানের হাতিয়ার বানানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের লোকদের জন্য সুখকর নয়।

---

[১৫১] প্রাগুক্ত : ২ : ৭৯।
[১৫২] প্রাগুক্ত : ২ : ৮০।

ছ. পূর্বসূরীদের চিন্তা-চেতনা বিস্তারে আহলুস সুন্নাহার আলেমগণের অন্যতম একটি কৌশল হলো, মুনাযারা করা এবং বিতর্ক করে মানুষের সামনে প্রতিপক্ষকে পরাহত করা। ইতিহাসের গ্রন্থাবলি থেকে জানা যায়, এ সময়ে মুনাযারা ও বিতর্কের ক্ষেত্রে সবচে গুরুত্বপর্ণ অবদান রেখেছেন আলেমে রব্বানী ফকীহ আবু বকর আল কমূদী। তিনি আবুল আব্বাস শিয়ায়ীর সঙ্গে মুনাযারা করেছেন এবং তাকে পরাহত করেছেন।[১৫৩]

আরেকজন হলেন, ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ আয যবী। তিনি ছিলেন একজন সৎপ্রকৃতির লোক। জ্ঞানশাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র ও ফকীহ। বনু উবায়দ তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আল বাত্তান রহ.ও মুনাযারায় সবিশেষ দক্ষ ছিলেন। তবে সবচে বেশি পারঙ্গম ছিলেন, আবু উসমান সাঈদ বিন মুহাম্মদ আল হাদ্দাদ। ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব এবং সুন্নাহর বিপক্ষে উত্থাপিত সমালোচনার জবাব প্রদানে তিনি বিরাট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

## ইমাম আবু উসমান সাঈদ বিন হাদ্দাদ রহ.-এর ঐতিহাসিক বিতর্ক

একবার উবায়দুল্লাহ মাহদী তাকে ডেকে পাঠাল। তার সামনে গাদীরে খুম নামে খ্যাত হাদিস উল্লেখ করল। من كنت مولاه فعلي مولاه আমি যার অভিভাবক আলী রা.-ও তার অভিভাবক।

এটি সহিহ হাদিস। এটি বর্ণনা করে উবায়দুল্লাহ (আল্লাহ তার ওপর অভিশাপ দিন) গদগদ চিত্তে আবু উসমানকে বলল, মানুষের কী হলো, তারা আমাদের দাস হয় না? আমাদের নির্দেশনা শোনে না!

আবু উসমান তাকে বললেন, আল্লাহ তাআলা মহান সুলতানকে সম্মানিত করুন। হাদিসে গোলামের অভিভাবকত্ব উদ্দেশ্য নেওয়া হয়নি; বরং দীনি বিষয়ের অভিভাবকত্ব উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا

---

১৫৩ প্রাগুক্ত : ২ : ৮০।

عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ . وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

কোনো মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে বলবে যে, তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও'-এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, তোমরা আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরা ও পড়তে। তাছাড়া তোমাদেরকে একথা বলাও সম্ভব নয় যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে নিজেদের পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। তোমাদের মুসলমান হবার পর তারা কি তোমাদেরকে কুফরী শেখাবে?[১৫৪]

আল্লাহ তাআলা কোনো নবীর জন্য যে মর্যাদা রাখেননি তা নবী নয় এমন ব্যক্তির জন্যও রাখেননি। আলী রা. কোনো নবী নন। তিনি ছিলেন নবী কারীম সা. এর উযির বা সহযোগী। তখন উবায়দুল্লাহ তাকে বলল, যাও, তোমার সঙ্গে কথা বলে কেউ পেরে উঠবে না।

বর্ণিত আছে, একবার আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ী তাকে বলল, কুরআন এ কথা সাক্ষ্য দেয় যে, মুহাম্মদ সা. সর্বশেষ নবী নন। সে তার দাবির পক্ষে দলিলস্বরূপ সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করল,

وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ.

বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং শেষ নবী।[১৫৫]

শেষে বলল, আয়াত থেকে বোঝা গেল, সর্বশেষ নবী আল্লাহ্র রাসূল নন।

তখন হযরত সাদ তাকে বললেন, আয়াতে বর্ণিত ওয়াওটি সূচনা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং এটি সংযুক্ত অব্যয়। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

---

[১৫৪] সূরা আলে-ইমরান : ৭৯-৮০।
[১৫৫] সূরা আহযাব : ৪০।

তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।[১৫৬]

সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ কি এ সকল গুণে গুণান্বিত হতে পারবে?

একদিন তিনি আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ীর সম্মুখে কথা বললেন, তখন কাত্তামা গোত্রের এক লোক তার কথা শুনে রাগান্বিত হলো। সে আবু মুসা শায়খুল মাশায়েখ নামে পরিচিত। সে তার দিকে বর্শা হাতে তেড়ে আসলো। তখন আবু আবদুল্লাহ তাকে নিবৃত্ত করল। সে আবু উসমানের প্রতি সদয়তা দেখিয়ে বলল, হে শায়খ! আপনি রাগ করবেন না। আপনি কি জানেন, এই ব্যক্তি রেগে গেলে তার সঙ্গে আর কতজন লোক রেগে উঠবে? বারো হাজার তরবারি তার পক্ষে উন্মুক্ত হবে।

তখন আবু উসমান বললেন, তবে আমি কেবল সে কারণেই রাগ করি, যে কারণে মহাক্ষমতাধর একক সত্তা আল্লাহ রাগ করেন। তিনি তো আদ, সামূদ, আসহাবুর রস ও এর মধ্যবর্তী অসংখ্য সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন।[১৫৭]

আল্লাহ তাআলা শায়খ হাদ্দাদকে অমিততেজী কণ্ঠ, কথার যাদুময়তা, স্পষ্টভাষা ও সঠিক তত্ত্ব ও মর্ম দান করেছিলেন। তিনি ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত আলেম ছিলেন। তিনি কোনো শব্দ ভুল উচ্চারণ করলে আসতাগফিরুল্লাহ পড়তেন। তিনি যখন কবিতা আবৃত্তি করতেন তখন তা খুবই চিত্তাকর্ষক হত।

একদিন তিনি আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ীর সঙ্গে বিতর্ক করতে বের হলেন। তখন তার সঙ্গে তার স্ত্রী ও সন্তানাদিও বের হলো। তারা কান্না করছিল। তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমরা কান্না করো না। আমি যার জন্য বের হয়েছি তিনি আমার জন্যে যথেষ্ঠ। আর যার দীন রক্ষা করতে আমি ছুটে চলেছি তিনি আমাকে সাহায্য করবেন।

তিনি ইবরাহীম বিন আহমাদের ঘরে আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ীর কাছে প্রবেশ করলেন। তখন তার চার পাশে সঙ্গী সাথি ও তাদের গণ্যমান্য পণ্ডিত লোকদের এক বিরাট জামাত বসা ছিল। তিনি তাদেরকে সালাম দিয়ে বসলেন। আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ী ইবরাহীম ইবনে ইউনুসকে বললেন, (বলা হয়, তিনি ওই শহরের বিচারপতি ছিলেন) আপনি কিসের ভিত্তিতে ফায়সালা করেন?

---

[১৫৬] সূরা হাদীদ : ৩।
[১৫৭] দেখুন, রিয়াযুন নুফূস : ২ : ৬০।

ইবরাহীম বললেন, কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে।

আবু আবদুল্লাহ বললেন, সুন্নাহ কী?

ইবরাহীম বললেন, সুন্নাহ তো সুন্নাহ-ই!

আবু উসমান বললেন, আমি যখন তাকে সুন্নাহর মর্ম বোঝাতে গিয়ে সুন্নাহই বলতে শুনলাম; তখন আবু আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলাম, মজলিসে কি অন্যদের কথা বলার সুযোগ আছে?

সে বলল, হ্যাঁ। সবার জন্য উন্মুক্ত।

আবু উসমান বললেন, আরবদের মতে সুন্নাহর প্রকৃত মর্ম হলো, এমন উপমা- যার পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয়। কবি বলেন,

تريك سنة وجه غير مقرفة ✪ ملساء ليس بها خال و لا ندب.

অর্থাৎ, কোনো জিনিসের আকৃতি ও তার অনুরূপ।

সুন্নাহ তিনটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। ক. আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা করা। খ. যা করতে নিষেধ করেছেন তা পরিহার করা। গ. তিনি যা করেছেন তা সর্বান্তকরণে অনুসরণ করা।

শিয়ায়ী বলল, যদি নবী সা. থেকে বর্ণিত বিষয়টিতে কোনো মতবিরোধ পাওয়া যায় এবং সুন্নাহটি যদি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়, তখন ব্যাপার কী দাঁড়াবে?

আমি তাকে বললাম, আমি দুটি সুন্নাহর মাঝে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ পন্থায় ও বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত সুন্নাহই গ্রহণ করব। উভয় হাদিসের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ কোনটি তার দলিল তালাশ করব। ব্যাপারটি তখন একদল ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্যের ন্যায় হবে, যারা কোনো সাক্ষ্যে পরস্পরে মতবিরোধ করেছে। সুতরাং তখন উভয় সাক্ষীর মাঝে অপেক্ষাকৃত উত্তম সাক্ষীর জন্য দলিল অন্বেষণ করা আবশ্যক হয়ে যায়।

শিয়ায়ী বলল, যদি তারা সকলে আস্থা ও নির্ভরতায় সমান সমান হয়?

আমি বললাম, তখন তাদের একজন অবশ্যই নাসেখ হবেন আর অপরজন মানসূখ হবেন।

সে বলল, তাহলে তোমরা কেন কিয়াসের সাহায্য নাও?

আমি বললাম, আমরা আল্লাহর কিতাবের নির্দেশনার আলোকেই কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করি।

সে বলল, তোমরা এরূপ কথা কোথায় পেয়েছো?

আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ.

মুমিনগণ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা সমান হবে ওই জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে।[১৫৮]

আয়াতে উল্লেখিত صَيْد বা শিকারের ব্যাপারটি সুনির্দিষ্ট। কিন্তু সুনির্দিষ্ট শিকারের বিপরীতে আমাদেরকে যে প্রতিদান দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা স্পষ্টাকারে উল্লেখিত নয়। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে, যে প্রতিদানের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কিয়াস ও ইজতিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এর আরেকটি দলিল,

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ.

দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে।[১৫৯]

আল্লাহ তাআলা বিষয়টিকে একজন বিচারকের হাতে ন্যাস্ত না করে দুইজন ন্যায়পর মানুষের হাতে ন্যাস্ত করেছেন। যাতে তারা উভয়ে কিয়াস ও ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

---

[১৫৮] সূরা মায়িদা : ৯৫।
[১৫৯] সূরা মায়িদা : ৯৫।

আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ী বলল, ন্যায়পর বা عَدْل কে?

সে عَدْل শব্দ দ্বারা এমন লোকদের কথা ইঙ্গিত করল- যারা শরয়ী নসের দ্বারা সুনির্দিষ্ট।

তিনি বলেন, আমি বললাম, মুরাজাআর আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ.

তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে।[১৬০]

কিয়াস প্রমাণিত করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা এক আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ.

আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রাসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মতো।[১৬১]

আয়াতে উল্লেখিত ذوا عدل এর ব্যাপারটি নস দ্বারা সুনির্ধারিত নয়।

এরপর আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ী হযরত মূসা আল কাত্তানের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা আল্লাহর কিতাবে মদপানের শাস্তি কীভাবে পেলে?

মূসা রহ. বললেন, নবী কারীম সা. বলেছেন,

من شربها فاضربوه بالأردية ، ثم إن عاد فاضربوه بالأيدي، ثم إن عاد فاضربوه بالجريد.

যে ব্যক্তি মদ পান করবে তাকে চাদর দিয়ে প্রহার করবে। যদি এরপর আবার পান করে তবে হাত দ্বারা মারবে। যদি আবার পান করে তবে তাকে চাবুক দিয়ে প্রহার করবে।

---

[১৬০] সূরা তালাক : ২।
[১৬১] সূরা নিসা : ৮৩।

তখন আবু আবদুল্লাহ তার দিকে তীর্যক দৃষ্টি হেনে বলল, এ কি বললে!

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা আল্লাহর কিতাবে মদপানের শাস্তি কোথায় পেলে? আর তুমি বলছ, তাকে চাদর দ্বারা প্রহার করো, বা হাত দিয়ে বা চাবুক দিয়ে প্রহার করো!

আবু উসমান বললেন, তখন আমি তাকে বললাম, মদ পানকারীকে মিথ্যা অপবাদ দাতার সঙ্গে কিয়াস করে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কেননা সে যখন মদ পান করে তখন নেশাগ্রস্ত হয়। যখন নেশাগ্রস্ত হয় তখন বেদিশা হয়ে যায়। আর যখন বেদিশা হয় তখনই প্রলাপ বকে/কারো নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়। সুতরাং মদ পানকারীর ওপর ওই শাস্তিই প্রযোজ্য হবে– যা মিথ্যা অপবাদ দাতার ওপর প্রযোজ্য হয়।[১৬২]

সে তখন মূসা আল কাত্তানকে লক্ষ্য করে বলল, নবী কারীম সা. কী একথা বলেননি যে, أقضاكم علي তোমাদের মাঝে উত্তম বিচারক হলেন আলী!

তখন মূসা আল কাত্তান পুরো হাদিসের ভাষ্য উদ্ধৃত করে বললেন,

و أعلمكم بحلال الله و حرامه معاذ، و أرفاكم أبو بكر، و أشدكم في دين الله عمر.

আল্লাহর হালাল-হারাম বিধান সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে সবচে বেশি অবগত মুআয। তোমাদের মাঝে সবচে সহৃদয়বান আবু বকর। আর আল্লাহর দীনের বিষয়ে তোমাদের মাঝে সবচে বেশি কঠোর হচ্ছে উমর। (রাযিআল্লাহু আনহুম আজমাইন)

শিয়ায়ী তাকে বলল, তিনি কীভাবে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে আল্লাহর দীনের বিষয়ে অধিক কঠোর হলেন, অথচ হুনাইন যুদ্ধের দিন তিনি পতাকা নিয়ে পালিয়েছেন?!

মূসা রহ. বললেন, আমরা এরূপ কথা কখনো শুনিনি এবং জানিও না।

আবু উসমান বললেন, আমি তাকে বললাম, তিনি একটি দলের সাথে মিশে গিয়েছিলেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

[১৬২] প্রাগুক্ত : ২ : ৭৯।

إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ.

অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত।[১৬৩]

আয়াতের ভাষ্য থেকে বোঝা যায় যে, কোনো দলের সাথে মিশে যাওয়ার মানে পালিয়ে যাওয়া নয়।

তখন শিয়ায়ী তার দলের কোনো একজনের দিকে ঝুঁকে বলল, শুনলে তো শায়খ কী বললেন? তিনি বলেছেন, তিনি আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক একটি দলের সঙ্গে মিশে গেছেন।

তখন সঙ্গী লোকটি হাতের ইঙ্গিতে বলল, আল্লাহর রাসূলের চেয়ে বড় দল কে আছে? তিনি তো যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন অথচ উমর রা. তার দিকে যাননি? সে একটু গলা নামিয়ে শেষের কথাগুলো বলল। যাতে কেবল তার আশে পাশের লোকেরাই শুনতে পায়।

তখন আমি বললাম, নবী কারীম সা. থেকে বর্ণিত আছে,

عمر فئة، فمن تحيز إلى عمر فقد تحيز إلى فئة.

উমর হলো একটি দল। সুতরাং যে উমরের সাথে মিশলো সে যেন একটি দলের সঙ্গে মিশলো।

এ বর্ণনা শুনে আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ী চুপ করে গেল।[১৬৪]

একবার আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ী হযরত আবু উসমান হাদ্দাদকে প্রশ্ন করলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ.

আর মুহাম্মদ তো কেবল একজন রাসূল। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল বিগত হয়েছেন। তাহলে তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা কি পশ্চাদপসরণ করবে?[১৬৫]

---

[১৬৩] সূরা আনফাল : ১৬।
[১৬৪] প্রাগুক্ত : ২ : ৮২।
[১৬৫] সূরা আলে ইমরান : ১৪৪।

শুনেছে সে কি মুহাম্মদ সা.-এর সাহাবীদের পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার কথা ভাববে না?

তখন আবু উসমান তাকে বললেন, না। কেননা, অর্থ হলো, যদি তিনি ইন্তিকাল করেন কিংবা নিহত হন তবে কি তোমরা তোমাদের পশ্চাদদিকে ফিরে যাবে? أَفَإِن مَّاتَ অংশটুকু প্রশ্নবাচক। انقَلَبْتُمْ এর অর্থ أفتقلبون। আর দুটি প্রশ্নবাচক শব্দ যখন একত্রে আসে তখন একটি প্রশ্নবাচক অংশই মুখ্য হয়। শেষের অংশটুকু একথা বোঝানোর জন্য এসেছে, তোমরা তোমাদের পশ্চাদ্ভাগে ফিরে যেও না।

সে বললো, আপনি আল্লাহর কালামে এর কোনো উপমা দেখাতে পারবেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.

সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে?[১৬৬]

অর্থাৎ যদি আপনি মৃত্যুবরণ করেন তবে তারা চিরস্থায়ী হবে না। যখন দুটি প্রশ্নবাচক শব্দ একত্রে ব্যবহৃত হয় তখন একটিই উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং আয়াতে দ্বিতীয় প্রশ্নবাচক শব্দ দ্বারা একথা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, তারা চিরস্থায়ী হবে না।[১৬৭]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা-আদর্শ প্রচার-প্রসারে এবং এর বিপক্ষে আরোপিত প্রশ্নের সদুত্তর দানে হযরত আবু উসমান সাআদ আল হাদ্দাদ এমনই অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। সুতরাং যখন তিনি ইন্তিকাল করেন তখন কবিগণ তার প্রশংসায় কাব্য রচনা করেন। হযরত সাহল বিন ইবরাহীম ওয়াররাক তার গুণকীর্তন করে বলেন,

وقالوا قضى نحبا وذاق منية ✪ فيالك من خطب يحل عرى الصبر.

*লোকেরা বললো, সে মৃত্যুবরণ করেছে এবং পরপারে গমণ করেছে। হায়! তার মৃত্যু এমন বেদনাদায়ক– যা ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে দেয়।*

---

[১৬৬] সূরা আম্বিয়া : ৩৪।
[১৬৭] প্রাগুক্ত : ২ : ৮৩।

كم مارق عادي سعيدا وسبه ✪ وضاق به ذرعا وبداه بالهجر.

কত ধুরন্ধর প্রকৃতির লোক এই সৌভাগ্যবান লোকটির সাথে শত্রুতা করেছে এবং তাকে গালি দিয়েছে, তাকে পেরেশানিতে ফেলেছে এবং তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে।

يو بقلب ذاب ما وغصة ✪ لو أن أبا عثمان في ظلم القبر.

সে ক্ষোভে ও গোস্বায় সরলমনে বারবার প্রার্থনা করেছে, ইশ! যদি আবু উসমান অন্ধকার কবরে চলে যেত!

وأن امر منكم منى وفاته ✪ وليس له عذر ففي واسع العذر.

তোমাদের মধ্যে অসংখ্য লোক তার মৃত্যু কামনা করেছে। অথচ তার কোনো দোষ ছিল না। সে ছিল দোষ-অপরাধের ঊর্ধ্বে।

فليت الذي أمسى شجي في حلوقهم ✪ يمد له حبل الحياة إلى الحشر.

আফসোস তার জন্য! যে গতকাল মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছ। ইশ! তার জীবনের সময় যদি হাশরের দিন পর্যন্ত প্রলম্বিত হতো!

أليس لسان المسلمين وسيفهم ✪ إذا كادهم أهل الضلال والكفر.

তিনি কি মুসলমানদের মুখপাত্র ও তরবারি ছিলেন না? যখন ভ্রান্তি ও কুফরী তাদেরকে ধ্বংসের উপক্রম করেছিল?

أليس هلال الأرض بل شمس دجنها ✪ وبدر دجاها حين أمسيت بلا بدر.

তিনি কি পৃথিবীর চন্দ্র ছিলেন না? উদ্ভাসিত সূর্য ছিলেন না? বরং তিনি কি ওই পূর্ণিমার আলোকোজ্জ্বল চাঁদ ছিলেন না— যা অন্ধকার রাতকে আলোকিত করে তোলে?

يجيب وما غاصت دقائق فكره ✪ جوابا عتيدا في أدق من السحر.

তিনি বাতিলের প্রশ্নের এমন শক্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দিতেন— যা ছিলো জাদুর চেয়েও অধিক সম্মোহনীয়।[১৬]

---

[১৬] প্রাগুক্ত : ২ : ১১৫।

মুসলমানদের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস সুসংরক্ষণে এই ছিলো আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শী আলেমগণের মুনাযারা ও বিতর্কের কিঞ্চিৎ উপাখ্যান। তারা এ ময়দানে যে সাহসী ও সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছেন এবং দীনের মর্যাদা রক্ষায় যে আত্মত্যাগী মনোভাব প্রদর্শন করেছেন সে জন্যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং তাদের সকলকে রহমতের চাদরে আচ্ছাদিত করে নিন।

জ. আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শী কবি-সাহিত্যিকগণ ইসলামের পক্ষে এবং ইসলাম বিদ্বেষীদের আপত্তি ও অবান্তর যুক্তি-প্রমাণ খণ্ডনে কাব্য রচনায় সবিশেষ অবদান রেখেছেন। তারা বনী উবায়দের বিরুদ্ধে এমনই ক্ষুরধার কাব্য রচনা করেছেন- যা সুতীক্ষ্ম ধারালো তরবারির চেয়েও মারাত্মক গণ্য হয়েছে।

এক্ষেত্রে মহামান্য কবি আবুল কাসেম ফাযারির নাম সর্বাগ্রে থাকবে। তার রচিত কাব্য সারাবিশ্বের দিক-দিগন্তে প্রচার-প্রসার পেয়েছে এবং মানুষের ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছে। তিনি লিখেছেন,

عجبت لفتنة أعمت وعمت ✪ يقوم بها دعي أو كفور.

*আমি এমন ফিতনার জন্য আশ্চার্যান্বিত– যা ব্যাপকতর হয়েছে এবং সয়লাব হয়ে গেছে। বুদ্ধিজীবি বা অবিশ্বাসী কাফেররা যা ছড়িয়েছে।*

تزلزلت المدائن والبوادي ✪ لها وتلونت منها الدهور.

*মাদায়েন ও উপকূলসমূহ এর দ্বারা প্লাবিত হয়েছে। যুগ ও কালও এর রঙে রঙিন হয়ে গেছে।*

وضاقت كل أرض ذات عرض ✪ ولم تغن المعاقل والقصور.

*সকল প্রশস্ত আঙিনা সংকীর্ণ হয়ে গেছে। প্রাসাদ উদ্যানও বসবাসের উপযুক্ত থাকেনি।*

فنجي القيروان وساكنيها ✪ إله دافع عنها قدير.

*তখন মহান আল্লাহ কায়রাওয়ান ও তার অধিবাসীদেরকে মুক্তি দিয়েছেন এবং এ মহা সয়লাব প্রতিহত করেছেন।*

أهاط بأملها علما وبرا ✪ وميزا ما أكنته الصدور.

*তিনি এর অধিবাসীদেরকে এমন ইলম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন,* →

তাদেরকে এমন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন, যা কেবল বক্ষই ধারণ করে।

وجللهم بعافية وأمن ✪ وأسبل فوقها ستر ستير.

তিনি তাদেরকে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করেছেন। তাদের উপর রহমতের শামিয়ানা টানিয়ে দিয়েছেন।

وأثبت جلة العلماء فيها ✪ بحار لا تعد لا بحور.

জ্ঞানী আলেমদেরকে সেখানে ঠাঁই দিয়েছেন- তার ছিলেন জ্ঞানের অতলান্ত সমুদ্র।

ومنها سادة العلماء قدما ✪ إذا عدوا وليس لهم نظير.

তাদের মাঝে ছিল নেতৃস্থানীয় আলেম-উলামা- যদি শ্রেষ্ঠত্বের কথা ভাবা হয় তবে তাদের উপমা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

وفيها القوم عباد خيار ✪ فقد طاب الأوائل والأخير.

তারা তাদের সকল বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিয়েছে। সম্বলহীনদেরকে অর্থবিত্ত দিয়ে সহায়তা করেছে।

وهم افتكوا سبايا كل أرض ✪ وفادوا ما استبد به المغير.

তাদের জন্য তাদের সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গই যথেষ্ট হয়েছে। তাদের মাধ্যমেই সকল মন্দ ও অকল্যাণ দূরীভূত হয়েছে।

كفيناهم عظائمها جميعا ✪ فزالت عنهم تلك الشرور

وسكنّا قلوبا خافقات ✪ أمات عروقها ضر ضرير.

আমরা স্বতঃস্ফূর্ত মনে বসবাস করেছি। এখানকার ময়লা-আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে।

وآوينا وآسينا وكنا ✪ لهم أهلا وأكثرهم شطير.

আমরা এতে আশ্রয় নিয়েছি। পরস্পরে সহমর্মিতা দেখিয়েছি।

فبات طعامنا لهم طعاما ✪ هناك ودورنا للقوم دور.

সেখানে আমাদের খাদ্য ছিল তাদের খাদ্য। আমাদের পরিচ্ছদ ছিল সবার পরিচ্ছদ। আমরা মানুষের জন্য ছিলাম পরিবারের লোকের ন্যায়। আর তাদের

*অধিকাংশই ছিল মানিকজোড়।*

وكان لنا ثواب الله ذخرا ✪ وقام يشكونا منهم شكور.

*আমাদের জন্য আল্লাহর সওয়াব ছিল বরাদ্দ। অথচ কতিপয় মানুষ এরপরও অভিযোগ করে থাকে।*

ولولا القيروان وساكنوها ✪ لغاب طعامهم والمخ ريرـ

*যদি কায়রাওয়ান ও তার অধিবাসীরা না হতো তবে তাদের খাদ্য ভাণ্ডার ফুরিয়ে যেত। আর মগজ জ্ঞানশূন্য হয়ে যেতো।*[১৬৯]

তিনি কবিতার মধ্যখানে বলেছেন,

وليس لنا كما لهم حصون ✪ ولا جبل أعاليه وعور

ولا سور أحاط بنا ولكن ✪ لنا من حفظ رب العرش سور

ولا نأوي إلى بحر وانا ✪ إذا قضى القضا تنحى البحور

ولكنا إلى القرآن نأوي ✪ وفي أيماننا البيض الذكور

عقائق كالبوارق مرهفات ✪ بها تحمي الحرائم والثغور

وسمر في أعاليهن شهب ✪ بها ظمأء مواردها النحور.

তাদের মতো আমাদের তো দুর্গ নেই। আমাদের এমন কোনো পাহাড় নেই-যার উপরে রয়েছে নিরাপত্তা দুর্গ। আমাদেরকে সুরক্ষা দিতে পারে এমন কোনো দুর্গপ্রাচীর নেই। কিন্তু আরশের অধিপতির পক্ষ থেকে আমাদের জন্য এক (অদৃশ্য) নিরাপত্তা বেষ্টনী রয়েছে। বিপদের সময় আমরা সমুদ্রবক্ষে আশ্রয় নেই না। কিন্তু যখন আসমানের ফায়সালা হয়ে যায়, তখন আমাদের জন্য বিরাটাকায় সমুদ্র তৈরি হয়ে যায়। আমরা কুরআনের অভিমুখী হই। আমরা বীরদের শহীদী মৃত্যু কামনা করি। সমূহ বিপদাপদ আমাদের কাছে তুচ্ছ-নগণ্য। এই মনোভাবের দ্বারাই আমরা বড় বড় বিপদ ও দুর্যোগ মোকাবিলা করি। আমরা প্রত্যাশা করি এমন সুরম্য প্রাসাদ-কানন, যার উপরে থাকবে বিশাল তারকারাজি। সেখানে পিপাসার্ত হলে, নানা পদের ঝরনা-নহর থেকে পান করে আমরা পরিতৃপ্ত হব।

---

[১৬৯] প্রাগুক্ত : ২ : ৪৯৩।

কবিতার শেষাংশে লিখেছেন,

وانا بعد من خوف وأمن ✪ نحب إذا تشعشت الأمور

رسول الله والصديق حبا ✪ به ترجى السعادة والحبور

وبعدهما نحب القوم طرا ✪ وما اختلفوا فربهم غفور

ألا بأبي وخالصتي وأمي ✪ محمد البشير لنا النذير

سأهدي ما حييت له ثناء ✪ مع الركبان ينجد أويغور.

যখন সকল বিষয় এলোমেলো হয়ে যায়, তখন ভয় ও নিরাপত্তার পর আমরা রাসূলুল্লাহ সা. ও সিদ্দিকে আকবারকে এমন ভালোবাসি, যদ্দারা সৌভাগ্য ও সাফল্য লাভের আশা করা যায়। তাদের পর আমরা সমগ্র জাতিকে ভালোবাসি। তারা যদিও মতভেদ করে। কিন্তু তাদের রব তো চির ক্ষমাশীল প্রভু। শোনো! আমার পিতা-মাতা ও মুক্তিদাতা উৎসর্গিত হোক, মুহাম্মদ সা. হলেন আমাদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। মৃত্যুর আগে অচিরেই আমি তার জন্য এমন প্রশংসা বাণী রচনা করব- জীবন পথের পথিকরা যা শুনে প্রফুল্ল হবে কিংবা ঈর্ষা করবে![১৭০]

***

[১৭০] প্রাগুক্ত : ২ : ৪৯৪।

# তৃতীয় অধ্যায়

# সনহাজি সাম্রাজ্য

## ভূমিকা

উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের খলিফাগণ ক্রমান্বয়ে বারবারিয়া সনহাজিয়া সম্প্রদায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তারা কাত্তামিয়াদের পরিবর্তে এদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও পদ-পদবী তাদের হাতে ন্যাস্ত করে। বনু জিরি সনহাজির যুগে জায়নবাদীরা উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে। তারা আবু ইয়াযীদ খারেযির ঔদ্ধত্যপনা থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এর পুরস্কারস্বরূপ উবায়দিয়ারা সনহাজিদেরকে আফ্রিকা ও মরক্কোর শাসন ক্ষমতা প্রদান করে। সনহাজি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনকারী হলো আবুল ফুতূহ ইউসুফ বিন জিরি বিন মুনাদ সনহাজি (৩৬২-৩৭৩ হিজরী)। নিজ শাসনামলে তিনি বিদ্রোহ দমন ও রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনে বেশি মনোনিবেশ করেছেন।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### আবুল ফুতূহ ইউসুফ বিন জিরি বিন মুনাদ বিন মানকূশ সনহাজি

(৩৬২-৩৭৩ হিজরী মোতাবিক ৯৭২-৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ)

ইউসুফ বিন বলকীন বিন জিরি অল্প সময়ের ভেতরেই পুরো আফ্রিকার শাসক বনে যায়। ইসলাম আগমনের পর বারবারিয়ানদের বংশ থেকে তিনিই সর্বপ্রথম মরক্কোর শাসক হন। তিনি উবায়দিয়াদের সেবা-মনোতুষ্টি অর্জনে এবং তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে নিজের জান-প্রাণ উজাড় করে দিয়েছিলেন। এতে করে সনহাজি সম্প্রদায় ও যানাতা সম্প্রদায়ের ভেতরে দ্বন্দ্ব প্রবলতর হয়। যানাতা সম্প্রদায়ের শক্তি-ক্ষমতা সমূলে বিনাশ করার জন্য সনহাজি শাসক নিজের পূর্ণ জেদ ও ক্ষমতা ব্যবহার করেন। এই দ্বন্দ্বের সুযোগে উমাইয়্যাহ সাম্রাজ্য স্পেনে নিজেদের পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। তারা উবায়দিয়াদের সমর্থক ও অনুসারী সনহাজিদের আনুকূল্য ও সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। সনহাজিদের রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ছিলো যানাতাদের বিরুদ্ধে শক্তি-ক্ষমতা ব্যবহারের ওপর। এ কারণে তারা কখনো তাদের প্রীতি-ভালোবাসা ও আন্তরিকতা লাভে সমর্থ হয়নি। উমাইয়্যা সাম্রাজ্য এই দ্বন্দ্বকেই সুবর্ণ সুযোগ বানিয়ে নেয়।

যদ্দরুণ পশ্চিম মরক্কো বনী জিরির শাসনাধীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[১৭১]

আমীর বলকীন পূর্ণ উদ্যমে ও নবশক্তি নিয়ে এগিয়ে যান। তিনি উবায়দিয়াদের আনুগত্যে এবং বাতেনী ইসমাঈলী মতাদর্শ প্রচার-প্রসারে খুবই আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু তিনি বা তার পরবর্তী শাসকগণ জনসাধারণকে শিয়া মতাদর্শ গ্রহণে বাধ্য করেননি। এর দ্বারা আহলুস সুন্নাহর আলেমগণের সামনে সুন্নাহর প্রচার-প্রসারের বিরাট সুযোগ এসে যায়। মসজিদে মসজিদে, বাড়ির উঠানে-প্রাঙ্গণে একটু একটু করে দীনি ইলম চর্চার পরিবেশ তৈরি হতে শুরু করে। কিন্তু বাহ্যিকভাবে আচার-আচরণে নিজেদেরকে মিসর প্রশাসকের অনুসারী দেখানো এবং মসজিদের মিম্বার থেকে তাদের আনুগত্যপূর্বক স্বীকারোক্তি দিয়ে খুতবা পাঠের বিষয়টি উলামায়ে কেরামের জন্য যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে তাদের মাঝে এবং বনী জিরির শাসকদের মাঝে মনোদ্বন্দ্ব তৈরি হয়। ফলত তারা ওইসব শাসকদের সাথে যুদ্ধ ও বিতণ্ডায় অবতীর্ণ হয়- যারা ইসমাঈলিয়া মতাদর্শ প্রচার-প্রসারে অধিক উদগ্রীব ছিলেন।

উত্তর আফ্রিকার জনসাধারণও উলামায়ে কেরামের চার পাশে ভীড় জমায়। তারা রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু এ সকল শাসকরা নিজেদের ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখার ভয়ে আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শী আলেমগণের পক্ষাবলম্বনের ঘোষণা দিতে পারেননি। কায়রাওয়ানবাসীও ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পারে। তখন আলেম-উলামাগণ সুন্নাহর প্রচার-প্রসার ও পূর্বসূরী আলেমগণের নীতি ও আদর্শের কথা নব উদ্যমে প্রচার করতে থাকেন। কায়রাওয়ানে ছাত্র ও শিক্ষার্থীদের দিয়ে আলেমদের দরসগুলো নতুন করে ভরে উঠতে থাকে। দীন-ইসলামের বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান সংবলিত রচনা ও গবেষণা পুস্তক প্রকাশ হতে থাকে। উবায়দিয়াদের আনুগত্যের শৃঙ্খল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ এবং উত্তর আফ্রিকায় রাফেযীদের কবল থেকে আহলুস সুন্নাহর বিজয় অর্জিত হয়েছিল মহামান্য সুন্নী আমীর মুঈয বিন বাদিশের যুগে।

***

---

[১৭১] মাওসূআতুল মাগরিবিল আরাবি : ২ : ২৪-৩০।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## মুঈয বিন বাদিশ সনহাজি (৪০৬-৪৪৯ হিজরী)

ইমাম যাহাবি রহ. তার সম্পর্কে বলেন, আফ্রিকার অধিপতি মুঈয বিন বাদিশ মানসূর বিন বলকীন বিন জিরি বিন মুনাদ আল হাসিরী আস সনহাজি আল মাগরিবি। তিনি ছিলেন মরক্কোর শাসকের পুত্র ও রাষ্ট্রের গৌরব।[১৭২]

তারা পিতার মৃত্যুর তিন দিন পর ৪০৬ হিজরীর জিলহজ্জ মাসের তৃতীয় শনিবারে শাসক হিসেবে তার অভিষেক হয়।[১৭৩]

কতিপয় মালেকি ফকিহ সনহাজি সাম্রাজ্যের প্রশাসনে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিলেন। তারা উযির ও আমিরদের জীবনে প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলার পর এই পৃথিবীতে তারাই আহলুস সুন্নাহর আলেমদের উপর রাষ্ট্রযন্ত্রের নিপীড়ন প্রশমিত করতে ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, শায়খ আল্লামা আবুল হাসান আয-যাজ্জাল। তিনি আমির মুঈয বিন বাদিশকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতাদর্শের আলোকে জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাকে আহলুস সুন্নাহর রীতি ও আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন। তার এই তারবিয়াতের ফল প্রকাশ পেয়েছে তখন, যখন মুঈয পুরো আফ্রিকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে সক্ষম হন। আল্লামা আবুল হাসান খুবই সন্তর্পণে কার্যক্রম চালাতেন। যাতে শিয়া মতাদর্শী কেউই তার মিশন সম্পর্কে অবগত হতে না পারে। কেননা রাষ্ট্র তো তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এই মহান আলেম ছিলেন অসাধারণ চরিত্র মাধুরিমার অধিকারী এবং দীন-ধর্ম সম্পর্কে বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক। তিনি শিয়া ইসমাঈলী মতাদর্শকে খুবই ঘৃণা করতেন।

তিনি আমীর মুঈয বিন বাদিশের মন-মগজে ও চিন্তা-চেতনায় দীনের বিশুদ্ধ জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর ফলেই তার হাত ধরে উত্তর আফ্রিকায় শিয়া ইসমাঈলী মতাদর্শের মূলোৎপাটন সম্ভবপর হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা এটাই শিখতে পারি যে, রাষ্ট্রের কর্ণধার ও

---

[১৭২] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৮ : ১৪০।
[১৭৩] তারিখুল ফাতহিল আরাবি ফী লিবিয়া : ২৮৬।

তাদের সন্তানদের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে। মহান রবের নীতি ও আদর্শ থেকে দূরে আছে এমন অজ্ঞ মূর্খদের এবং পাশ্চাত্য দর্শনে মোহগ্রস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারেও সবিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশনাই যেন দাঈদের কর্মের মূল প্রেরণা হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا.

সে যেন নম্রতা সহকারে যায় ও কিছুতেই যেন তোমাদের খবর কাউকে না জানায়। তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না।[১৭৪]

ঐতিহাসিকগণ আমীর মুঈয বিন বাদিশের অনন্য গুণ-গরীমার প্রশংসা করেছেন। আল্লামা যাহাবি রহ. বলেছেন,

তিনি ছিলেন একজন প্রভাবশালী শাসক। সদা প্রফুল্ল ও সাহসী। উচ্চ মনোবলের অধিকারী। তিনি জ্ঞানচর্চা করতে ভালোবাসতেন। উদারহস্তে খরচ করতেন। কবি-সাহিত্যিকগণ তার প্রশংসা করেছেন। আফ্রিকাঞ্চলে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব প্রাধান্য পেয়েছিল। তখন তার দেশের লোকেরা বিরোধিতা নিরসনের জন্য মালেকি মাযহাবকে অগ্রাধিকার দেয়। তিনি ইসলামের দিকে ফিরে এসেছিলেন। তখন তিনি উবায়দিয়াদের আনুগত্য ও বশ্যতা পরিহার করেন। তিনি আব্বাসী খলিফা আল কায়িম বি আমরিল্লাহর নামে খুতবা চালু করেন। তখন তাকে ভয় ও হুমকি-ধমকি দেখানোর জন্য মুস্তানসিরকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি তাকে পাত্তা দেননি।[১৭৫]

মুঈয বিন বাদিশ মুস্তানসিরের হুমকি ও ভীতিপ্রদর্শনের পরোয়া করেননি দেখে সে তাকে বললো, তুমি আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারে কেন তোমার পিতৃপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে না? এর সাথে আরো নানান কথাবার্তা বললো।

---

[১৭৪] সূরা কাহাফ : ১৯-২০।
[১৭৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৮ : ১৪০।

মুঈয তার উত্তরে বললেন, তোমার পূর্বসূরীরা মরক্কোর শাসনভার গ্রহণ করার আগে আমার পিতৃপুরুষরা এখানকার মালিক ও অধিপতি ছিলো। তোমাদের অগ্রগতিতে আমার পিতৃপুরুষদের অনেক অবদান রয়েছে। তোমরা যদি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা না দিতে তবে তারা তরবারি নিয়ে তোমাদের ধাওয়া করতো।[১৭৬]

ইতিহাসের গ্রন্থাবলি থেকে জানা যায়, মুঈয ইসমাঈলিয়াদের এবং মিসর শাসকদের প্রকাশ্য বিরোধিতার সূচনা করেন। আর তা পরিস্ফুট হয় ৪৩৫ হিজরী সনে। যখন তিনি তার বাহিনী, তার শাসনব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যে আহলুস সুন্নাহর রীতিনীতি পালনের অনুমতি প্রদান করেন। তখন থেকেই বাতিল ফিরকা ও মতাদর্শের বিরুদ্ধে এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করে মজা লুটা লোকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে শুরু করেন। তিনি সাধারণ মানুষ ও সৈন্যবাহিনীকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, যারা হযরত আবু বকর রা. ও হযরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে গালিগালাজ করবে তাকে হত্যা করবে। তখন থেকেই উত্তর আফ্রিকার সকল নিষ্ঠাবান মুসলিম অপরাপর উবায়দিয়া মতাদর্শীদের নিপাত করতে শুরু করেন। যাতে তাদের ওপর চেপে বসা ভ্রান্ত ও বাতিল ধ্যান-ধারণার ধ্বজাধারীদের থেকে স্বদেশ মুক্ত করা যায়।

আলেম-উলামা ও ফকিহগণ এই মহা সংস্কারমূলক গুরুত্বপূর্ণ কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। যা মূলত মুঈয বিন বাদিশের তৎপরতায়ই শুরু হয়েছিল। কবি সাহিত্যিকগণ মুঈয এর প্রশংসা করে অসংখ্য পদ্য ও কাব্য রচনা করেছেন। তারা সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলোকে কলমবন্দ করেছেন। আবুল কাসেম বিন মারওয়ান সে সময়ের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন,

وسوف يقتلون بكل أرض ✪ كما قتلوا بأرض القيروان.

*অচিরেই তারা সকল দেশে যুদ্ধ করবে। যেমন তারা কায়রাওয়ানে যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে।*

অপর এক কবি বলেছেন,

يا معز الدين عش في رفعة ✪ وسرور واغتباط وجذل

أنت أرضيت النبي المصطفى ✪ وعتيقا في الملاعين السفل

وجعلت القتل فيهم سنة ✪ بأقاصي الأرض في كل الدول.

---

[১৭৬] তারিখুল ফাতহি ফী লিবিয়া, তাহের যাভি : ২৮৯।

*হে দীনের সম্মান বৃদ্ধিকারী আমীর মুঈয! আপনি খুশিতে-আনন্দে, তৃপ্তি ও প্রশান্ত মনে বসবাস করুন।*

*আপনি প্রিয়নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সা. কে সন্তুষ্ট করেছেন। পশ্চাদপদ জাতিগোষ্ঠির কাছে সম্মানিত হয়েছেন।*

*আপনি সকল দেশে সকল নগরে যুদ্ধকে তাদের কাছে প্রিয় বানিয়ে দিয়েছেন।*

এরপর থেকে মুঈয ক্রমান্বয়ে আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শী আলেম-ফকিহ ও সাধারণ মানুষদের সঙ্গ-সান্নিধ্য গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি মিসর ভূখণ্ড থেকে উবায়দিয়াদের আস্তানা বিচূর্ণ করার মিশন নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। নিজ অঞ্চলের জন্য মালেকি মাযহাবকে রাষ্ট্রীয় মাযহাবের মর্যাদায় বিভূষিত করেন। নিজ শাসনাধীন অঞ্চলকে আব্বাসীয় শাসনব্যবস্থার অধীন বলে ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রের পতাকা ও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতীকসমূহও আব্বাসীয়দের ন্যায় তৈরি করান। উবায়দিয়াদের পতাকা ও প্রতীকসমূহ জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দেন। উবায়দিয়াদের নামে খোদিত দিনার-দিরহামও অচল ঘোষণা করেন। মানুষজন ১৪৫ বছর যাবৎ সেগুলো দিয়ে লেনদেন করে আসছিলো। এর পরিবর্তে তিনি একটি সিকি মুদ্রা চালু করেন। যার এক পিঠে লেখা ছিল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আর অপর পিঠে খোদিত ছিল, সূরা আলে ইমরানের ৮৫ নং আয়াত।

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না। আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।[১৭৭]

মুঈয বিন বাদিশ আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শের বিপরীত অন্যান্য সকল মতাদর্শ যথা সফরিয়া, নাক্কারিয়া, মুতাযিলা ও ইবাযিয়্যাহ মতাদর্শকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

৪৪৩ হিজরী সনে বারাকা অঞ্চলের আমীর জাবারা বিন মুখতার মুঈযের আনুগত্যের ঘোষণা দিলে তা তার শাসনাধীনে চলে আসে।

তারাবলুসে যিনি সর্বপ্রথম ইসমাঈলিয়া মতাদর্শ বিনাশ করায় এবং তাদের অন্ধ অনুসারী ও মতাদর্শ প্রচার-প্রসারকদের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষ ও সংগ্রাম করেছেন

---

[১৭৭] সূরা আলে-ইমরান : ৮৫।

তিনি হলেন, আল্লামা আলী মুহাম্মদ আল মুন্তাসির। তার উপনাম আবুল হাসান। তিনি ৪৩২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন।[১৭৮]

আমীর মুঈযের এসব কার্যকলাপে বাতেনীদের মনে হিংসার অনল জ্বলতে শুরু করে। ভেতরে ভেতরে তারা রাগে ফুঁসতে থাকে। তারা উত্তর আফ্রিকায় আহলুস সুন্নাহর পক্ষে নেতৃত্ব দানকারী এবং যারা সেখানে আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে খুশি হয়েছে- তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে উবায়দি খলিফার নেতৃত্বে মিসরের কায়রোতে বাতেনী ইসমাঈলী রাফেযিদের একটি ঘরোয়া বৈঠক হয়। সেখানে তারা ষড়যন্ত্রমূলক যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নেয়, তা হলো, বনী সুলাইম ও বনী হিলালের দ্বারা সনহাজি জিরি সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হবে। যদি সনহাজি সাম্রাজ্য বিজয় লাভ করে তবে তো পূর্বে আনুগত্যশীল এ সম্প্রদায় থেকে উবায়দিয়াদের সকল সম্পর্ক চুকে যাবে। আর যদি বনি সুলাইম ও বনী হিলাল বিজয় লাভ করে তবে তো তারা তাদের চিরশত্রু মুঈয বিন বাদিশের উত্তম প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। এই চক্রান্ত সাজিয়েছিল উবায়দি উযির আবু মুহাম্মদ বিন আলী ইয়াযুরী। তিনি নীলনদের তীরে বসবাসরত সম্প্রদায়গুলোকে উস্কে দিয়েছেন। তাদেরকে বিপুল অর্থবিত্ত, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাদের জন্য বারাকা ও কায়রাওয়ানের ভূমি ব্যবহার বৈধ করে দিয়েছেন। তাদের হস্তগত ও দখলকৃত সকল ভূমিই তাদের মালিকানায় দিয়ে দিয়েছেন। উবায়দিয়াগণ এ সুযোগে আমীর মুঈযের যত শত্রুপক্ষ ছিল তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে এবং তাদের অঢেল ধনদৌলত ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সুসমৃদ্ধ করে দেয়।

এর ফলে আমীর মুঈয বিন বাদিশ ও রাফেযী উবায়দিয়াদের মিত্র অপরাপর আরব সম্প্রদায়গুলোর মাঝে দ্বন্দ্ব-বিবাদের সূচনা হয়।

***

---

[১৭৮] প্রাগুক্ত : ২৯০-২৯১।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## উত্তর আফ্রিকার দিকে বনী হিলাল, বনী সুলাইম ও অপরাপর আরব সম্প্রদায়ের অভিযান

### ভূমিকা

বনী হিলাল ও বনী সুলাইমের গোত্রসমূহ জাযিরাতুল আরবে বসবাস করত। তাদের ফসলি জমিজমাগুলো মদীনা, মক্কা, তায়েফ ও নজদে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। কারামেতাগণ তাদেরকে আব্বাসিয়া খেলাফত ও উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং প্ররোচিত করতে চেষ্টা করে। কারামেতাদের চিন্তাধারা ও মতাদর্শে এই গোত্রসমূহের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রভাবিত হয়ে যায়। কিন্তু তাদের এই মোহ খুব একটা গভীরতর ছিল না। তাদের মোহের অন্যতম কারণ ছিল, অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হওয়া এবং আব্বাসীয় খেলাফতের অধীনতা থেকে বের হয়ে যাওয়া। উবায়দিয়াদের সঙ্গে কারামেতাদের যুদ্ধে এই সম্প্রদায়গুলো সিরিয়ায় ব্যাপক খেল দেখিয়েছে। সিরিয়ায় তাদের শান-শওকত ও ক্ষমতা-দাপট ছিল তুঙ্গে।

মিসরের উবায়দিয়া আমীর বিপুল অর্থবিত্ত ও উপহার-উপঢৌকন দিয়ে তাদেরকে কাছে ভেড়াতে সক্ষম হয়। তারা উবায়দি খলিফার আহ্বানে সাড়া দেয়। উবায়দি খলিফা মূলত তার সাম্রাজ্যে আরব জাতিগোত্রসমূহকে ঠাঁই দানে আগ্রহী ছিলেন। উবায়দিয়া সাম্রাজ্য তাদেরকে নীলনদের উপকণ্ঠে অসংখ্য উর্বর ভূমি প্রদান করে। ফলে গোত্রসমূহও তাদের নেতৃত্বভার উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের হাতে অর্পণ করে। তারা দীনের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন না করার কারণে বাতেনী রাষ্ট্রসমূহের আকিদা-আদর্শকে নিজেদের আকিদা-আদর্শ হিসেবে গণ্য করে এবং উবায়দি খলিফাদের জন্য নিজেদের জান-প্রাণ উৎসর্গ করে দেয়। উবায়দিয়ারা অর্থবিত্ত ও প্রতিপত্তির অধিকারী এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও সমরকৌশলে পারঙ্গম এইসব গোত্রসমূহের দ্বারা মুঈয বিন বাদিশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এর অন্যতম কারণ, উবায়দিয়া বাহিনী সিরিয়া ও প্রাচ্য অঞ্চলসমূহে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। তাছাড়া এসব বাহিনী তো পশ্চিমাঞ্চলের বাহিনীরই অংশ; বরং এদের নেতৃত্ব দানকারী হলো খোদ মুঈয বিন বাদিশের বংশের লোক। অপরদিকে আযীয ও উবায়দি খলিফাদের যুগ থেকে এ সকল নেতৃবৃন্দ ও সৈন্যবাহিনী তো নিষ্ক্রিয়ই বসে ছিল।

মিসরে অবস্থানরত আরব্য গোত্রগুলো আযীয উবায়দির যুগে ইসলামের বিজয়

নেশায় জাযিরাতুল আরব ত্যাগ করে মিসরে আসার পর এখানে তাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এ গোত্রগুলো পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিবাদ, দেশময় অনাচার ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে সারাদেশে পরিচিতি পেয়েছিল। এ সময়টি ছিল সুনির্ধারিত শত্রুর বিরুদ্ধে তাদেরকে ব্যবহার করে একই সঙ্গে উভয় কৌশল বাস্তবায়নের সুর্বণ সুযোগ। একদিকে এদেরকে কোনো কাজে নিরত রাখার মাধ্যমে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অনাচার রুদ্ধ করা। অপরদিকে চরম শত্রুর প্রতিশোধ নিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করা।

মুস্তানসির এর দিকে একটি কথা সম্পৃক্ত করা হয়। তিনি বলেছেন, আমি মুঈযের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এমন এক বাহিনী প্রেরণ করবো যে, তাকে পরাস্ত করতে আমার কোনো বেগ পেতে হবে না। তখন তিনি আরব গোত্রপ্রধানদের ডেকে আনেন। তাদের জন্য নীলনদের অপরপ্রান্ত থেকে মরক্কো পর্যন্ত বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন। ইতোপূর্বে তাদের জন্য এ স্থানে বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ ছিল। তখন তাদের অসংখ্য মানুষ উক্ত স্থানে বসতি স্থাপন করে।[১৭৯]

আমীর মুস্তানসির উবায়দি আরব্য গোত্রগুলোর দায়িত্বশীলদের সঙ্গে বসলেন, তাদেরকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ও ভূসম্পত্তি সহায়তা প্রদান করলেন। নিজেদের দূরভিসন্ধি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি তাদের উট, ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র, আসবাবপত্র, যুদ্ধ সরঞ্জাম ও অর্থকড়ি প্রদান করলেন। আফ্রিকায় তাদের জন্য যথেচ্ছা বসবাসের অনুমতি দিলেন। তাদেরকে বললেন, আমরা তোমাদেরকে আফ্রিকার ও ইবনে বাদিশের রাজত্বের মালিকানা প্রদান করলাম। সুতরাং এখন তোমরা আর শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[১৮০]

৪৪২ হিজরী মোতাবিক ১০৫০ খ্রিস্টাব্দ সনে যখন আরব গোত্রসমূহের সম্মিলিত বাহিনী যাত্রা শুরু করে তখন উবায়দিদের ধূর্ত উযির মুঈয বিন বাদিশের কাছে একটি পত্র লিখেন। পত্রে লিখেছেন, পর সংবাদ, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে উট-ঘোড়ায় সুসজ্জিত বিরাট এক বাহিনী পাঠিয়েছি। এতে রণ-কৌশলে পারঙ্গম ও অভিজ্ঞ সৈন্য রয়েছে। এখন আল্লাহর যা ফায়সালা

---

[১৭৯] ফাতেমি সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, ড. আবদুল মুনঈম মাজিদ : ২২৩।
[১৮০] তারিখুল ফাতহিল আরাবি : ২৯৪।

করার তা-ই হবে।[১৮১]

এই বাহিনী কোনোরূপ উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ ছাড়াই বারাকার নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়। বারাকার শাসনকর্তা হাকেমের যুগে উবায়দিয়াদের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। মুস্তানসিরের যুগে সে মুঈযের আনুগত্য করার ঘোষণা দেয়। তারা উবায়দিয়াদের পক্ষে বক্তৃতা শ্লোগান দেওয়ার মঞ্চগুলো জ্বালিয়ে দেয়। তাদের পতাকাগুলো পুড়িয়ে ফেলে। আব্বাসী খলিফা আল কায়িমের দাওয়াত ও বাণী প্রচার-প্রসার করে।[১৮২]

আরব গোত্রগুলো বাহিনীসমেত তারাবলুসে এবং তিউনিসিয়ার উপকণ্ঠে পৌঁছে। উত্তর আফ্রিকাবাসীর ওপর আক্রমণকারী এই বিপুল বাহিনীর জনসংখ্যা ছিল চার হাজার। পরে তাদের সঙ্গে বিভিন্ন দল-উপদলও মিলিত হয়।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, বিভিন্ন সময় এই বাহিনীর জনসংখ্যা প্রায় এক মিলিয়নের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। এই বাহিনী যখন বারাকা অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করে তখন বনী হিলালের অন্যতম শাখা রায়াহ গোত্রের জনৈক শায়েখ- যার নাম ছিল মুনিস বিন ইয়াহইয়া বিন মারদাস- তিনি মুঈযের মেহমান হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। মুনিস সুলতান মুঈয বিন বাদিশের বিরাট শান-শওকত ও মর্যাদা দেখে খুবই আশ্চর্য হন। মুঈয তাকে যথাযোগ্য সম্মান করেন এবং উত্তম উপায়ে মেহমানদারি করেন। তিনি তাকে তার চাচার গোত্র রায়াহ থেকে সৈন্য খুঁজে দিতে অনুরোধ করেন। তখন মুনিস তাকে নিষেধ করে বললেন, তুমি কখনো তা করো না। কেননা তারা তোমার কথা শুনবে না। উপরন্তু তোমার মতের বিরোধিতা করবে। মুঈয মুনিসের কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি। মুনিস মুঈযকে বললেন, তারা এমন জাতি, যাদের ওপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই।

মুঈয বললেন, না, তারা বরং এর বিপরীত।

মুনিস এ কথাকে আরবজাতির জন্য অপমানজনক গণ্য করলেন। মুঈয মুনিসের ব্যাপারে ধারণা করলেন যে, তিনি তার গোত্রের অন্য কাউকে তার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতে চান না। ফলে এটা নিয়ে তাদের মাঝে বিরাট দ্বন্দ্ব তৈরি হল।

---

[১৮১] ফাতেমি সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন : ২৪৩।
[১৮২] প্রাগুক্ত : ২২৪।

মুনিস যখন নিজ গোত্রের কাছে ফিরে গেলেন তখন তিনি তার গোত্রকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। তাদেরকে আফ্রিকার ফল-ফসল, কল্যাণ এবং মুঈযের দাপট ও প্রতিপত্তির কথা বললেন। এর ফলে তাদের ভেতরে দ্রুত জায়গা ছেড়ে দেওয়ার তাড়া তৈরি হল। কিন্তু তারা আফ্রিকায় এত বিপুল পরিমাণে ঘাঁটি তৈরি করে নিয়েছিল যে, এর শুরুভাগও পাওয়া যায় না; শেষ ভাগও দৃষ্টিগোচর হয় না।[১৮৩]

মালিক মুঈয বিন বাদিশের বিরুদ্ধে যে সকল গোত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ গোত্র হলো, বনু সুলাইম বিন মানসূর। বনী হিলাল বিন আমের। এ দুটি গোত্র মুযার গোত্রের শাখা ছিল। আরও ছিল যাগবা, আসীহ, আদী, রায়াহ, তারা বনী হিলালের শাখা গোত্র ছিল, যা বনী আমের বিন সাসা ও বনী হাশিম বিন মুআবিয়া বিন বকর এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সকল গোত্রই ছিল মুযার আদনানের বংশীয়। আরও ছিল কাহতানী বংশের কাহলান গোত্র। এ ছাড়াও আরও নামী-বেনামী অসংখ্য গোত্র এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

বনু রায়াহ, আসীহ ও বনু আদী যখন আফ্রিকায় আগমন করল তখন তারা কায়রাওয়ানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করল। তখন মুনিস তাদেরকে বলল, এটা এমন কোনো সিদ্ধান্ত নয় যে, এর জন্য বিরাট চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। লোকেরা বলল, তবে আমরা কী করবো? তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে একটি চাদর নিয়ে আসো। লোকেরা চাদর এনে দিল। তিনি সেটা বিছিয়ে দিয়ে বললেন, কেউ না হেঁটে কি এই চাদরের মধ্যখানে যেতে পারবে? লোকেরা বলল, কেউই তো তা পারবে না।

তিনি বললেন, আমি পারবো। এই বলে তিনি চাদরটি গুটিয়ে নিলেন। চার কোণা ধরে একত্র করলেন। মধ্যখানে এক বিঘত পরিমাণ রেখে তার উপর দাঁড়ালেন। এরপর তিনি গোটানো চার কোণের এক প্রান্ত খুললেন এবং তার উপর গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমরা মরক্কোর/পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে এরূপই করো এবং পর্যায়ক্রমে এর একাংশ একাংশ করে দখল করতে থাকো। যাতে কায়রাওয়ানের কোনো অংশই বাকি না থাকে।

সুতরাং তোমরা কায়রাওয়ানে যাও। কেননা তোমরা তা দখল করতে পারবে। তখন আরবের শীর্ষস্থানীয় নেতা রাফে বিন হাম্মাদ তাকে বললেন, হে মুনিস! আপনি সত্য কথা বলেছেন। আল্লাহর শপথ! আপনি আরবের শায়খ ও আমীর।

---

[১৮৩] দেখুন, তারীখুল ফাতহিল আরাবি : ২৯৫।

আমরা আপনাকে আমাদের নিজেদের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেই। আমরা আপনাকে ছাড়া কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বা কোনো কিছু করতে সক্ষম নই।

তারা পুরো দেশকে লটারীর আওতায় ফেলল। তখন বনী সুলাইমের জন্য পূর্বাঞ্চল তথা বারাকা ও তার আশেপাশের অঞ্চল নির্ধারিত হল। আর বনী হিলালের জন্য পশ্চিমাঞ্চল তথা তারাবলুস ও কাবিস শহর নির্ধারিত হল। আর বনু জুশম বনী হিলালের সঙ্গে মিশে গেল।

আরবে বনী হিলাল ও বনী সুলাইম ছাড়াও আরও অনেক শাখা গোত্র ছিল। যেমন বনী গাতফানের ফাযারা ও আশজা। ইয়েমেনী বংশের লোকদের মধ্যে ছিল জুশম বিন মুআবিয়া বিন বকর বিন হাওয়াজিন। সালূল বিন মুররা বিন সাসা বিন মুআবিয়া ও মাকাল। তারা সবাই বনী হিলাল ও আছীহ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা তখন তাদের নেতৃত্ব ছিল বনী হিলাল ও আছীহের স্কন্ধে। ফলে তারা তাদের অধীনতা গ্রহণ করে নেয়।

বনী আছীজ বনী হিলালের চেয়ে জনসংখ্যায় বেশি ছিল। তাদের উপগোত্রও বেশি ছিল। সবার মধ্যে তারাই সর্বক্ষেত্রে অগ্রসর থাকতো। তাদের মধ্যে যাহ্হাক, ইয়ায, মিকদাম, লতীফ, দারীদ, কুরফা প্রমুখ গোত্র উল্লেখযোগ্য ছিল।

তারা শক্তিসামর্থেও এগিয়ে ছিল। আফ্রিকায় প্রবেশকারী বনী হিলালের সকলের চেয়ে বসতি নির্মাণে তাদের বেশি প্রভাব ছিল।[১৮৪]

আরব গোত্রসমূহের মধ্যে বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা হলেন, হাসান বিন সারহান। তার ভাই বদর, ফযল বিন নাহিয। তারা সকলে দারীদ বিন আছীজ এর বংশীয় লোক ছিলেন।

তাদের মধ্যে আরও আছেন, মাযী বিন মুকরিব ও সালামা বিন রিযক। তারা আছীজ গোত্রের কুরফা শাখার লোক ছিলেন। যিয়াব বিন গানিম বনী ছাওরের লোক ছিলেন। মূসা বিন ইয়াহইয়া মারদাস রায়াহ গোত্রের লোক ছিলেন। সালিম মারদাস গোত্রের নয়। সালিম মারদাস হলো সকর গোত্রের শাখা গোত্র। যা মারদাস রায়াহের শাখা গোত্র। আরও আছেন যিয়াদ বিন যায়দান। তিনি যাহ্হাক গোত্রের লোক ছিলেন। ফারিস বিন আবুল গিয়াস, তার ভাই আমের, ফযল বিন আবু আলী। তারা মারদাসের লোক ছিলেন। এদের প্রত্যেকের নামই তাদের বংশনামা নিয়ে রচিত কবিতায় উল্লেখিত আছে।[১৮৫]

***

---

[১৮৪] প্রাগুক্ত : ২৯৭।
[১৮৫] প্রাগুক্ত : ২৯৭।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## মুঈয বিন বাদিশ ও আরব গোত্রসমূহের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

৪৪২ হিজরী সনে আরব গোত্রসমূহের আফ্রিকায় প্রবেশের ঘটনা উল্লেখ করে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনুল আছীর রহ. লিখেছেন,

এরপর আরব গোত্রপ্রধানগণ মুঈয বিন বাদিশের কাছে আসে। তিনি তাদেরকে রাজকীয় ভোজ-আহার করান। তাদের জন্য অঢেল অর্থকড়ি খরচ করেন। তারা তার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করার পর তার ইহসান ও অনুগ্রহের উত্তম বিনিময় তো দেয়ই-নি; উল্টো তার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা চুরি-ডাকাতি শুরু করে। ক্ষেত-খামার নষ্ট করে। ফল-ফসল কেটে ফেলে। শহর ঘেরাও করে রাখে। তাদের এই অপতৎপরতা মানুষের জন্য বিরাট ক্ষতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাদের সার্বিক অবস্থায় মন্দা তৈরি হয়। তাদের সফরের রাস্তাসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পুরো আফ্রিকায় এমন দুর্যোগ দেখা দেয়– যা ইতোপূর্বে কখনো দেখা যায়নি।

তখন মুঈয বিন বাদিশ বিশাল জনসভা ডাকেন। সৈন্যবাহিনী একত্র করেন। তারা সংখ্যায় ছিল ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী ও সমপরিমাণ পদাতিক সৈনিক। এই বিশাল বাহিনী রওয়ানা করে কায়রাওয়ান থেকে তিনদিনের দূরত্বসম স্থানে গিয়ে অবস্থান নেয়।

আরববাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩ হাজার। মাওসূআতুল মাগারিবিল আরাবির লেখকের মতে, সংখ্যায় তারা মুঈযের বাহিনীর অনুরূপ সৈনিক ছিল। আরববাহিনী যখন সনহাজি ও দাস সম্প্রদায়ের লোকদেরকে মুঈয এর সঙ্গে দেখল তখন তারা ভয়ে ভীতবিহ্বল হয়ে গেল। প্রতিপক্ষ বাহিনীকে তাদের কাছে বিরাট শক্তিশালী মনে হল। তখন মুনিস বিন ইয়াহইয়া তাদেরকে বললেন, আজ পলায়নের দিন নয়।

লোকেরা বলল, আমরা তাদের কোথায় আঘাত করবো? তারা তো শিরস্ত্রাণ ও বর্ম পরিধান করে আছে। তিনি বললেন, তাদের চোখে আঘাত করবে। তখন সে দিনটি ইয়াউমুল আইন বা চোখে আঘাতের দিন নামে নামকরণ করা হয়।

উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ লাগল। লড়াই ক্রমে মারাত্মক ভয়াবহ আকার ধারণ করল। সনহাজি সম্প্রদায় যুদ্ধের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে মুঈযকে তার দাসদের সঙ্গে রেখে পলায়ন করতে শুরু করল। যাতে তারা অধিক

সংখ্যকরূপে নিহত হয়। তখন তারা সুযোগ বুঝে আরবদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতে পারবে।

ফলে সনহাজিরা পলায়ন করে। আর দাসরা মুঈযের সঙ্গে অবস্থান করে। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তাদের বিরাট সংখ্যক লোক নিহত হয়। সনহাজিরা আরবদের কাছে ফিরে যাওয়ার মনস্থির করে। কিন্তু তাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভবপর হয়নি। ফলে তারা পশ্চাদপদই থাকে। সনহাজিদের অনেক লোকও নিহত হয়। পরিশেষে প্রচুর লোকবল ও সৈন্য থাকার পরও মুঈয পরাজিত সৈনিকরূপে কায়রাওয়ানে প্রবেশ করে। আরবরা তাদের উট-ঘোড়া, তাঁবু ও অন্যান্য রসদসামগ্রী লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। (আল কামিল ফিত তারীখ : ৬ : ১৫৩)

ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে এই ঘটনাটিকে একটি ভয়াবহ যুদ্ধের ঘটনা আকারেই উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এতে উভয় পক্ষেরই বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চেয়েছে। আরব কবি আলী বিন রিযক রায়াহী একটি কবিতা রচনা করেছেন, যাতে তিনি মুঈয ও অপরাপর লোকদের সঙ্গে কী ঘটনা ঘটেছে -তা সুনিপুণ ভাষ্যে ব্যক্ত করেছেন,

إن ابن باديس لأحزم مالك ✪ ولكن لعمري ما لديه رجال

ثلاثة آلاف لنا غلبت له ✪ ثلاثين ألفا إن ذا لنكال.

নিশ্চয়ই বাদিশ পুত্র প্রতাপশালী শাসক। অথচ আমার জীবনের কসম! তার সঙ্গে কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিল না।

আমাদের তিন হাজার সৈন্য তার পক্ষে লড়াই করে বিজয়ী হয়েছে। তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে ত্রিশ হাজার যোদ্ধায় পরিণত হয়।[১৮৬]

৪৪২ হিজরী সনে ঈদুল আযহার দিন মুঈয সাতাশ হাজার অশ্বারোহী সৈনিক প্রস্তুত করেন। তিনি তাদের নিয়ে ভোর সকালে আরবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন তারা ঈদের নামায আদায়ে নিরত ছিল। আক্রমণ প্রতিহত করতে আরবরা ছুটে গিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে। তারা মুঈযের বাহিনীর উপর হামলে পড়ে। তাদেরকে দলে দলে হত্যা করে।

এরপর মুঈয আবার বাহিনী প্রস্তুত করে। এবার সে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে

---

[১৮৬] তারীখুল ফাতহিল আরাবি : ২৯৯।

সনহাজ ও যানাতার দিকে অগ্রসর হয়। আরবদেরকে তাদের ঘরের ভেতরেই আক্রমণ করে। প্রবল লড়াই হয়। অসংখ্য লোক নিহত হয়। এর মাধ্যমে সনহাজিদের শৌর্যবীর্য চূর্ণ হয়ে যায়। যানাতার লোকেরা পিছু হটে।

মুঈয নিজ দাসদের সঙ্গে দৃঢ় মনোবল নিয়ে যুদ্ধে নিরত থাকেন। এরপর প্রতিপক্ষের এক অশ্বারোহী বাহিনী তার সঙ্গে যুদ্ধ করে। তিনি সে যুদ্ধে পরাভূত হয়ে সদলবলে মানসূরিয়ায় ফিরে আসেন। মুঈযের বাহিনীর নিহত লোকসংখ্যা গণনা করে দেখা যায়, এসব যুদ্ধে তার ৩৩০০ সৈনিক নিহত হয়েছে।

এরপর আরবরা এই যুদ্ধের প্রতিশোধ স্বরূপ বাহিনী নিয়ে আসে। তারা একদিন কায়রাওয়ানের মুসল্লীদের উপর হামলা করে। মুঈযের বাহিনীর সঙ্গে তাদের তীব্র যুদ্ধ হয়। এতে মানসূরিয়া ও রাকাদায় বিরাট সংখ্যক মানুষ নিহত হয়। মুঈয এ পরিস্থিতি দেখে তাদেরকে কায়রাওয়ানে প্রবেশের সুযোগ করে দেন। কেননা সেখানে গিয়ে তাদের বেচাকেনা করার প্রয়োজন ছিল।

তারা কায়রাওয়ানে প্রবেশ করলে সাধারণ মানুষ তাদের ওপর ক্ষেপে যায়। তাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। এর অন্যতম কারণ ছিল, একজন আরবী ও একজন অনারবীর মধ্যকার সৃষ্ট ফেতনা। তখন আরবদেরই প্রাধান্য ছিল বেশি। ৪৪৬ হিজরী সনে মুঈয কায়রাওয়ানবাসী তার অধীনস্থ লোক ও প্রজাবৃন্দকে মাহদিয়ায় চলে যেতে নির্দেশ দেয়। কেননা তিনি এখানে তাদেরকে যথাযথ নিরাপত্তা দিতে পারছিলেন না।[১৮৭]

মুঈয যখন জিরি সাম্রাজের নতুন রাজধানী মাহদিয়ার গোড়াপত্তন করেন এবং সেখানে সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থানান্তরিত করেন তখন তিনি ৪৪৯ হিজরী সনে সেখানে চলে আসেন। তার পুত্র তামীম তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং তার সামনে সামনে পথ চলতে থাকে।

এসময় আরবরা কায়রাওয়ান সম্পূর্ণরূপে দখল করে নেয়। তারা সেখানকার প্রাসাদ ও ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেয়। ফল-ফসল কেটে ফেলে। নদীর পানি নষ্ট করে দেয়। মোটকথা, আরবদের সঙ্গে সংঘটিত যুদ্ধ ছিল মুঈযের জীবনের একটি দুঃসহ অধ্যায়। এর দ্বারা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি আরবদের সঙ্গে শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারবেন না। তিনি তখন নিশ্চিত জানতে পারলেন যে, উবায়দিয়ারা তার সঙ্গে এক সুগভীর চক্রান্ত করেছে।

---

[১৮৭] আল-কামিল ফিত তারীখ : ৬ : ১৫৪।

আরবদের সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে মুঈযের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল, একদিকে আরবদের শক্তিমত্তা, শৌর্যবীর্য ও অদম্য সাহসিকতা। অপরদিকে তার বারবারিয়া বাহিনীর অপচক্রান্ত। তারা সবসময়ই উবায়দিয়া শাসনব্যবস্থাকে সমীহ করত। তারা একাধিক রণাঙ্গনেই মুঈযকে লাঞ্ছনায় নিপতিত করেছে।

মুঈয দাসদের সঙ্গে মেলামেশা করেন- এটা সনহাজি ও যানাতা সম্প্রদায়ের মনে তার প্রতি বিরাট ক্রোধ ও উষ্মা তৈরি করেছে।

মুঈয যখন মাহদিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন তখন তিনি রাষ্ট্রের সার্বিক দায়দায়িত্ব পুত্র তামীমের হাতে অর্পণ করেন। কেননা সুষ্ঠ পরিকল্পনা ও সঠিক সিদ্ধান্ত দানের ক্ষেত্রে তিনি ইতোমধ্যেই পিতার দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৪৫৩ হিজরীতে ইন্তিকালের আগ পর্যন্ত এই মহান মুজাহিদ নিজ পুত্রের সাথেই বাকি জীবন অতিবাহিত করেন।

বারবারিয়ানদের ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তাআলার পর উত্তর আফ্রিকাঞ্চল থেকে বাতেনী ইসমাঈলীদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস নিমূর্লে বিরাট ভূমিকা রেখেছেন আমির মুঈয বিন বাদিশ। তিনি ছিলেন আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শী ব্যক্তিদের জন্য একটি সুরক্ষিত দুর্গ। তিনি তাদেরকে নিজ রাষ্ট্রে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাদের শত্রুদের কাছে এর জন্য তাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে।

মুঈয বিন বাদিশ ও তার অনুসারী বারবারিয়ানদের ইতিহাস থেকে জানা যায়, তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতাদর্শকে আপন করে নিয়েছিলেন। তারা উত্তর আফ্রিকাঞ্চলকে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত আব্বাসীয় খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুঈয বিন বাদিশ পরবর্তীকালে মুসলমানদের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ও আদর্শ ব্যক্তিত্বরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার মাধ্যমেই মুসলমানদের ইতিহাসে বিরাট বিরাট কীর্তি রচিত হয়েছে। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তার অমর কীর্তি ও অবদানগুলোকে পরকালে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন। যেদিন কোনো ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি কাজে আসবে না। একমাত্র আল্লাহ যাকে রক্ষা করবেন সে-ই রক্ষা পাবে।

আল্লামা ইবনুল আছীর রহ. ৪৫৩ হিজরী সনে আমির মুঈয বিন বাদিশের ইন্তিকাল ও তার পুত্রের খেলাফতের মসনদে সমাসীন হওয়ার ঘটনা উল্লেখ

করেছেন। তিনি লিখেছেন, এই বছর আফ্রিকার অধিপতি মুঈয বিন বাদিশ এক দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেছেন। রোগটি ছিল পাকস্থলি দুর্বল হয়ে যাওয়া। তার শাসনকাল ছিল ৪৭ বছর। তিনি যখন রাজত্ব গ্রহণ করেন তখন তার বয়স ছিল ১১ বছর। কেউ কেউ বলেন, ৮ বছর ৬ মাস।

তিনি ছিলেন খুবই কোমল হৃদয়ের অধিকারী, আল্লাহভীরু, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া রক্তপাত করা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি ছিলেন খুবই সহনশীল। তিনি বড় বড় কবীরা গোনাহ থেকে দূরে থাকতেন। নিজ দাস ও সঙ্গীদের সাথে সদা সদ্ব্যবহার করতেন। জ্ঞানীগুণীদেরকে সম্মান করতেন। তাদেরকে অঢেল উপহার-উপঢৌকন প্রদান করতেন।

একবার তিনি মুন্তানসির যানাতীকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। তিনি সুলতানের কাছে বসা থাকতে থাকতেই এই অর্থ তার কাছে আসে। তখন তিনি এই অর্থ অধিক মনে করে লোকদের মাঝে বণ্টনের নির্দেশ দেন। ফলে সবার সামনেই তা বণ্টন করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। তাকে বলা হল, আপনি এই মুদ্রা নিজ তহবিল থেকে দিলেন কেন? তিনি বললেন, যেন একথা বলা না হয় যে, সে তা দেখে নিজেকে সংযত করতে পারেনি।

তিনি খুব সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখতেন।

মুঈয বিন বাদিশ যখন ইন্তিকাল করেন তখন কবিগণ তার নামে কাব্য রচনা করেন। কবি আবুল হাসান বিন রশীক তার শোকগাঁথা রচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

لكل حي وإن طال المدي هلك ✪ لاعز ملكة يبقي ولا ملك

ولى المعز على أعقابه فرى ✪ أو كاد ينهد من أركانه الفلك

مضى فقيدا وأبقى في خزائنة ✪ هام الملوك، وما أدراك ما ملكوا

ما كان إلا جساما سله قدر ✪ على الذين بغوا في الأرض وانهمكوا

كأنه لم يخض للموت بحر وغي ✪ خضر البحار إذا قيست به برك

ولم يجد بقناطير مقنطرة ✪ قد أرخت باسمه إبريزها السكك

روح المعز وروح الشمس قد قبضا ✪ فانظر بأي ضياء يصعد الفلك.

প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তির জীবন যতই দীর্ঘ হোক– তার পরিসমাপ্তি আছে। এমন রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হওয়া কোনো সম্মানের বিষয় নয়– যার কোনো রাজা নেই।

মুঈয তার অধীনস্তদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে তখন সে যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে।

কিংবা যুদ্ধ করতে করতে তার শরীর ধ্বংসের উপক্রম হয়েছে।

সে নিঃস্বের ন্যায় দিন কাটিয়েছে এবং নিজের রাজ্য পরিচালনায় বাদশাহের শৌর্যবীর্য বজায় রেখেছে। এছাড়া সে যা অর্জন করেছে, তার কথা তুমি জানো না।

সে ছিল এক তরবারি– কুদরত যাকে অবমুক্ত করেছে এমন লোকদের বিরুদ্ধে– যারা পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

যেন সে জীবনের পরোয়াহীন এক উত্তাল সমুদ্র– কর্মের প্রয়োজনে সে সমুদ্র বক্ষও পাড়ি দিয়েছে।

সে কোনো পুল বা সেতুল আশ্রয় নেয়নি। আল্লাহর নাম নিয়ে যুদ্ধে বেড়িয়ে পড়েছে।

মুঈয ও সূর্যের জীবন প্রদীপ নিভে গেছে– এখন দেখো! দিগন্তে আর নতুন কোনো সূর্য ওঠে?[১৮৮]

***

[১৮৮] তারীখুল ফাতহিল আরাবি : ২১৪।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## মুঈযের সন্তানাদি ও দৌহিত্রগণ

### এক. তামীম বিন মুঈয

তিনি ৪২২ হিজরী সনের রজব মাসের ৩ তারিখে মানসূরিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা তাকে ৪৪৫ হিজরী সনে মাহদিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন। এরপর তার পিতা তাকে আফ্রিকার গভর্নরের দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি মানুষের মাঝে খুবই ভদ্রভাবে চলাফেরা ও উঠাবসা করতেন। তিনি জ্ঞানীগুণী ও পণ্ডিতদেরকে নিজের কাছে টেনে আনেন।

তিনি ছিলেন খুবই সাহসী, উচ্চ মনোবলের অধিকারী। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতায় তিনি ছিলেন খুবই পারঙ্গম। তিনি তার পিতার কাছ থেকে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া শহরসমূহ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। তিনি আরব নেতৃবৃন্দকে বিপুল অর্থকড়ি ও উপহার সামগ্রী প্রদান করে তাদের নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করেন। তিনি তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তাদের পরিবার ও সমাজের সাথে মিশে যান। তিনি তাদের মধ্য থেকে বুদ্ধিমান-বিচক্ষণ ও চৌকস সৈন্য তৈরি করেন। ৪৫৫ হিজরী সনে তিনি বিরাট রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর সূসা শহর করতলগত করতে সক্ষম হন।[১৮৯]

৪৫৭ হিজরী সনে হাম্মাদিয়া সাম্রাজের অধিপতি নাসির বিন আলনাস আল হাম্মাদী রাজধানী মাহদিয়া মুক্ত করতে এবং তামীমের রাজত্ব ধ্বংস করতে ইচ্ছা পোষণ করে। সে তখন বনী হিলাল, যানাতা ও সনহাজি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে বাহিনী প্রস্তুত করে। তখন তামীম বিন মুঈয আরব গোত্রসমূহকে তার পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ করেন। তিনি তাদেরকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-অর্থ ও আসবাব-সামগ্রী দিয়ে সহায়তা করেন। তিনি সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে নাসিরের বাহিনী পরাস্ত করতে সক্ষম হন। তাদের ২৪ হাজার লোক নিহত হয়। তিনি যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের সম্পদ আরবদেরকে দিয়ে দেন। তারা এর দ্বারা বিরাট প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে যায়।

তামীম বলেন, আমাদের জন্য এটা অশোভনীয় যে, আমরা আমাদের চাচার বংশধরদের ফেলে যাওয়া সম্পদ নিয়ে ভোগ করব। সুতরাং আমি তা আরবদেরকে দিয়ে দেওয়াই উপযুক্ত মনে করছি।

---

[১৮৯] আল কামিল, ইবনুল আছীর : ৬ : ২৩৪।

৪৮৪ হিজরী সনে আমর বিন মুঈয মাবিস শহরের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তামীম সে শহরটিকে নিজের সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নেন। আমরের আগে এর দায়িত্বে ছিল কাজি ইবনে ইবরাহীম ইবনে বালমূনা নামক এক লোক। তামীম জিরি বাহিনীর দ্বারা সেটি দখল করেছিলেন। তখন তার গোত্রীয় লোকেরা বলল, হে আমাদের অভিভাবক! যখন এর দায়িত্বে ছিল কাজি তখন আপনি এর দিকে মনোনিবেশ করলেন না। একে বাদ দিলেন। আর যখনই আপনার ভাই এর দায়িত্ব নিল তখনই আপনি বাহিনী পাঠিয়ে তা দখল করে নিলেন? এর কারণ কী? তিনি বললেন, যখন এর দায়িত্বে ছিল আমাদেরই একজন দাস তখন তা দখল করা ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। আর যখন মুঈযের একপুত্র মাহদিয়ায় আর আরেকপুত্র কাবিসে তখন আমরা সহজেই শত্রুর টার্গেটে পড়ে গেছি। যার কারণে আমি উভয়টি একই রাষ্ট্রের শাসনাধীনে নিয়ে এসেছি।

সূসা শহর বিজয় করার পর কবি ইবনে খতীব যে বিখ্যাত কবিতা রচনা করেছিলেন, তার প্রথমাংশ নিম্নরূপ,

ضحك الزمان، وكان يلقى عابسا ✪ لما فتحت بجد سيفك قابسا

الله يعلم ما حويت ثمارها ✪ إلا وكان أبوك قبل الغارسا

من كان في زرق الأسنة خاطبا ✪ كانت له قلل البلاد عرائسا

فابشر تميم بن المعز بفتكسة ✪ تركتك من أكناف قابس قابسا

ولوا فكم تركوا هناك مصانعا ✪ ومقاصرا ومخالدا، ومجالسا

فكأنها قلب، وهن وساوس ✪ جاء اليقين، فذاد عنه وساوسا.

যুগ হেসেছে, অথচ ইতোপূর্বে তা বিমর্ষ ছিল– যখন আপনি আপনার তরবারির জোরে কাবিস বিজয় করেছেন।

আল্লাহই জানেন, আপনি এর দ্বারা কতোটা লাভবান হয়েছেন।

তবে আপনার পিতা ছিল এই যুদ্ধের বীজ রোপণকারী।

যে ব্যক্তি দুস্থদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে– রাষ্ট্র ছোট হলেও তা তার জন্য ফুলশয্যায় পরিণত হয়।

তামীম বিন মুঈয! আপনি এমন লড়াইয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করুন– যদ্দারা কাবিসবাসী কাবিস শহর আপনার হাতে তুলে দেবে।

তার পশ্চাদভাগে পলায়ন করবে– সেখানে তারা অসংখ্য কল-কারখানা, প্রাসাদ-অট্টালিকা ও অতিথিশালা রেখে যাবে।

সুতরাং এ আক্রমণ যেন একটি আত্মা। আর সেগুলো হলো নানান সংশয় ওয়াসওয়াসা। যখন সুনিশ্চিত বিজয় এসে যাবে তখন এসব সংশয় আপনাআপনিই দূর হয়ে যাবে।[১১০]

৪৯৩ হিজরী সনে তামীম সাফাকেশ শহরের স্বৈরশাসক হামু বিন ফালফাল আল বারগাওয়াতীকে পরাহত করতে সক্ষম হন এবং সাফাকেশ শহরটিকে নিজের শাসনাধীনে নিয়ে আসেন।[১১১]

আরব্য গোত্রসমূহ মিত্রতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে তামীমের শাসনকাল ছিল তার পিতার শাসনকালের চেয়েও বেশি প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পন্ন।

দানশীলতা, বদান্যতা, সাহসিকতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যে তামীম ছিলেন উপমাসদৃশ। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. তার প্রশংসা করে বলেছেন, তিনি সহনশীলতা, বদান্যতা ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একজন উত্তম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বুদ্ধিমান শাসক ছিলেন। ৪৬ বছর রাজত্ব করেছেন। ৯৯ বছর বেঁচেছিলেন। মৃত্যুকালে ছেলে ও নাতি এবং মেয়ে ও নাতনি হিসেবে যথাক্রমে একশ ও ষাট জন বংশধর রেখে গিয়েছিলেন। তার ইন্তিকালের পর তারই পুত্র ইয়াহইয়া শাসনভার গ্রহণ করেন। আমীর তামীমের গুণকীর্তন করে কবি কত সুন্দর বলেছেন!

أصح وأعلى ما سمعناه في الندا ✪ من الخبر المروي منذ قديم
أحاديث ترويها السيول عن الحيا ✪ عن البحر عن كف الأمير تميم.

আমরা বহু প্রাচীনকাল যাবৎ মজলিসে এমন বিশুদ্ধ ও উচ্চাঙ্গের বর্ণনা সম্বলিত প্রশংসাবাণী শুনিনি। যে প্রশংসাবাণী বিবৃত হয়েছে আমীর তামীমের যবান

---

১১০ আল-কামিল ফিত তারীখ : ৬ : ৩৬৭।
১১১ তারীখুল ফাতহিল আরাবি : ৩০২।

থেকে। সমুদ্র বক্ষ থেকে খালবিলে পানি প্রবাহিত হওয়ার ন্যায়।[১১২]

তিনি একজন গুণী পণ্ডিত ছিলেন। কাব্য সাহিত্যে পারঙ্গম ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন খুবই সহৃদয়বান ব্যক্তি। তার রচিত কাব্যাংশ হলো,

فإما الملوك في شرف وعز ✪ على التاريخ في أعلى السرير
وإما الموت بين ظبا العوالي ✪ فلست بخالد أبد الدهور.

রাজা-বাদশাহগণ হয়তো ইতিহাসের কালপরিক্রমায় সুউচ্চ রাজ সিংহাসনে খ্যাতি ও মর্যাদার সাথে বরিত হন। কিংবা মৃত্যু হয়তো তাদেরকে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। আর কোনো রাজত্বই তো চিরস্থায়ী নয়।[১১৩]

আল্লামা ইবনুল আছীর রহ. বলেছেন, তিনি ছিলেন সাহসী নেতা। বিচক্ষণ বুদ্ধিমান। জনমানুষের মাঝে তার সদগুণাবলির কথা প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি ছিলেন সহনশীল। পাপী ও অন্যায়কারীদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখতেন। এর একটি হলো, একবার আরবের দুই গোত্র আদী ও রায়াহের মধ্যে যুদ্ধ লাগলো। তখন তাদের সন্ধির মধ্যে এমনসব শর্ত ছিল, যাতে তার নিজের ও দেশের ক্ষতি হয়। তখন তিনি তার রক্তপণ নিতে উৎসাহিত করে কয়েক লাইন কবিতা রচনা করেন। কাব্যটি নিম্নরূপ,

متى كانت دماؤكم تطل ✪ أما فيكم بثأر مستقل
أغانم ثم سالم إن فشلتم ✪ فما كانت أوائلكم تذل
ونمتم عن طلاب الثأر حتى ✪ كأن العز فيكم مضمحل
وما كسرتم فيه العوالي ✪ ولا بيض تفل ولا تسل.

তোমাদের রক্ত কখন উছলে উঠে? তোমাদের ভেতরে কি উচ্ছল-উত্তেজনা বিরাজ করে না?

যদি তোমরা পরিস্থিতির শিকার হয়ে তা সহ্য করে নাও তবে তোমরা ব্যর্থ। তোমাদের পূর্বপুরুষরা এরূপ অপদস্থ ছিলেন না।

---

[১১২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২ : ১৮১।
[১১৩] তারীখুল ফাতহিল আরাবি ফী লিবিয়া : ৩০২।

তোমরা শৌর্যবীর্যের অন্বেষা থেকে পিছিয়ে আছো–

তোমাদের অবস্থা এমন করুণ যে, মর্যাদা তোমাদের কাছে ধূসর মরীচিকা।

তোমরা তোমাদের সুউচ্চ মনোবল গুড়িয়ে দিয়েছো। সুতরাং এখন তোমাদের কাছে সাফল্য ও ব্যর্থতা বলতে কিছু নেই।

তখন নিহতের ভ্রাতৃবৃন্দ উদ্যোগী হয়ে রক্তপণ গ্রহণস্বরূপ আদী সম্প্রদায়ের একজন আমীরকে হত্যা করে। এতে তাদের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয়। অসংখ্য মানুষ নিহত হয়। তিনি তখন বিশৃঙ্খলা দমানোর জন্য বনী আদীকে আফ্রিকা অঞ্চল থেকে বের করে দেন।[১৯৪]

তার একটি কথা আফ্রিকায় খুবই প্রসিদ্ধি পেয়েছিল। أسرار الملوك لا تذاع রাজা-বাদশাহদের গোপনকথা বা রহস্য প্রচার-প্রসার করা যাবে না। (প্রাগুক্ত)

তিনি ৫০১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তখন জিরি সম্প্রদায়ের প্রভাব-ঐতিহ্য ফিরে এসেছিল।

## দুই. ইয়াহইয়া বিন তামীম বিন মুঈয বিন বাদিশ

তার পিতা ইন্তিকালের আগে ৪৯৭ হিজরী সনের জিলহজ্জ মাসের ১৬ তারিখে তাকে পরবর্তী শাসক ঘোষণা করেছিলেন। পিতার ইন্তিকালের পর তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ছিল ৪৩ বছর ৬ মাস ২০ দিন। তিনি তখন শাসনভার গ্রহণে উপযুক্ত ছিলেন।[১৯৫]

শাসনক্ষমতায় স্থিরভাবে বসার পর তিনি জিবরা উপত্যকায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করেন। এর কারণ ছিল, এখানকার লোকেরা ডাকাতি করত এবং ব্যবসায়ীদের ধরে নিয়ে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করত। ফলে তিনি সে অঞ্চলে পুলিশ প্রশাসনের টহল বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে গ্রেফতার আতঙ্কে রাখেন। এতে তারা তার শাসনাধীনে চলে আসে। তারা বিশৃঙ্খলা করা পরিহার করে এবং পথের নিরাপত্তা দানের দায়িত্ব গ্রহণ করে।[১৯৬]

তিনি প্রাচীনকালের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মানুষের খবরাখবর ও চিকিৎসা বিদ্যায়

---

[১৯৪] আল-কামিল : ৬ : ৪৮৫।
[১৯৫] দেখুন, তারীখুল ফাতহিল আরাবি ফী লিবিয়া : ৩০৩।
[১৯৬] দেখুন, আত তিযকার : ৩৯।

খুবই গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি বিরাট অনুরাগী ছিলেন। একবার তিনজন বাতেনি তাকে হত্যা করতে এই মর্মে উদ্বুদ্ধ হলো যে, তারা তাকে রসায়ণ শাস্ত্র শেখানোর কথা বলে কাছে ভিড়বে এবং পরে সুযোগ পেলে হত্যা করবে।

কিন্তু আল্লাহর রহমতে তিনি তাদের হাত থেকে মুক্তি পান। ইমাম যাহাবি রহ. বলেন, ইয়াহইয়ার আশেপাশে তিনজন মুসাফির ছদ্মবেশে ঘোরাঘুরি করত। তারা বলত, তারা রসায়ণ বিদ্যা জানে। ফলে একদিন তিনি তাদেরকে কাছে ডাকলেন। তাদের সঙ্গে খোশগল্প করতে লাগলেন। তখন তার সঙ্গে ছিল সেনাবাহিনী প্রধান ইবরাহীম ও উজির শরীফ আবুল হাসান। প্রথমে তিনজনের একজন তরবারি বের করে আমীরকে আঘাত করল। কিন্তু সে কিছু করতে পারল না। আমীর তাকে সজোরে পদাঘাত করলেন এবং পরাস্ত করলেন। পরে তাকে পাশের একটি কামরায় আটকে রাখলেন। শরীফ আরেকজনকে হত্যা করল। ইবরাহীম তরবারি নিয়ে দুই জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন আশেপাশের অন্যান্য উজির ও সভাসদরাও প্রবেশ করল। তারা সম্মিলিতভাবে তিনজনকে হত্যা করল। তারা ছিল বাতেনিদের লোক। আমার ধারণা, উবায়দিদের নেতা তিনজনকে ভাড়াটে খুনি হিসেবে পাঠিয়েছিল।[১৯৭]

তিনি অধিক অধ্যয়ন করতেন। জিহাদ করতে ভালোবাসতেন। পিতার জীবদ্দশায় তিনি অসংখ্য দুর্গ জয় করেছেন। গরীব-দুঃখীদের প্রতি সদয় ছিলেন। ফকির-মিসকীনদের প্রতি মহানুভব ছিলেন। অনাহারে-অর্ধহারে তাদেরকে খাবার খাওয়াতেন। তিনি জ্ঞানী পণ্ডিত ও গবেষক লোকদেরকে নিজের পাশে পাশে রাখতেন। আরবরা তার দেশ পরিভ্রমণে এলে তাদেরকে রাজকীয় অভ্যর্থনা দিতেন ও বিপুল পরিমাণ উপহার উপঢৌকন দিয়ে তাদের মনোতৃপ্তি দান করতেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় আগ্রহী ছিলেন। তার চেহারা ছিল খুবই সুন্দর। তার দু কাঁধে বড় তিলক ছিল। তিনি ডাগর চোখ, লম্বা চওড়া দেহ এবং সরু দুটি পিণ্ডলির অধিকারী ছিলেন।[১৯৮]

তার আশে পাশে একদল কবি চলাফেরা করত। তারা তার কাজকর্মের প্রশংসা করত। তাকে উদ্দীপিত করত। তারা দিওয়ান তথা কবিতাপুস্তকে তার নাম লিখে রাখত। তার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন আবুস সলত ইবনে আবদুল আযীয উমাইয়্যা ইবনে আবিস সলত। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

---

[১৯৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৯ : ৪১৪।
[১৯৮] ওফায়াতুল আয়ান : ৬ : ২১৪।

পরিভ্রমণ করার পর তার পরিষদে ঠাঁই পেয়েছিলেন। তিনি ইয়াহইয়ার প্রশংসা করে অনেক চমৎকার চমৎকার কবিতা রচনা করেছিলেন। এর অন্যতম একটি কবিতা হলো,

فارغب بنفسك إلا عن ندى ووغى ✪ فالمجد أجمع بين البأس واجود
كدأب يحي الذي أحييت مواهبه ✪ ميت الرجاء بإنجاز المواعيد
معطى الصوارم والهيف النواعم وال ✪ جود الصلادم والبزل الجلاعيد
أشم أشوس مضروب بسرادقه ✪ على أشم بفرع النجم معقود
إذا بدا بسرير الملك محتبيا ✪ رأيت يوسف في محراب داود.

কৃপণতা ও যুদ্ধের ময়দান ব্যতীত জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে তুমি উৎসাহী হও।

অথচ মর্যাদা তো বিপদাপদ ও দানশীলতা থেকেই অর্জিত হয়।

যেমন ইয়াহইয়ার লড়াকু মনোভাব তার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে।

অঙ্গীকার পূর্ণ করে নিরাশ লোকদের মনে আশার সঞ্চার করেছে।

সে মানুষকে উপহার-উপঢৌকন দিয়েছে। ধনে-প্রাচুর্যে ভরিয়ে দিয়েছে।

তাদের থেকে ভয়-ভীতি ও শঙ্কা দূর করে দিয়েছে।

কবিতার শেষে তিনি লিখেছেন,

هذي موارد يحي غير ناضبة ✪ وذا الطريق إليها غير مسدود
حكم سيوفك فيما أنت طالبه ✪ فالسيوف قضاء غير مردود.

ইয়াহইয়ার এই জলাধার পানি শূন্য নয়। এর চলার পথেও কোনো বাধ নেই।
তুমি যা চাও তা করতে তোমার তরবারিকে নির্দেশ দাও।

কেননা তরবারিই তা পূরণ করবে। তোমাকে ব্যর্থ মনোরথ করবে না।[১১১]

আমীর ইয়াহইয়া ৫০৯ হিজরী সনে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বাতেনিদের আক্রমণের পরই তিনি এ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

---

[১১১] ওফায়াতুল আয়ান : ৬ : ২১৫।

পরিশেষে রোগ বৃদ্ধি পেলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[২০০]

আল্লামা ইবনুল আছীর রহ. লিখেছেন, তিনি ঈদুল আযহার দিন হঠাৎ করেই ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫২ বছর ১৫ দিন। তার শাসনকাল ছিল ৮ বছর ৫ মাস ২৫ দিন। তিনি ৩ ছেলে রেখে গেছেন। কবি আবদুল জাব্বার বিন মুহাম্মদ হামদীস সলকি তার শোকগাঁথা স্বরূপ একটি কাব্য রচনা করেছেন। কাব্যের শেষে তিনি তার ছেলে আলীকে রাজ্যাভিষেকের সম্ভাষণ জানান। তিনি বলেন,

ما أغمد العضب إلا جرد الذكر ✪ ولا اختفى القمر حتى بدا قمر

موت يحيي أميت الناس كلهم ✪ حتى إذا ما علي جاءهم نشروا

إن يبعثوا بسرور من تملكه ✪ فمن منية يحيي بالأسى قبروا

أوفى علي، فسن الملك ضاحكة ✪ وعينها من أبيه دمعها همر

شقت جيوب المعالي بالأسى فبكت ✪ في كل أفق عليه الأنجم الزهر

وقل لابن تميم حزن ما دهما ✪ فكل حزن عظيم فيه محتقر

قام الدليل ويحيي لا حياة له ✪ إن المنية لا تبقي ولا تذر.

আলোচনাশূন্যতাই মানুষকে দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যায়। যেমন চাঁদ উদিত হলে তা কারো কাছে গোপন থাকে না।

ইয়াহইয়ার মৃত্যুতে সকল মানুষই মৃত্যুবরণ করেছে। পরিশেষে আলী তাদেরকে জাগ্রত করতে এসেছে।

মানুষ যদি আনন্দের সঙ্গে তাকে স্বাগত জানায় তবে ইয়াহইয়ার মৃত্যুতে কিছু যায় আসে না।

আলী তার পিতার শূন্যতা পূরণ করেছে। ফলে রাজ্য খুশিতে হেসে উঠেছে। সে তার পিতার চোখ পেয়েছে। পিতার রক্ত তার মাঝে প্রবাহিত।

আজ উচ্চাশার বাষ্প হতাশার নিগড়ে বন্দী। ফলে দিক-দিগন্তের ফুল-পাখিরাও মনমরা।

তামীম পুত্রের জন্য যতই কাঁদা হতো, তা অল্পই হবে। কেননা কান্না তো একসময় থেমেই যায়।

---

[২০০] ইবনে আযারা : ১ : ৩০৬।

এখন তো তার মৃত্যু হয়ে গেছে। ইয়াহইয়া এখন আর জীবিত নেই।
নিশ্চয়ই মৃত্যু কারও পিছু ছাড়ে না।[২০১]

## তিন. আমীর আলী বিন ইয়াহইয়া বিন তামীম বিন মুঈয

তিনি ৪৯৯ হিজরী সনের সফর মাসের ১৫ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা তাকে সাফাকেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন।

রাজত্বের দুই বছরের মাথায় আলী ভূমধ্য সাগরে একটি জাহায তৈরি করেন। তিনি একে কাবিস শহরের দিকে প্রেরণ করেন। শহরটি ঘেরাও করে রাখেন। আল্লামা ইবনুল আছীর রহ. এর কারণ উল্লেখ করেছেন। কারণ ছিল, শহরের অধিপতি রাফে বিন মাকান আদ দাহমানি সমুদ্রের তীরে একটি জাহায তৈরি করে। সে তাতে ব্যবসায়ীদেরকে আরোহণ করায়। সে দিনটি ছিল আমীর ইয়াহইয়ার জীবনের শেষ দিন। যার কারণে ইয়াহইয়া নিজের শারীরিক দুর্বলতার কারণে তাকে এ কাজে বাধা দিতে পারেননি।

যখন আলী পিতার পর শাসনভারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, কোনো আফ্রিকাবাসীর এ অধিকার নেই যে, সাগরে ব্যবসায়ীদের বহনকারী জাহায তৈরি করে আমাদের বিরোধিতা করবে। রাফে যখন বুঝতে পারল, আলী তাকে বাধা দেবেন তখন সে ধূর্ত রজারের সহায়তা কামনা করল। চিঠি মারফত তার কাছে আবেদন করল, সে যেন তাকে সাগরে জাহায ভাসাতে সহযোগিতা করে। তখন রজার তাৎক্ষণিকভাবে একটি জাহাযকে কাবিসের দিকে প্রেরণ করে। সেটি মাহদিয়্যায় নোঙর করে। তখন আলী তাদের সমঝোতার ব্যাপার আঁচ করতে পারেন। যদিও রাফে তার কাছে সেটা অস্বীকার করে।

যখন রজারের জাহায মাহদিয়্যা ত্যাগ করে তখন আলীর জাহায তার পিছু নেয়। সেটি কাবিসে গিয়ে পৌঁছে। যখন ফরাসি জাহাযের নাবিক মুসলমানদের জাহায দেখতে পেল তখন সে আর জাহায নিয়ে সামনে অগ্রসর হলো না। তারা ফিরে গেল। আর আলীর জাহাযটি সেখানেই রয়ে গেল। সেটি কয়েকদিন কাবিসে রাফের জাহায অবরোধ করে রাখে। এরপর তারা মাহদিয়্যায় ফিরে আসে।[২০২]

---

[২০১] আল কামিল : ৬ : ৫২৪।
[২০২] আল-কামিল : ৬ : ৫২৪।

এরপর রাফে মাহদিয়া অবরোধের ইচ্ছা পোষণ করে। সে বিভিন্ন আরব গোত্রকে একত্র করে এবং একদল সৈনিক প্রস্তুত করে। সে মনে করেছিল, আলীকে পরাভূত করতে পারবে। কিন্তু আলীর সামনে তার কোনো কৌশলই টিকলো না। তিনি রাফের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন এবং তার দম্ভ চূর্ণ করে দিলেন। পরিশেষে আরবের কিছু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তাদের উভয়ের মাঝে সন্ধিচুক্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।[২০৩]

আমীর আলী বিন ইয়াহইয়া সকলিয়ার অধিপতি রজারের দূরভিসন্ধি আঁচ করতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি নতুন করে জাহায নির্মাণ করান এবং সমরযুদ্ধের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যাতে তিনি পারস্য সাগরে রজারের দর্প-ক্ষমতা চূর্ণ করে দিতে পারেন। তখন মারাকেশে অবস্থানরত যোদ্ধারা তার সঙ্গে সকলিয়া অভিযানে অংশগ্রহণে আগ্রহের কথা জানিয়ে পত্র লিখে। এ সংবাদ শুনে রজার দুষ্কৃতি করা থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়।[২০৪]

আফ্রিকার অধিপতি আলী বিন ইয়াহইয়া বিন তামীম রবিউস সানির শেষ দশকে মারা যান। তার যুদ্ধ ও কর্মতৎপরতা, তার অদম্য সাহস ও উচ্চ মনোবলের কথা জানান দেয়। তিনি ইন্তিকাল করলে তার পুত্র হাসান রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। আর সেটা তার পিতার অসিয়ত সাপেক্ষেই। রাজ্যের দেখভাল করেন সন্দল খসি। কেননা তখন হাসানের বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। এ বয়সে সে রাজ্যের যাবতীয় ব্যাপার দেখভাল করার উপযুক্ত হয়ে উঠেনি। সন্দল খুব ভালোভাবেই রাজ্যের দেখাশোনা ও পরিচালনা করছিল। কিন্তু অল্প কিছু দিন পরই সে মারা যায়। তখন তার অপরাপর সঙ্গী-সাথী ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। কেউ বলে, আমি সবার চেয়ে অগ্রগামী। আমার হাতেই সব বিচার-আচারের ভার। পরিস্থিতি এরূপ চলতে থাকলে আমীর হাসান রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন তার পিতার সঙ্গীদের একজন সেনাপতিকে। তার নাম ছিল আবু আযীয মুওয়াফফাক। তখন সকল দ্বন্দ্ব মিটে যায়।[২০৫]

### চার. আমীর হাসান বিন আলী বিন ইয়াহইয়া বিন তামীম

তিনি ৫০২ হিজরী সনে সূসা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার পিতার মৃত্যুর পর শাসনভার লাভ করেন। তার যুগে অসংখ্য কীর্তিকাণ্ড ঘটেছে- যা বর্ণনা

---

[২০৩] প্রাগুক্ত : ৬ : ৫২৪।

[২০৪] আল-কামিল : ৬ : ৫২৪।

[২০৫] দেখুন, মাউসূআতুল মাগরিবিল আরাবি : ৪ : ৮২-৮৩।

করতে গেলে কলেবর বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে তার রাষ্ট্রব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায়। একসময় সেটি হিংসুক ও মুসলিম বিদ্বেষী খ্রিস্টানদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। তারা দেখতে পায় যে, ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী শহরগুলো দখল করা এবং মুসলমানদের অপমান-অপদস্থ করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। এ সময়ই রজার সকলি মুসলমানদের হাত থেকে প্রথমে তারাবলুস পরে মাহদিয়া ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়।

আমীর হাসান বিন আলি মাহদিয়ার রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন, রাজ্য ও প্রাসাদের রাজকীয় জীবনের চেয়ে মুসলমানদের নিরাপত্তা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি প্রথমে মিসরে উবায়দিয়াদের কাছে যাবার মনস্থির করেন। পরে চিন্তা-ভাবনা করে এই ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। তিনি মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত হাম্মাদিয়া সাম্রাজ্যের অধিপতি তার চাচাতো ভাইয়ের কাছে যান। কিন্তু তিনি তাকে এই ভয়ে জোরপূর্বক আটক করেন যে, তিনি হয়তো মুওয়াহহিদীন এর খলিফা আবদুল মুমিন বিন আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কিন্তু হাসান বিন আলী মুক্তি পাওয়ার পর মুওয়াহিদীনদের খলিফার কাছে পৌছতে সক্ষম হন। তিনি কেবল এই ইচ্ছায়ই মুওয়াহহিদীনদের রাষ্ট্রে বসবাস করেন যে, সেখানে থেকে তিনি মুসলমানদের হারানো ভূমি ও ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী শহরগুলোকে খ্রিস্টানদের কবল থেকে উদ্ধার করবেন। তার মৃত্যুসন নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। কিন্তু একথা সুনিশ্চিত যে, তিনি মুওয়াহহিদীনদের রাজধানীতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। ৫৪৩ হিজরী সনে সেখানে যাওয়ার পর মৃত্যু খুব দ্রুতই তাকে আলিঙ্গন করে।

৫৪৩ হিজরী সনে রজার সকলির নেতৃত্বে মুসলিমবিদ্বেষী খ্রিস্টানদের হাতে মাহদিয়া পতনের মাধ্যমে জিরি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। আফ্রিকা ও মধ্য আরব অঞ্চলে প্রায় ১৮০ বছর এই বংশের রাজত্ব টিকে ছিল। এই বংশের প্রথম আমীর ছিলেন বলকীন (৩৬২ হিজরী)। আর শেষ আমীর ছিলেন হাসান বিন আলী (৫৪৩ হিজরী)। জিরি বংশের সাম্রাজ্য পতন ও উবায়দিয়া সাম্রাজ্য পতনের কারণসমূহ উল্লেখ করার আগে আমরা পশ্চিম তারাবলুসে খ্রিস্টানদের কর্তৃক কী কী মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল এবং এই সময়ে কী কী উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল– তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করছি।

### ক. আমীর হাসান বিন আলী সনহাজির যুগে তারাবলুসের গভর্নর

তার নাম মুহাম্মদ বিন খাযরূন বিন খলিফা বিন ওরু। তিনি মালিক শাহের পর তারাবলুসের শাসনভার গ্রহণ করেন। বনী মাতরূহের শায়খগণ তার নৈকট্য লাভ করে। কেননা তাদের ভেতরে তারাবলুসে বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের দক্ষতা ও দূরদর্শীতা ছিল। তিনি তাদেরকে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা, যাবতীয় বিষয়াসয় পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করেন। বিষয়টি এক সময় এ পর্যন্ত গিয়ে গড়ায় যে, তাদের সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছা-অভিপ্রায় ব্যতীত কোনো কাজই অগ্রসর বা সমাধা হতো না। এই করে করে একসময় তারা আমীর হাসান বিন আলীর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়। তারা তাকে রাজস্ব প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায়। এক পর্যায়ে তারা মিসরের উবায়দিয়াদের আনুগত্য করার ঘোষণা দেয়।

### খ. রজার কর্তৃক তারাবলুস আক্রমণ

৫৩৭ হিজরী সনে রজার তার নৌবহর নিয়ে তারাবলুস অবরুদ্ধ করে রাখে। সে শহরের দুর্গগুলোর প্রাচীর টহল দিতে থাকে। ভেতরের অধিবাসীরা দীর্ঘদিন রজারকে ফিরিয়ে রাখে। তারা আরবের উপকণ্ঠের গোত্রসমূহ ও অন্যান্যদের কাছে সহায়তা কামনা করে। তারা সহায়তা করলে রজারের পক্ষে সে নগর করায়ত্ব করা সম্ভবপর হয়নি। সে ব্যর্থ মনে সকলিয়া ফিরে যায়। তারাবলুসবাসী গনীমতস্বরূপ তার বিপুল অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে। ফলে তখন খযরূন তারাবুলের স্বাধীন অধিপতি হয়ে যায়। সে নিজের ইচ্ছা-অভিপ্রায় অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করে। পরিশেষে সে মিসরের উবায়দিয়াদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়।[২০৬]

### গ. তারাবলুসে দুর্ভিক্ষ

৫৪০ হিজরী সনে তারাবলুসে বিরাট দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন কোনো কোনো অধিবাসী দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মুহাম্মদ বিন খযরূন নগরবাসীর প্রতি খুবই কঠোর ছিলেন। শাসনকার্যে তিনি ছিলেন খুবই নির্দয় প্রকৃতির। তিনি লোকদেরকে নগরেই বসবাস করতে বাধ্য করেন। তাদেরকে শহর ছেড়ে না যেতে নানান হুমকি-ধমকি দেন। কিন্তু পরিণতিতে সেটি তাদের হতাশা ও দীর্ঘশ্বাসই বৃদ্ধি করেছে।

বনু মাতরূহ ছিল তারাবলুসের নেতৃস্থানীয় হোমড়া চোমড়া। তারা মুহাম্মদ বিন

---

[২০৬] তারীখুল ফাতহিল আরাবি ফী লিবিয়া : ৩০৫।

খয়রুনের সহযোগী ছিল। কিন্তু দিন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারা তার সঙ্গে বিরূপ আচরণ করল। তারা তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে সকল লোককে সমবেত করল। তখন তারা সম্মিলিত ভাবে তাকে ও তার গোত্রকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিল। সকলিয়ার অধিপতি রজার এই সব খবরাখবর নিয়মিত রাখতো। সে একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে খাদ্যের বোঝাই নিয়ে সেখানে হাজির হল। সে দুর্ভিক্ষ এবং জনগণ কর্তৃক ইবনে খয়রুনকে বহিষ্কারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল। সে তার প্রথম অভিযানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নিজ বাহিনী ও নৌবহর প্রেরণ করল এবং তারাবলুস প্রবেশ করল। ৫৪১ হিজরী সনে সে কোনোরূপ বাধাবিপত্তি ছাড়াই তারাবলুস দখল করে নেয়।

শাসক মুহাম্মদ বিন খয়রুনের পতনের মধ্য দিয়ে তারাবলুসে বনী খয়রুন বংশের শাসনকালের পতন ঘটে।

রজারের নৌবহরের সেনানায়ক জর্জ বিন মিখায়েল ইন্তাকি- যে সিরিয়ায় পড়াশোনা করেছিল এবং তামীম বিন মুঈযের সহপাঠি ছিল- সে তারাবলুসের শাসক মনোনীত হলো। লোকেরা তার কাছে নিরাপত্তা চাইলে তাদেরকে নিরাপত্তা দিল। তারা এই শর্তও দিল যে, তাদেরকে তাদের দীনধর্মের বিরুদ্ধে কিছু করতে যেন বাধ্য না করা হয়।

এটাই ছিল সেই প্রথম সময় যখন তারাবলুসে মুসলিমবিদ্বেষী খ্রিস্টানরা শাসনকার্য পরিচালনা করে। ৫৩৭ হিজরী সনে তারা যখন প্রথমবার তারাবলুস দখল করতে এসেছিল তখন তাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি।[২০৭]

রজার তারাবলুসবাসীর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব করতে ইচ্ছা করল। ফলে সে রাফে বিন মাতরূহকে তার গভর্নর নিযুক্ত করল। ইউসুফ বিন জিরিকে বিচারকের পদে পদায়ন করল। তার নাম আবুল হাজ্জাজ। রাফে বিন মাতরূহ সেখানে বারো বছর শাসন করেছে। সে ধর্মেকর্মে রজারের পূর্ণ অনুগত ছিল।

আমার ধারণা, খ্রিস্টানদের অধীনে তার কাজ করার অন্যতম কারণ ছিল, বাধ্যবাধকতা। এটা তার ইচ্ছানুসারে হয়নি। সে সকলিয়ায় রজারের আনুগত্য করার সঙ্গে সঙ্গে যথাসাধ্য চেষ্টা করত, যাতে মুসলমানদের ক্ষয়ক্ষতি বেশি না হয়। তারা যেন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

৫৪৮ হিজরী সনে মাহদিয়া ও কাবিস ছাড়া তারাবলুস যখন রজারের কর্তৃত্বে

---

[২০৭] তারীখুল ফাতহিল আরাবি ফী লিবিয়া : ৩০৭।

চলে আসে তখন রজার মৃত্যুবরণ করে। তারপর তার পুত্র গ্যালয়ালিম নিজের নাম দ্বিতীয় রজার ধারণ করে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করে। উত্তর আফ্রিকায় তার শক্তিক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কাবিস শহরও তার শাসনাধীনে আসে। সে মুসলমানদের ওপর নির্মম ও নির্দয় আচরণ করত। ফলে তারা তার শাসনব্যবস্থায় বিরক্ত হয়ে উঠে। তারা তার শাসনাধীনে থাকা অপছন্দ করতে থাকে। তারা আফ্রিকায় মুওয়াহহিদীনদের দাওয়াত পেয়ে এবং মাহদিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে সাহসী হয়ে ওঠে।

গ্যালয়ালিমের বিরুদ্ধে সাফাকেশে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়। আর তা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলসমূহেও ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহ তারাবলুসের দিকে দিকে পৌছে যায়। গ্যালয়ালিম আশংকা করে যে, তারাবলুসবাসী এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করবে। তখন পরস্পরের ভেতরে গৃহযুদ্ধের ফেতনা সৃষ্টি হবে। কেননা তারা বিদ্রোহের ভাবনা থেকে দূরে রাখতে এবং মুওয়াহহিদীনদের সঙ্গে মিলিত হওয়া থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করবে। তখন সে তারাবলুসবাসীর কাছে এই দাবি করে যে, তারা যেন মুওয়াহহিদীনদেরকে গালিগালাজ করে। কিন্তু তারাবলুসবাসী তাদেরকে গালিগালাজ করা থেকে নিবৃত্ত থাকে। তারা বিচারপতি আবুল হাজ্জাজের শরণাপন্ন হয়। তাকে দায়িত্ব দেয়, তিনি যেন গ্যালয়ালিমকে একথা বোঝাতে সক্ষম হন যে, তার এরূপ দাবি দীনের নীতি-আদর্শের পরিপন্থী। বিচারপতি তাদেরকে এই মর্মে আশ্বস্ত করেন যে, তিনি সম্রাটকে একথা বোঝাবেন, যাতে তিনি তাদেরকে মুওয়াহহিদীনদের বিরুদ্ধে গালিগালাজ ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার দাবি না করেন।

বিদ্রোহ দমনে তারাবলুসবাসীর সঙ্গে গ্যালয়ালিমের আচরণ তার জন্য ক্ষতিকর গণ্য হয়। কেননা সে তাদের উপর জুলুম করেছে। তাদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা করেছে। তখন রাফে বিন মাতরূহ তার বিরুদ্ধে দানা বেঁধে উঠা বিদ্রোহের নেতৃত্ব প্রদান করে। ফলে ৫৫৩ হিজরী সনে তারাবলুস খ্রিস্টানদের শাসন থেকে মুক্ত হয়। তারাবলুস বাসীর কাছে নিজের খ্যাতি ও মর্যাদার কারণে রাফে বিন মাতরূহই তারাবলুসের শাসক মনোনীত হয়। উত্তর আফ্রিকায় যখন মুওয়াহহিদীনদের দাওয়াত সম্প্রসারিত হয় তখন তারাবলুসবাসী মুওয়াহহিদীনদের প্রধান নেতা আবদুল মুমিন বিন আলীর অধীনতা গ্রহণ করে নেয়। এই ঘটনাটি ঘটেছিল ৫৫৫ হিজরীতে।[২০৮]

***

---

[২০৮] তারীখুল ফাতহিল আরাবি ফী লিবিয়া : ৩০৭।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### উত্তর আফ্রিকায় জিরি সাম্রাজ্য পতনের কারণসমূহ

১. জিরি সম্প্রদায় পুরো উত্তর আফ্রিকাতে একতা ও ঐক্যতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। কারণ, সনহাজিদের কয়েকটি উদ্যত গোত্র যেমন যানাতা তারা তারাবলুসের উমাইয়্যা খেলাফতের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিল।

২. জিরি সম্প্রদায়ের ভেতরে ভেতরে নানান বিভক্তি সৃষ্টি। যেমন, মধ্য মরক্কোয় হাম্মাদিয়া সাম্রাজ্যের উত্থান।

৩. ক্রমাগত প্রায় দুই বছর যাবৎ সনহাজি, যানাতা ও কাত্তামিয়া গোত্রের মাঝে চলমান দ্বন্দ্ব-বিবাদ। যার কারণে তারা বহিরাগত শত্রুর কাছে এই রাষ্ট্রীয় দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া সহজতর করে দিয়েছে।

৪. বাতেনীদের কর্তৃক জিরি সাম্রাজ্যকে নিয়ে সুগভীর ষড়যন্ত্র এবং জিরি বংশের শাসকদের বিরুদ্ধে গৃহীত অপতৎপরতা। তারা জিরি সাম্রাজ্যের অন্যতম সুলতান মুঈয বিন বাদিশের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বনী হিলাল ও বনী সুলাইমকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে প্রেরণ করে।

৫. কোনো কোনো শহর জিরি সাম্রাজ্যের রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ, বাতেনিদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে আরব গোত্রগুলো আক্রমণ করে এবং সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। তখন জিরি সাম্রাজ্যের সুলতানগণ সেগুলো আবার নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত করতে মনোনিবেশ করেন। এতে তাদের অনেক শক্তি-অর্থ ও সময় ব্যয় হয়। তাদের অসংখ্য লোক নিহত হয়। যেমন, তিউনিস পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে একবার তাদেরকে বনী খোরাসান ও সাফাকেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। একবার বারাগুতীর সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। আর ফাঁস নগরী উদ্ধার করতে গিয়ে বনু জামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

৬. ভূমধ্য সাগরের দিক থেকে আগত ক্রুসেড যুদ্ধ। ইউরোপের দিক থেকে আগত অসংখ্য যুদ্ধে কেবল জিরি সাম্রাজ্য একাকীই মোকাবিলা করেছে। খ্রিস্টানদের এই বিদ্বেষমূলক রণযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ৪৮৪ হিজরীর পর থেকে যখন সকলিয়া উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল কোয়েট নরম্যান। তারা ৫২৯ হিজরী সনে জিরবা উপত্যকা দখল করে নেয়। তারা ৫৩৭ হিজরী সনে তারাবলুসে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে। এরপর ফিরে যায়। পরে ৫৪১ হিজরী সনে পুনরায় তা দখল করে। তারা ৫৪২ হিজরী সনে ফাঁস নগরী আক্রমণ করে। আরব গোত্র, যানাতা ও বনী হাম্মাদের মধ্যকার

আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও কোন্দল জিরি সাম্রাজের শক্তি খর্ব করেছে। যার কারণে ক্রুসেডারদের আক্রমণ সহজতর হয়েছে। ফলে সনহাজি জিরি সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়েছে। ৫৪৩ হিজরী সনে রাজধানী মাহদিয়া পতনের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি হয়েছে।

৭. অসংখ্য আলেম-উলামা ও ফকিহ কায়রাওয়ান ও মাহদিয়া ছেড়ে মধ্য মরক্কো ও পশ্চিম মরক্কোয় পাড়ি জমিয়েছেন।

৮. দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সবসময় অস্থিতিশীল ও উদ্বেগজনক থাকায় সাধারণ মানুষও পর্যায়ক্রমে আন্দালুস, সকলিয়া ও পশ্চিমাঞ্চলীয় মুসলিম ভূখণ্ডগুলোয় হিজরত করেছে। সাধারণ মানুষের সহায়তা না থাকাও তাদের পতনের অন্যতম কারণ।

## কায়রাওয়ান ও মাহদিয়ায় জিরি বংশের শাসকবৃন্দ

১. বলকীন বিন জিরি বিন মুনাদ বিন মানকূশ আস সনহাজি। (৩৬২-৩৭৪ হিজরী মোতাবিক ৯৭৩-৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ)

২. আল মানসূর বিন বলকীন জিরি। (৩৭৪-৩৮৬ হিজরী মোতাবিক ৯৮৪-৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ)

৩. বাদিশ বিন মানসূর বিন বলকীন। (৩৮৬-৪০৬ হিজরী মোতাবিক ৯৯৬-১০১৫ খ্রিস্টাব্দ)

৪. মুঈয বিন বাদিশ বিন মানসূর। (৪০৬-৪৫৩ হিজরী মোতাবিক ১০১৫-১০৬২ খ্রিস্টাব্দ)

৫. তামীম বিন মুঈয বিন বাদিশ। (৪৫৩-৫০১ হিজরী মোতাবিক ১০৬২-১১০৭)

৬. ইয়াহইয়া বিন তামীম বিন মুঈয বিন বাদিশ। (৫০১-৫০৯ হিজরী মোতাবিক ১১০৭-১১১৬)

৭. আলী বিন ইয়াহইয়া বিন তামীম। (৫০৯-৫১৫ হিজরী মোতাবিক ১১১৬-১১২১ খ্রিস্টাব্দ)

৮. হাসান বিন আলী বিন ইয়াহইয়া। (৫১৫-৫৪৩ হিজরী মোতাবিক ১১২১-১১৪৮ খ্রিস্টাব্দ)

***

# চতুর্থ অধ্যায়

# উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের পতন

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### উবায়দিয়া সাম্রাজ্য পতন, বাতেনী সম্প্রদায়ের ভিত নির্মূল এবং ক্রুসেডার খ্রিস্টানদের ভরাডুবির কারণসমূহ

**এক.**

উলামা, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের নেতৃত্বে বাতেনী উবায়দি সাম্রাজ্যের ভিত উৎপাটনে সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ। কারণ, উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের হর্তাকর্তাগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তারা তাদের রাজত্ব ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরকে মিসরে সরিয়ে নেবে।

**দুই.**

বার্বারি ইসলামী শাসক মহামান্য সুলতান মুঈয বিন বাদিশ এর আত্মপ্রকাশ। তিনি নিজেকে মিসরে প্রতিষ্ঠিত উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তা-দর্শনগত যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও প্রোপাগাণ্ডা থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

**তিন.**

পার্থিব ও বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধিকে কেন্দ্র করে সিরিয়ায় কারামেতাদের সঙ্গে উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের আত্মকলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যাপক আকার ধারণ।

**চার.**

সিরিয়ায় সালজুকি সালতানাতের অবস্থান দুর্বল করার দূরভিসন্ধিতে উবায়দিয়াদের কর্তৃক ইউরোপীয় খ্রিস্টানদেরকে সহায়তাকরণ। কিন্তু খ্রিস্টানরা যখন মিসরে আগমন করে তখন তারা উবায়দিয়াদেরকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের মাধ্যমে তাদের সাথে গাদ্দারি করে।

**পাঁচ.**

মিসরবাসী সম্মিলিতভাবে বাতেনী উবায়দিয়া মতাদর্শ পরিত্যাগকরণ। একইসঙ্গে বাতেনী উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের ভিত উৎপাটনে মিসরবাসী আলেম-

উলামা ও ফুকাহায়ে কেরাম কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

ছয়.

আব্বাসীয় খেলাফত কর্তৃক কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ আঁকড়ে ধরা এবং সর্বত্র কুরআন-সুন্নাহর দাওয়াত প্রচার-প্রসার করা। সর্বপ্রথম খলিফা আল কাদির বিল্লাহ ৪০৮ হিজরীতে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি মুতাযিলা ফকীহদের কাছ থেকে তাওবা কামনা করেন। ফলে তারা তাওবা করে মুতাযিলা মতাদর্শ থেকে ফিরে আসে। একই সঙ্গে তারা ইসলামবিরোধী কথাবার্তা ও বক্তব্য প্রদান করা থেকে বিরত হয়ে যায়।[২০৯]

সুলতান মাহমূদ ইবনে সবুক্তগীন এক্ষেত্রে আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ পালন করেন। তিনি মুতাযিলা, রাফেযী ও ইসমাঈলীদের শাস্তি প্রদানে তারই গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। তিনি বিদআতীদের সকল দল-উপদলকে দূরে সরিয়ে দেন এবং তাদেরকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন। একইভাবে তিনি ফালসাফা বা দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থাবলিও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেন।[২১০]

মহান মুজাহিদ সুলতান মাহমূদ গযনভী রহ. হিন্দুস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ইসমাঈলী রাফেযী ও বাতেনী সম্প্রদায়ের শেকড় উপড়ে ফেলেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. তার জীবনী উল্লেখ করে বলেন, তিনি হলেন মহান শাসক, গাজি মুজাহিদ আবুল কাসিম। তিনি গযনীসহ আশেপাশের অন্যান্য অঞ্চলসমূহের অধিপতি ছিলেন। হিন্দুস্তানে অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-জিহাদে বিজয় অর্জন করেছেন। তার পূর্বে ও পরে আর কেউ এরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তিনি অঢেল গনীমতের সম্পদ পেয়েছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ও তার পরিবারের লোকেরা ছিলেন খুবই দীনদার, পরহেযগার। তিনি আলেম-উলামা ও মুহাদ্দিসগণকে খুবই মূল্যায়ন করতেন। তাদেরকে দিল থেকে ভালোবাসতেন। তিনি দীনদার, সমঝদার ও দীনের কল্যাণকামী লোকদেরকে খুবই পছন্দ করতেন।[২১১]

একবার মিসরের উবায়দিয়ারা তাকে হাদিয়া-উপঢৌকন দিয়ে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে- যাতে তিনি নিজ দেশে তাদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন- তখন তিনি

---

[২০৯] আল-কামিল : ৯ : ৩০৫।

[২১০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২ : ২৮-৩২।

[২১১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২ : ২৮-৩২।

তাদের হাদিয়াসামগ্রী, তাদের চিঠিপত্র জ্বালিয়ে দেন।[২১২]

তারতূহী/প্রহরী তাদের উপহারসামগ্রী বাহককে হত্যা করে এবং তার খচ্চরটি বিচারপতি আবু মানসূর মুহাম্মদ আল ইযদীকে হাদিয়া দিয়ে দেয়। বলে, ইতোপূর্বে এতে আরোহণ করেছে নাস্তিক-মুরতাদদের নেতা। সুতরাং এখন এতে আরোহণ করুক ঈমানদার নেতা।[২১৩]

এই মহামান্য সুন্নী শাসক নিজ দেশে ইসমাঈলী ও বিদআতীদের জড় ও শেকড় উপড়ে ফেলার চেষ্টা-সংগ্রাম করেছেন। মহান আল্লাহ তাআলা তাকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন।

দীনের এই মহান মুজাহিদ ৪২১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। গযনীতে তার শাসনব্যবস্থা দীর্ঘসময় পর্যন্ত বহাল ছিলো। তার নাতি ছিলো কর্মে ও আচরণে অবিকল তার মতোই। গযনী বংশের শাসকগণ হিজরী তেরো শতক পর্যন্ত আহলুস সুন্নাহের মতাদর্শের আলোকে ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছেন। এরপর যখন ইংরেজরা এদেশে আগমন করে তখন প্রায় দুশো বছর তারাই ভারতবর্ষ শাসন করে। শেষে হিন্দুদের হাতে রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। এ সময় থেকেই ভারতবর্ষে মুসলমানরা যে অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়ন ও শোষণ-বঞ্চনার স্বীকার হয়- তা ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায় হয়ে আছে।[২১৪]

সাত.

খোরাসানে সুন্নী মতাদর্শী সালজুকী সালতানাতের আত্মপ্রকাশ। পর্যায়ক্রমে তারা খেলাফতের রাজধানীও করতলগত করতে সক্ষম হয়। তারা ৪৪৮ হিজরী সনে বাহায়ীদের পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়। এর মাধ্যমে শিয়া বাহাই আধিপত্যের পতন ঘটে। সালজুকী সালতানাত ঘৃণ্য বাসাসীরী ফেতনা মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হয়। ৪৪৮ হিজরী সনে মসজিদের দরজায় দরজায় লাগানো সাহাবায়ে কেরামকে গালিগালাজের উক্তি সংবলিত প্ল্যাকার্ড সরিয়ে দেওয়া হয়। মহামান্য সুলতান রাফেযীদের শায়খ ও নেতা আবু আবদুল্লাহ জালালকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। কারণ সে মারাত্মক পর্যায়ের বাড়াবাড়ি

---

[২১২] প্রাগুক্ত : ১২ : ৩২ ও ৪৩; আর রাওযাতাইন : ৩১; ইতিহাস কি আবার ফিরে আসবে? : ৬৬-৬৭।
[২১৩] ইতিহাস কি আবার ফিরে আসবে? : ৬৬।
[২১৪] ইতিহাস কি আবার ফিরে আসবে? : ৬৬-৬৭।

করতে শুরু করেছিল।[২১৫]

সালজুকীদের মহান নেতা সুলতান আলেপ আরসালানের যুগে উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরে আসে। তারা নাসারা ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বিরাট বিজয় অর্জন করে। আলেপ আরসালান হালব ও সিরিয়ার অঞ্চলসমূহ থেকে উবায়দিয়াদের শক্তি-ক্ষমতা খর্ব করে পুনরায় আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেন। ৪৬২ হিজরী সনে মক্কা মুকাররমা উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের অনুশাসন থেকে মুক্ত হয়ে আব্বাসীয় খেলাফতের অধীনে আসে। এর ফলে সুলতান আলেপ আরসালান মক্কার প্রশাসক মুহাম্মদ বিন আবু হাশেমকে ত্রিশ হাজার দিনার প্রদান করেন।[২১৬]

মহামান্য উযির নিযামুল মুলক হাসান বিন আলীর যুগে সালজুকী সালতানাত প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ ও পদবী বেছে বেছে এমন এমন আমীর ও সেনাপতিদেরকে প্রদান করে, যাদের ভেতরে দীনি মেযাজ, বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস রয়েছে। সত্য প্রতিষ্ঠায় অদম্য সাহস রয়েছে। উন্নত আচার আখলাকের অধিকারী। সর্বোপরি ব্যক্তিজীবনে তারা আহলুস সুন্নাহর জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রেখেছেন।

বিদগ্ধ ঐতিহাসিক আবু শামা রহ. বলেন, সালজুকিরা শাসনভার গ্রহণ করে খেলাফতের ব্যাপারে আগের চেয়েও অধিক মনোযোগ ও গুরুত্ব প্রদান করেন। বিশেষত উযির নিযামুল মুলকের যুগে তা সর্বাধিক গুরুত্ববহ ছিলো। কেননা তিনি প্রজা ও শাসককে যথামর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন।[২১৭]

এই মহামান্য উযির নিযামুল মুলক হাসান ইবনে আলী ছাত্রদের জন্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখে ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি ৪৫৯ হিজরী সনে বাগদাদে নিযামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিশাপুরসহ অন্যান্য অঞ্চলেও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুন্নী মতাদর্শী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার এই মনোবৃত্তি মিসরেও চালু হয়। আর সেটা শুরু হয় বাতেনী উবায়দিয়াদের তত্ত্বাবধানে। যাফীরের উযির আবুল হাসান আলী ইবনুস সালার ৫৪৪ হিজরীতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হাফেয সালাফীকে এর মহাপরিচালকের পদ দান করেন। ইস্কান্দারিয়ায় শাফেয়ী মতাদর্শীদের একটি মাদরাসা ছিলো। ৫৩২ হিজরী সনে উফিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান

---

[২১৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২ : ৪৩।
[২১৬] ইতিহাস কি আবার ফিরে আসবে? : ৬৮।
[২১৭] আর রাওযাতাইন ফী আখবারিদ দাওলাতাইন : ৩১।

তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ফকিহ ইবনে তাহির ইবনে আউফ মালেকি। এই দুটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্য ছিলো শিয়া মতাদর্শ দমন করা এবং সুন্নী মাযহাব ও আদর্শ প্রচার-প্রসার করা।[২১৮]

ঐতিহাসিক আবু শামা নিযামুল মুলক সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, তিনি ছিলেন একজন দীনদার আলেম ও ফকীহ। ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই বিনয়ী ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি দীনদার লোকদের পছন্দ করতেন। তার দান সদকা ও ওয়াকফ করার কোনো সীমা-পরিসীমা ছিলো না। তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহ সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছে। জাযিরায়ে ইবনে আমর পর্যন্ত কোনো শহরেই তিনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা থেকে বাদ রাখেননি। জাযিরায়ে ইবনে আমর হচ্ছে পৃথিবীর একটি ভূস্বর্গ ও দর্শনীয় স্থান। তিনি সেখানে একটি অনিন্দ্য সুন্দর মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি যথাসময়ে নামায আদায়ে খুবই গুরুত্ব দিতেন। ইবাদাতের জন্য ব্যাকুল ও অবসর লোকেরাও এক্ষেত্রে তাকে পেছনে ফেলতে পারতো না।[২১৯]

তিনি ৪৮৫ হিজরী সনে রমযানের ১০ তারিখে নাহাওয়ান্দের সন্নিকটে বাতেনীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।[২২০]

আট.

শাফেয়ী মাদরাসার আলেম-উলামাদের কর্মতৎপরতা। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী আল জুওয়াইনি। তিনি নিজ যুগের সর্বপ্রকার ধর্মীয় ফেতনা ও সমস্যা দূর করায় কর্মতৎপরতা গ্রহণ করেছেন। এ সময়ই তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'গিয়াসুল উমাম ফিত তাইয়্যাসিজ জুলাম' রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি সমকালীন প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক অপতৎপরতা ও মুসলমানদের বাস্তবজীবনে উদ্ভূত সংকট ও সমস্যাবলি নিরসনে সমূহ সমাধান তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

ইমাম জুওয়াইনির খ্যাতনামা ছাত্রদের অন্যতম হলেন, আবু হামিদ আল গাযালি ও ইলকিয়া আল হিরাসী। ইমাম গাযালি রহ. তার অনন্য গ্রন্থ 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' এসময়ই রচনা করেছেন। তার ইচ্ছা ছিলো, এই গ্রন্থ যেন মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা সংশোধনে ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু তার

---

[২১৮] ইতিহাস কি আবার ফিরে আসবে? : ৬৯।
[২১৯] আর রাওযাতাইন ফী আখবারিদ দাওলাতাইন : ১ : ৫।
[২২০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২ : ১৫০।

কিতাবটিকে এই বলে সমালোচকেরা দূরে সরিয়ে রাখে যে, এতে দুর্বল হাদিস চয়ন করা হয়েছে। মনগড়া-অলীক কিস্সা-কাহিনী, সূফিদের অবান্তর ঘটনা, ফালসাফা বা যুক্তিতর্কের অসাড় তত্ত্ব উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু এসব কিছুর পরও আমার মতে, তার বইটিতে আত্মসংশোধন ও মনের খাহিশাত নিবৃত্ত করার এবং অন্তর পরিশুদ্ধ করার বিরাট খোরাক রয়েছে। মানুষের মন ও আত্মা বিষয়ে ইমাম গাযালি রহ. এর দার্শনিক কথাবার্তাগুলো খুবই প্রভাবক। এগুলো মুসলমানদের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে থাকে।[২২১]

ইমাম জুওয়াইনি রহ. এর পূর্বসূরী হলেন ইমাম মাওয়ারদি রহ.। তিনি ইমামুল হারামাইনের কর্মতৎপরতার অগ্রপথিক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি শাসনব্যবস্থার সমস্যাবলি নিরসনে রচনা করেছেন, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ'। মুসলমানদের জীবনের তাত্ত্বিক সমস্যাবলি নিরসনে রচনা করেছেন, 'আদাবুদ দুনইয়া ওয়াদ্দীন'। এই গ্রন্থে তিনি শরয়ী ভাষ্যের আলোকে দেখিয়ে দিয়েছেন, একজন মানুষ কীভাবে শরয়ী সীমারেখার ভেতরে থেকে দীন ও দুনিয়া উভয়টা পরিপালন করতে পারবে!

নিশ্চয় শাফেয়ী মতাদর্শের সুন্নী মাদরাসাগুলোর আলেম-উলামা যেমন আবু ইসহাক সিরাজী ও তার শিষ্যবৃন্দ রাফেযীদের দমন এবং বাতেনী মতাদর্শ নির্মূলে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করেছেন।[২২২]

**নয়.**

বাগদাদের হাম্বলী মতাদর্শের মাদরাসাগুলোতে একদল নিষ্ঠাবান দীনের সেবক ও আলেম-উলামার আত্মপ্রকাশ। যারা উলামায়ে উম্মত ও তলাবায়ে কেরামকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাদের পরিচর্যা করেছেন। তাদের অন্যতম হলেন, আবুল ওয়াফা ইবনে আকীল ও শায়খ আবুল ফরজ ইবনুল জাওযী। তারা একাধারে উম্মাহর ইমাম, হাফেয ও ওয়ায়েয ছিলেন। দীনের বিশুদ্ধ মৌলনীতির আলোকে মানুষের ধর্মের পথে ফিরে আসার পেছনে তারা বিরাট অবদান রেখেছেন। উম্মাহর তালিম-তরবিয়ত, শিক্ষাদীক্ষা ও তাদের বিশুদ্ধ আকিদা ও মনমানসিকতা গঠনে মাদরাসা আবু সাঈদ মাখরামী হাম্বলীর বিরাট কীর্তি ও অবদান রয়েছে। বিশেষত যখন এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, আলেমে রব্বানী শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রহ.। সিরিয়ার অধিকাংশ বড়

---

[২২১] ইতিহাস কি আবার ফিরে আসবে? : ৭০-৭৩।
[২২২] ইতিহাস কি আবার ফিরে আসবে? : ৭০-৭৩।

বড় আলেম হাম্বলী ফিকহ অধ্যয়নের জন্য বাগদাদে আগমন করতেন। একইসঙ্গে তারা এসব মাদরাসার ফিকহী ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মতৎপরতার সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করতেন। এসব মাদরাসায় অধ্যয়ন করে যারা ব্যক্তিজীবনে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন হাফেয আবদুল গণী মাকদিসি রহ ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি ৫৬০ হিজরীতে শায়খ মুওয়াফফিক ইবনে কুদামা রহ. এর সঙ্গে বাগদাদে আগমন করেন। শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রহ. তাদের যথাযোগ্য কদর ও সম্মান করেন।[২২৩]

মাকদিসের এই অধিবাসীবৃন্দ শায়খ আবু উমর, তার ভাই মুওয়াফফিক, তাদের মামাতো ভাই আবদুল গণী ও শায়খ ইমাদুদ্দীন-ফরাসীদের সঙ্গে মহামান্য সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবি রহ. যে যুদ্ধ-জিহাদই করেছেন তারা তার সঙ্গে সেগুলোতে অংশগ্রহণ করেছেন। তারা তার সাথে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়েও অংশগ্রহণ করেছেন।[২২৪]

মুসলমানদের অন্তরে এ সকল আলেমদের জন্য বিরাট ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিলো। যুদ্ধ-জিহাদে অংশগ্রহণ, আকিদাগত ক্ষেত্রে সঠিক প্রমাণ উপস্থাপন, ইসমাঈলিয়া, উবায়দিয়া ও বাতেনীদের ভ্রান্ত মতাদর্শের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, তাদের অপকর্মের গোঁমড় ফাঁস এবং তাদের ধ্বংসাত্মক নীলনকশা উন্মোচনথ এসবই ছিলো উক্ত মহান আলেমগণের জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

বিশিষ্ট ওয়ায়েয ফকীহ আলী ইবনে ইবরাহীম ইবনে নাজা হাম্বলী দামেশকী রহ. ছিলেন বাগদাদের হাম্বলী মতাদর্শী মাদরাসার ছাত্র। তিনি সুলতান সালাহউদ্দীনের বাহিনীতে যোগদান করেছেন। সুলতানের কাছে তার বিরাট মর্যাদা ছিলো। তিনিই সুলতান সালাহউদ্দীনকে মিসরে আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে উবায়দিয়াদের ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি ও ষড়যন্ত্র ধূলিস্যাত করায় এবং উবায়দিয়াদেরকে মিসর থেকে তাড়িয়ে দেওয়ায় সবিশেষ পরামর্শ ও সহায়তা দিয়েছেন।[২২৫]

সিরিয়ায় সুন্নাহর শাসনব্যবস্থা ফিরে এলে সেখানকার মুসলমানগণ খুবই খুশি হয়। শায়খ আবুল মুযাফফর আল জাওযী রহ. বলেন, শায়খ ইমাদ সর্বদা আমার মজলিসে আসতেন। তিনি বলতেন, সালাহউদ্দীন ইউসুফ সাহিল বিজয় করেছেন। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন। আর আপনি ইউসুফ! সিরিয়ায়

---

[২২৩] ইতিহাস কি আবার ফিরে আসবে? : ৭০-৭৩।
[২২৪] ইতিহাস কি আবার ফিরে আসবে? : ৭০-৭৩।
[২২৫] ইতিহাস কি আবার ফিরে আসবে? : ৭০-৭৩।

সুন্নাহর পুনর্জাগরণ করেছেন।[২২৬]

শায়খ ইমাদ আল মাকদিসী রহ. ফজর থেকে ইশার পর পর্যন্ত বসে বসে মানুষকে কুরআন শেখাতেন। শরীয়তের বিধিবিধান পড়াতেন। তাদের সামনে ইসলামের সার্বিক বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরতেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সুন্নী হাম্বলী মতাদর্শী প্রতিষ্ঠান ও মাদরাসাগুলো অজ্ঞতা, মূর্খতা, রাফেযীদের তৎপরতা দমন, সুন্নাহর পুনর্জাগরণ এবং মানুষের অন্তরে জিহাদের জযবা ও প্রেরণা সৃষ্টিতে সবিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

**দশ.**

বাতেনীদের জড় ও শেকড় উৎপাটনে সালজুকি বাহিনীর ধারাবাহিক আক্রমণ। নিম্নে সালজুকি সালতানাতের মহান আমীর-উমারা কর্তৃক ইসলামের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার অমর কীর্তি ও অবদানের কথা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

৪৩৬ হিজরী সনে মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চলের সুলতান বুগরা খান ইসমাঈলীদের দমনে অভিযান পরিচালনা করেন। মিসরের উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে তার দেশে যে সকল দূত-দাঈ বা মতাদর্শ প্রচারক প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি তাদেরকে পাকড়াও করেন এবং সকলকে হত্যা করেন। দেশের সর্বত্র পত্র মারফত এই নির্দেশ জারি করেন যে, এদের যাকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই তাকে হত্যা করে ফেলবে। এদেরকে হত্যার করার ফলে সে দেশটি বাতেনীদের অপতৎপরতা থেকে মুক্ত হয়।[২২৭]

সুতরাং ইস্পাহানবাসী তাদের দেশে যেসকল উবায়দি মতাদর্শ প্রচারক পেয়েছে তাদের সবাইকে হত্যা করেছে। এক্ষেত্রে তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন, বিশিষ্ট শাফেয়ী সুন্নী ফকীহ মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ আল খাজন্দী রহ.।

৫০০ হিজরী সনে সুলতান মুহাম্মদ বিন মালিক শাহ সালজুকি তাদের সঙ্গে বিরাট রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধান। তাদেরকে ইস্পাহান কেল্লায় অবরোধ করার পর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশান্তর করে দেন। কেল্লার প্রধান নির্বাহী ইবনে

---

[২২৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২২ : ৫০।
[২২৭] ইতিহাস কি আবার ফিরে আসবে? : ৭৪-৭৫।

তাশকে হত্যা করেন।[২২৮]

৫২৩ হিজরী সনে ইসমাঈলিয়ারা দামেশক শহরটি এই মর্মে খ্রিস্টান ক্রুসেডারদেরকে হস্তান্তর করার চুক্তি করে যে, বিনিময়ে খ্রিস্টানরা তাদেরকে সূর শহর প্রদান করবে। দামেশকের আমীর বূরী ইবনে তাগতাকীন তাদের এই দূরভিসন্ধিমূলক প্রোপাগাণ্ডা বুঝে ফেলেন। ফলে তিনি ইসমাঈলীদের নেতা মারযুকানীকে হত্যা করেন। সারাদেশে বাতেনীদেরকে হত্যা করার নির্দেশ জারি করেন। তখন তাদের ছয় হাজার লোককে হত্যা করা হয়। এ সবই ঘটেছিল রমযান মাসে।[২২৯]

৫১১ হিজরীর ঘটনা সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল আসীর রহ. বলেন, সুলতান মুহাম্মদ আস সালাজুকী জানতেন যে, দেশ ও জনগণের কল্যাণ তখনই সাধিত হবে যখন বাতেনীদের কর্মতৎপরতা বন্ধ করা হবে। তাদের দেশ ও ক্ষমতা ছিন্নভিন্ন করা হবে। তাদের রাজত্ব ও দুর্গগুলো দখল করা হবে। নিজ শাসনামলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যাবতীয় কর্মতৎপরতা গ্রহণ করেন।

বাতেনীদের যাবতীয় বিষয়াসয় দেখভাল করতো হাসান বিন সাব্বাহ রাযী। সে 'আলমাউত' দুর্গের অধিপতি ছিলো। তার নেতৃত্বকাল ছিলো দীর্ঘতর। প্রায় ছাব্বিশ বছর সে কেল্লার মালিক ছিলো। তার সহচররা ছিলো খুবই দুরাচারী ও ভয়ংকর। তারা তার পক্ষে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো। সুতরাং সেনাপতি আনুশকীন এর নেতৃত্বে সুলতান তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন।

তখন তিনি তাদের কয়েকটি কেল্লা করায়ত্ব করতে সক্ষম হন। এরপর তিনি আলমাউত কেল্লার দিকে অগ্রসর হন। তাদেরকে কয়েক মাস যাবৎ অবরোধ করেন। পরিশেষে তারা নিরাপত্তা কামনা করে এবং কেল্লা ছেড়ে দেওয়ার অঙ্গিকার ব্যক্ত করে। কিন্তু এই মহান সেনাপতি তাদেরকে ধারাবাহিকভাবে অবরোধ করেই রাখেন। এরপর একদিন সংবাদ আসে যে, সুলতান মুহাম্মদ ইন্তিকাল করেছেন। তখন সেনাবাহিনী বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে তখন আর কেল্লা জয় করা সম্ভব হয়নি।[২৩০]

---

[২২৮] আল-কামিল : ১০ : ৪৩০।
[২২৯] খুতাতুশ শাম, মুহাম্মদ কুরদ আলী : ২: ৩; ইতিহাস কি আবার ফিরে আসবে? গ্রন্থ থেকে সংকলিত।
[২৩০] ইতিহাস কি আবার ফিরে আসবে? : ৭৫-৮১।

সুলতান সিনজারের শাসনামলে ৫২১ হিজরী সনে আলমাউত কেল্লায় পুনরায় বাতেনীদের সঙ্গে লড়াই হয়। তখন তাদের অসংখ্য লোক মৃত্যুবরণ করে।

এসব অপরাধীদের দমনের ফলে উবায়দিয়াদের সাম্রাজ্যের খুঁটি নড়বড়ে হয়ে যায়। ইসলামী বিশ্বে বাতেনীদের জায়গা সংকুচিত হয়ে যায়।

বাতেনীদের দমনে সালজুকি সালতানাতের এই বিরাট অবদানের পুরস্কার একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলাই দিতে পারেন। বাতেনীদের দমনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তারা মুসলিমবিশ্বকে এক গৌরবময় অধ্যায় উপহার দিয়েছেন।

**এগারো.**

দীনদারী, তাকওয়া, পরহেযগারীর অধিকারী, যুদ্ধ ও সমরবিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং শাহাদাতের পাগল একদল মহান নেতৃপুরুষের আত্মপ্রকাশ। এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন, জ্ঞানী আলেম, যুদ্ধের ময়দানে সাহসী সিপাহসালার, আমীর ইমাদউদ্দীন জিনকী। তিনি সর্বপ্রথম ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেছেন। মুসলমানদের মনে আস্থা ও নির্ভরতা ফিরিয়ে এনেছেন। জাযিরার শহর-উপশহর ও মসুল শহরকে একত্ববাদীদের শহরে পরিণত করেছেন। তিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন, ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে তাদের কাছে মুসলমানদের হারানো শহর-নগর ও কেল্লাসমূহ পুনঃউদ্ধার করেছেন।

দীনের এই মহান সৈনিক ৫২২ হিজরী সনে খ্রিস্টানদের হাত থেকে হালব শহর মুক্ত করতে সক্ষম হন। ৫৩২ হিজরী সনে রোম যখন এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আসে- তাদের সঙ্গে বিরাট সংখ্যক ফরাসী বাহিনীও ছিল তখন ইমাদ উদ্দীন জিনকী সুলতান ইবনে মুনকিয কিনানীর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে এই বিরাট খ্রিস্টানবাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন।

৫৩৪ হিজরী সনে ইমাদউদ্দীন জিনকী ফরাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় মুসলমান বাহিনী ধৈর্য ও নিষ্ঠার এমন উপমা পেশ করেন, যা কেবল কাদিসিয়ার যুদ্ধের ব্যাপারেই শোনা যায়। বিপুল যুদ্ধ-সংগ্রামের পর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেন। ফরাসী সম্রাট ও তার বাহিনী পালিয়ে যায়।

তার বিশেষ কীর্তি হলো, ৫৩৯ হিজরী সনে রুহা নামক শহর বিজয় করা। তার

অভিযানের মাধ্যমেই এই শহরটি মুসলমানদের শাসনাধীনে আসে। এটি ছিল খ্রিস্টানদের একটি মর্যাদাবান শহর। এরপর আশেপাশের দুর্গগুলোও বিজিত হয়। জাযিরা অঞ্চলও ফরাসীদের শাসন ও তাদের কূটষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি পায়।

ইমাদ উদ্দীন জিনকী রহ. তার এই সংস্কারধর্মী কর্ম শেষ করে যেতে পারেননি। জাযিরার উপকণ্ঠে ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত জাবার কেল্লা অবরোধ করার সময় একদিন তিনি ইন্তিকাল করেন।

তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শাসক, চারিত্রিক বিচারেও ছিলেন মহৎ-আদর্শবান। ছিলেন হকের পতাকাবাহী দীনের নিষ্ঠাবান উদ্যমী সৈনিক। কবি-সাহিত্যিকগণ তার অমর কীর্তির প্রশংসা করে কাব্য রচনা করেছেন। তিনি ৫৪১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন।

আমীর জিনকী রোমসাম্রাজ্য পরাহত করায় ভূমিকা রেখেছেন। তার এই অমরকীর্তির প্রশংসা করেছেন মুসলিম ইবনে খাদর ইবনে কুসাইম আল হামূরী। তিনি লিখেছেন,

بعزمك أيها الملك العظيم ✪ تذل لك الصعاب و تستقيم.

আপনার দৃঢ় প্রত্যয়ের কারণেই হে মহান শাসক! সমূহ কঠিন ব্যাপারও আপনার কাছে সহজ ও সুসংহত হয়ে যায়।

তিনি আরও লিখেছেন,

ألم تر أن كلب الروم لما ✪ تبين أنه الملك الرحيم

فجاء يطبق الفلوات خيلا ✪ كأن الجحفل الليل البهيم

وقد نزل الزمان على رضاه ✪ و دان لخطبه الخطب العظيم

فحين رميته بك في خميس ✪ تيقن أن ذلك لا يدوم

و أبصر في المفاضة منك جيشا ✪ فأحرب لا يسير و لا يقيم

كأنك في العجاج شهاب نور ✪ توقد وهو شيطان رجيم

أراد بقاء مهجته فولى ✪ و ليس سوى الحمام له حميم.

আপনি কি দেখেননি, যখন রোমের কুকুরের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সেই দয়ালু মালিক। তখন সে অনাবাদি ভূমিগুলো ঘোড়া দিয়ে এমনভাবে ভরে ফেললো– যেন দিগন্ত জুড়ে অন্ধকার রাত্রি ছেয়ে গেছে।

তার ভাবখানা এমন যে, তার ইচ্ছা-অভিপ্রায়েই যেন দিন রাত্রি হয়। তার কারণেই যেন বিরাট বিরাট আপদ-বিপদ দেখা দেয়।

আপনি যখন তাকে পাঁচ দিন অবরোধ করে রাখলেন, তখন সে নিশ্চিত হলো যে, নিশ্চয় তার রাজত্ব চিরস্থায়ী নয়।

আপনি আপনার সৈন্যদলের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তাদের নিয়ে যুদ্ধ করুন। তারা যেন এদিক সেদিক ছুটে না যায়।

আপনি যেন আধার রাতের জ্বলজ্বলে তারকা। আর সে হচ্ছে অভিশপ্ত শয়তান।

সে তার রাজত্ব পাকাপোক্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু সে পশ্চাদপদ হয়েছে। আর অগ্নিময় জাহান্নাম ছাড়া তার কোনো ঠিকানা নেই।[২৩১]

***

---

[২৩১] আল কামিল : ৭ : ২১-২২।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ

ইমাদুদ্দীন জিনকির মৃত্যুর পর জিনকি সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন তার পুত্র নূরুদ্দীন। তিনি তার পিতার সাথে ইরাকের মসূল ও সিরিয়া শহরে বসবাস করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তার স্থানে অধিষ্ঠিত হন। তিনি হালব শহরে শরীয়া শাসন প্রবর্তন করেন, বিদআত মূলোৎপাটন করেন, রাফেযীদের দমন করেন, অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, ওয়াফক-জায়গীর স্থাপন করেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বইপুস্তক পাঠ করতেন। বিশেষত হাদিস ও আছার পাঠে বেশি মনোযোগী ছিলেন। তিনি জামাতে নামায আদায়ে যত্নবান ছিলেন। কুরআন তিলাওয়াতে তৃপ্তিবোধ করতেন। নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। পরিমিত খরচ করতেন। খাবার-দাবার ও পোশাকাষাকে খুবই বাছ-বিচার করে চলতেন। তার মুখ থেকে কখনো কোনো অশ্লীল কথা শোনা যায়নি।[২৩২]

আল্লামা ইবনুল আছীর রহ. বলেন, আমি ইসলামের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের অনেক রাজা-বাদশাহ ও শাসকের জীবনী পড়েছি কিন্তু চার খলিফা ও হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. এর পর সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে পাইনি।[২৩৩]

তার খোদাভীতি ও দুনিয়াবিমুখতার অনন্য উপমা হলো, তিনি যা-ই খেতেন বা পরিধান করতেন তা নিজের জন্য বরাদ্দ গনীমতের অংশ বা সাধারণ ফাণ্ডের বাইরে তার জন্য বরাদ্দ ভাতার অর্থ দিয়েই ক্রয় করতেন।

একবার তার স্ত্রী ভরণপোষণ কম হওয়ার এবং কষ্টে-সৃষ্টে জীবন কাটানোর অভিযোগ করেন। একথা শুনে তার চেহারা লালে লাল হয়ে গেলো। তিনি বললেন, তোমার যত অর্থকড়ি দরকার তা আমি কোত্থেকে এনে দেবো? আল্লাহর কসম! প্রবৃত্তির লালসা মেটানোর জন্য আমি জাহান্নামের আগুনে যেতে পারবো না।

এরপর বললেন, হিমস শহরে আমার তিনটি দোকান রয়েছে। এগুলো আমাকে

---

[২৩২] আর-রাওযাতাইন ফী আখবারিদ দাওলাতাইন : ১: ৫।

[২৩৩] আর-রাওযাতাইন ফী আখবারিদ দাওলাতাইন : ১: ৫।

উপঢৌকন দেওয়া হয়েছে। যাও, তুমি সেগুলো নিয়ে নাও।[২০৪]

আল্লামা ইবনুল আসীর রহ. বলেন, তিনি রাতের বেলা অধিকহারে নামায, তিলাওয়াত ও যিকির-আযকার করতেন, আল্লাহর সকাশে তাওবা-ইস্তিগফার করতেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত হওয়ার আগ পর্যন্ত তার এ অভ্যাস চালু ছিল।

কবি কত সুন্দর বলেছেন।

جمع الشجاعة والخشوع لربه ÷ ما أحسن المحراب في المحراب.

আপন রবের জন্য তিনি সাহসিকতা ও ভয়-ভীতি একত্র করেছেন। তিনি মিহরাবে দাঁড়ালে তা কতই না সুন্দর হয়ে উঠতো! (অর্থাৎ নামায পড়তে দাঁড়ালে তা খুবই মনোমুগ্ধকর দৃশ্যে পরিণত হতো।)[২০৫]

তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ফিকহের অভিজ্ঞান রাখতেন। তার কাছে বাড়াবাড়ির কোনো স্থান ছিলো না; বরং সর্বক্ষেত্রে ন্যায়-ইনসাফের পক্ষাবলম্বন করাই ছিলো তার স্বভাব-প্রকৃতি। বাস্তবতা হলো, রাষ্ট্রনায়কের জন্য ন্যায়পরতা ও ইনসাফের সুন্নাহ অনুসরণের প্রথা তিনিই নতুনরূপে প্রবর্তন করেছেন। একইভাবে তিনি হারাম খাদ্য, পানীয় ও পরিচ্ছদ নিষিদ্ধ করেছেন। কেননা তার পূর্ববর্তী রাষ্ট্রনায়ক বা শাসকগণ প্রজা-সাধারণের সাথে জাহেলি যুগের ন্যায় আচার-ব্যবহার করতো। পেটপুঁজা ও যৌনলিপ্সা ছিলো তাদের সারাক্ষণের মনোবৃত্তি। অর্থকড়ি কামানোর ক্ষেত্রে তারা কোনো হক-না হক যাচাই-বাছাই করতো না। কিন্তু তিনি ছিলেন আদল-ইনসাফের গুণগরিমায় বিভূষিত একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক। যে কারণে তিনি নিজ দেশে কোনোরূপ ধোঁকা-প্রতারণা, অন্যায়-অনৈতিকতা প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি বরং সিরিয়া, জাযিরাতুল আরব ও মিসরের সর্বস্থানে সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়া ইত্যকার মন্দ ও হারাম কায়-কারবারগুলো নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।[২০৬]

তার ন্যায়পরতার অন্যতম নিদর্শন হলো, তিনি ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিশেষ বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর কারণ ছিলো, তার আমীর-উমারা ও সেনাপ্রধানরা প্রতিবেশি ও সহকর্মীদের উপর জুলুম অত্যাচার করতো। বিচারপতি কামালউদ্দীনের কাছে এ ব্যাপারে অসংখ্য অভিযোগ আসতো। তিনি

---

[২০৪] আল-কামিল : ৭: ২৪২।
[২০৫] আল-কামিল : ৭ : ২৪২।
[২০৬] আল-কামিল : ৭ : ২৪২।

তাদের বিচার গ্রহণ করতেন, তাদের পক্ষে ইনসাফের ফায়সালা করতেন। কিন্তু তিনি সেনাপতি আসাদউদ্দীন শেরকূহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেননি।

সুলতান নূরুদ্দীন যখন এ ঘটনা শুনতে পেলেন তখন তিনি বিশেষ জেলখানা নির্মাণ করেন এবং আসাদউদ্দীনকে তাতে আটক করে রাখেন।

এরপর তিনি তার নায়েবদের বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের কারো কারণে যদি আমাকে বিচারালয়ে উপস্থিত হতে হয় তবে আমি অবশ্যই তাকে শূলে চড়াবো। সুতরাং তোমাদের যার সাথে যার বিরোধ আছে তা আপসে দ্রুত মিটিয়ে ফেলো। অপরপক্ষকে দ্রুত সন্তুষ্ট করে দাও।

নায়েবরা জবাবে বললো, আমরা এরূপ করতে গেলে তো সাধারণ মানুষ বেশি লাই পেয়ে যাবে। তারা অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করবে।

তিনি বললেন, মানুষ নূরুদ্দীনকে জালেম বা অত্যাচারী প্রতিপন্ন করার চেয়ে আমার রাজত্ব চলে যাওয়া আমার পক্ষে খুবই সহনীয়।

তিনি সপ্তাহের দুদিন এই বিচারালয়ে বসতেন। যখন তিনি সেনাপতি আসাদউদ্দীন শেরকূহের মামলায় ফায়সালা শুনতে পেলেন তখন তিনি আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ সিজদা প্রদান করেন।

ইসলামী রাষ্ট্রে তার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিধি ব্যাপক। তিনি সিরিয়ার চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। রাষ্ট্রীয় অফিস-আদালত নির্মাণ করেছেন। দীনের সেবকরা তার কাছে সর্বোচ্চ সম্মাননা পেতেন। এ কারণে তার আমীর-উমারারা তাদেরকে হিংসা করতো।

একবার একজন আমীর শায়খ কুতুবুদ্দীন নিসাপুরী রহ. এর ব্যাপারে সুলতানের কাছে আপত্তিকর মন্তব্য করলো। সুলতান তাকে বললেন, আরে বোকা! তুমি যার বিরুদ্ধে কথা বলো তার তো এমন অনেক পুণ্য কাজ রয়েয়ে– যা তার সকল স্খলন ও বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়। আর তা হলো, ইলম ও দীনদারী। আর তুমি ও তোমার মতো লোকদের মাঝে তুমি যে অভিযোগ করেছো– তার দ্বিগুণ অভিযোগ-আপত্তি বা দোষ-বিচ্যুতি তোমার রয়েছে। তোমাদের এমন কোনো পুণ্যকর্ম নেই– যা সেগুলো মার্জনা করে দেবে। আমি তোমাদের ভালো কাজ ছাড়া মন্দ কাজের দায়ভার বহন করে চলেছি। তাহলে তুমি যে অভিযোগ করেছো, তা যদি সত্যও হয় তা কি আমি ক্ষমাযোগ্য দৃষ্টিতে দেখবো না! অথচ আল্লাহর কসম! তুমি যে অভিযোগ করেছো, সে ব্যাপারে

আমি তোমাকে সত্যবাদী মনে করি না। তুমি যদি পুনরায় তার ব্যাপারে আমার কাছে কোনো অভিযোগ করো তবে তোমাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে।[২০৭]

তার চারিত্রিক পবিত্রতা ও তাকওয়া-তাহারাতের অন্যতম নিদর্শন হলো, তার কাছে যে জিনিসই হাদিয়া দেওয়া হতো- তিনি তাতে বিন্দুমাত্র স্পর্শ না করে কাজি বা বিচারপতির দরবারে পাঠিয়ে দিতেন। তারা সেগুলো বিক্রি করে অর্থ পরিশোধ করলে তিনি সে অর্থ দিয়ে ভগ্ন মসজিদসমূহ পুনঃসংস্কার করে দিতেন।[২০৮]

সুলতান নূরুদ্দীন রহ. এর বিরুদ্ধে যত কঠোর ও মারাত্মক সমালোচনাই করা হতো তিনি তা প্রশস্ত হৃদয়ে গ্রহণ করতেন। এর অন্যতম একটি উপমা হলো, তার যুগের খ্যাতনামা নেককার ওয়ায়েয আবু উসমান মুনতাখাব বিন আবু মুহাম্মাদ আল ওয়াসেতি একবার জিনকি প্রশাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। কেননা তারা স্বয়ং নূরুদ্দীনের উপস্থিতিতে রাজস্ব ও মূসক আদায় করেছে। তখন তিনি নূরুদ্দীনকে এসব কর্মকাণ্ডে উপস্থিত হতে সতর্ক ও সাবধান করেন এবং নূরুদ্দীনের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন :

مثل وقوفك أيها المغرور ✪ يوم القيامة والسماء تمور.

*হে আত্মপ্রবঞ্চক! কিয়ামতের দিন তোমার উপস্থিতি তো খুবই নগণ্যতুল্য। সেদিন আসমান দুলতে থাকবে।*

إن قيل نور الدين رحت مسلما ✪ فاحذر بأن تبقى وما لك نور.

*যদি বলা হয়, নূরুদ্দীন মুসলিম ছিল। তবে তুমি সতর্ক হও এই ভেবে যে, একদিন তুমি অনিঃশেষ হবে এবং তোমার কোনো নূর বা আলো থাকবে না।*

أنهيت عن شرب الخمور و أنت في ✪ كأس المظالم طائش مخمور.

*তুমি কি মদ পান নিষেধ করেছো? অথচ তুমি অন্যায়ের পাত্রে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে মদমত্ত?*

عطلت كاسات المدام تعففا ✪ و عليك كاسات الحرام تدور.

*তুমি চারিত্রিক পবিত্রতার ভয়ে সামনাসামনি মদের পাত্র স্পর্শ করছো না, অথচ*

---

[২০৭] আল-কামিল : ১ : ৮-৯।
[২০৮] তারিখু ফাতহিল আরাবি : ২১৩।

তোমার আশেপাশে অসংখ্য হারাম বিষয় ঘুরছে-ফিরছে।

ماذا تقول إذا نقلت إلى البلى ✪ فردا وجاءك منكر و نكير.

তুমি কী বলবে সেদিন, যখন তোমাকে একাকী অন্ধকার কবরে শোয়ানো হবে? এবং মুনকার-নাকীর ফেরেশতা এসে (তোমার অপকর্মের) ব্যাপারে নানান প্রশ্ন করবে!

ماذا تقول إذا وقفت بموقف ✪ فردا ذليلا والحساب عسير؟

তুমি কী বলবে সেদিনের ব্যাপারে, যখন তুমি লাঞ্ছিত অপদস্থ হয়ে একাকী দাঁড়িয়ে থাকবে, আর তোমার হিসাব হবে কঠিন ও মারাত্মক?

وتعلقت فيك الخصوم و أنت في ✪ يوم الحساب مسلسل مجرور.

হিসাবের দিনে বাদী পক্ষের লোকেরা তোমার ব্যাপারে নানান অভিযোগ করবে। তুমি তখন থাকবে আইনের হাতে অপরাধী ও বন্দী।

وتفرقت عنك الجنود و أنت في ✪ ضيق القبور موسد مقبور.

সৈন্যবাহিনী তোমার থেকে দূরে সরে যাবে। সংকীর্ণ কবরে তুমি একাকী ভগ্নহৃদয়ে শুয়ে থাকবে।

ووددت أنك ما وليت ولاية ✪ يوما و لا قال الأنام أمير.

আমি কামনা করছি, তুমি সেদিন কোনো রাজত্বের বড়াই করতে পারবে না। আর মানুষও তোমাকে আমীর বলে ডাকবে না।

وبقيت بعد العز رهن حفيرة ✪ في عالم الموت وأنت حقير.

সম্মান-মর্যাদাবান হওয়ার পর তুমি কবরজগতে থাকবে ভাগ্যের হাতে বন্দী। তুমি সেখানে থাকবে হীন-তুচ্ছ অবস্থায়।

وحسرت عريانا حزينا باكيا ✪ قلقا وما لك في الأنام مجير.

সেখানে তুমি রাত যাপন করবে উলঙ্গ, বিষণ্ন, ক্রন্দনকারী ও বিমর্ষ হয়ে। মানুষের মাঝে কেউ তোমাকে সে অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারবে না।

أرضيت أن تحيا و قلبك دارس ✪ عافي الخراب و جسمك المعمور.

তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, তুমি জীবিত থাকবে এবং তোমার অন্তর

*পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে সারাক্ষণ শিক্ষা গ্রহণ করবে? তোমার কোনো দুঃশ্চিন্তা থাকবে না, তোমার শরীর-স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে?*

أرضيت أن يحظى سواك بقربه ✪ أبدا و أنت معذب مهجور.

*তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, তোমার সুখ-আনন্দ সর্বদা অন্য কেউ ভোগ করবে, আর তুমি থাকবে নির্যাতিত ও সুখবঞ্চিত?*

مهد لنفسك حجة تنجو بها ✪ يوم المعاد و يوم تبدو العور.

*সুতরাং তুমি তোমার জন্য এমন পুণ্য-পাথেয় প্রস্তুত করে নাও, যদ্দারা তুমি চিরস্থায়ী দিবসে এবং এমন দিবসে মুক্তি লাভ করবে, যেদিন সকল ভেদ-রহস্য উন্মোচিত হয়ে যাবে।*

সুলতান এই কবিতা শুনে খুবই কাঁদলেন। পরে তিনি সারাদেশে জনগণের কাছ থেকে রাজস্ব কর ও মূসক গ্রহণ না করার নির্দেশ দিলেন।[২৩৯]

তিনি সারাদেশে লোকদের কাছে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন, তাদের কাছে যে সব কর নেওয়া হয়েছে তা যেন তারা উদার মনে ক্ষমা করে দেয়। তিনি আরও বললেন, এসব কর নেওয়া হয়েছে মূলত কাফের-মুশরিকদের হাত থেকে তাদের দেশ, নারী-স্ত্রী ও সন্তানাদির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দানের জন্য।

অনুরূপ চিঠি তিনি তার প্রশাসকবৃন্দ ও তার সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশসমূহে প্রেরণ করেন। তিনি ওয়ায়েযকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন ব্যবসায়িদের কাছ থেকে কর নেওয়ার ব্যাপারটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

সুলতান নূরুদ্দীন রহ. সিজদায় পড়ে বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি উশর ও মূসক আদায়কারী জালেম মাহমূদ কালবকে রহম করুন।[২৪০]

তিনি অনুদান প্রত্যাশীদের কপটতা ও নমো নমো মনোভাবকে খুবই ঘৃণা করতেন। এর অন্যতম উপমা হলো, তিনি মসজিদের খতীবদেরকে এমন চটকদার বাক্যে ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় তার নামে গুণকীর্তন করে দুআ করতে নিষেধ করেন, যার দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল শাসকদের মনোতুষ্টি অর্জন করা। এ কারণে একবার তিনি খতীব খালিদ বিন মুহাম্মদ বিন নসর কায়সানীকে এরূপ দুআ করতে দেখে দুআ বন্ধ করে দেন। তিনি তাকে পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে

---

[২৩৯] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২: ৩০২।
[২৪০] নূরুদ্দীন মাহমূদ, ড. হোসাইন মুনিস কৃত : ৪০০।

সুসামঞ্জস্য বজায় রেখে বাস্তবসম্মত দুআবাক্য লিখে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। তখন তিনি নিম্নোক্ত দুআ-ভাষ্য লিখে আনেন,

اللَّهُمَّ أصلح عبدك الفقير إلى رحمتك، الخاضع لهيبتك، المعتصم بقوتك، المجاهد في سبيلك، المرابط لأعداء دينك : أبا القاسم محمود بن زنكي بن آق سنقر ناصر أمير المؤمنين.

হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দার অবস্থা সংশোধন করে দিন, যে আপনার করুণার ভিখারী। আপনার প্রভাবে ভীত-শঙ্কিত। আপনার শক্তি-ক্ষমতার আশ্রয় গ্রহণকারী। আপনার পথে সংগ্রামকারী। আপনার দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সংগ্রামে নিরত। আর সে হচ্ছে, আমীরুল মুমিনীন আবুল কাসেম মাহমুদ বিন জিনকি ইবনে আক সিনকার নাসির।

সুলতান নূরুদ্দীন রহ. উক্ত দুআ-বাক্য পাঠ করে তাতে আরও কয়েকটি বাক্য সংযোজন করে দেন। যা নিম্নরূপ,

এই দুআর বাক্য দ্বারা আমার উদ্দেশ্য, যেন মিম্বরে বসে মিথ্যা কথা বলা না হয়। আমার পক্ষে যেসব মন্তব্য করা হয়, আমি তার উপযুক্ত নই। আমি যা করিনি তা করেছি বলে শুনতে পেলে আমি কি খুশি হবো? অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী হয়ে থাকে। তুমি যা লিখেছো তা ভালোই হয়েছে। তুমি এর অনেকগুলো কপি করো। যাতে আমরা সারাদেশে তা পাঠিয়ে দিতে পারি।

এর সাথে তিনি আরও সংযোজন করে দিলেন। এরপর এই দুআ করবে,

اللَّهُمَّ أره الحق حقا، اللَّهُمَّ أسعده، الله فقهه...

হে আল্লাহ! আপনি তার সম্মুখে সত্য পরিস্ফুট করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাকে সৌভাগ্যবান করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাকে সহায়তা করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাকে দীনের বুঝ ও প্রাজ্ঞতা দান করুন। ... এরূপ আরও অনেক বাক্য সংযোজন করলেন।[২৪১]

একবার সুলতান নূরুদ্দীনের কাছে দাবী জানানো হলো, তিনি যেন আমীর-উমারাদেরকে প্রশাসনিক ও বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করেন। কেননা দেশে

---

[২৪১] প্রাগুক্ত : ৪০০-৪০১।

চোর-ডাকাত, দস্যু ও বিদ্রোহীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। তাদেরকে প্রশাসনিকভাবে দমন-পীড়ন করার সুযোগ থাকা দরকার। যেমন হত্যা, শূলিতে চড়ানো এবং দণ্ডবিধিমূলক শাস্তি প্রদান করা। কেননা যদি কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয় তবে কে সাক্ষ্য দিতে আসবে?

যখন সুলতানের কাছে এই ধরনের দাবি সংবলিত পত্র পৌঁছল তখন তিনি পত্রটি উল্টিয়ে অপর পাশে লিখলেন,

আল্লাহ তাআলা আপন সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাদের কল্যাণ-অকল্যাণের দিক দেখভাল করেন। তারা কল্যাণপ্রাপ্ত হয় শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে। তিনি যদি মনে করেন, শরীয়তের বিধিবিধান পালনের বাইরেও অতিরিক্ত কিছু করলে কল্যাণ পাবে তবে তিনি আমাদের জন্য তা সুনির্ধারিতভাবে করে দিতেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য শরীয়তের যেসব বিধিবিধান নির্ধারণ করেছেন তার বাইরে অতিরিক্ত কোনো বিধান তৈরির প্রয়োজন নেই। যে প্রয়োজন আছে বলে মনে করবে, সে যেন প্রকারান্তরে এই দাবি করলো যে, শরীয়তের বিধিবিধান অপূর্ণাঙ্গ। সে এখন তার পূর্ণাঙ্গতা বিধান করছে। আর এরূপ মনোভাব আল্লাহ ও তার শরীয়তের বিরুদ্ধে ধৃষ্টতা দেখানোর নামান্তর।

এরূপ মনোভাবের অধিকারীরা কখনো সুপথপ্রাপ্ত হয় না। আল্লাহ আমাদেরকে ঐশীগ্রন্থ আল কুরআন ও সীরাতে মুস্তাকীমের দিকে পথ প্রদর্শন করুন।

অপরাপর আমীর-উমারাদের পক্ষে যিনি উক্ত দাবিনামা সুলতানের কাছে প্রেরণ করেছিলেন তার নাম শায়খ উমর। যখন সুলতানের জবাবীপত্র তার হাতে পৌঁছল তখন তিনি মসূলবাসীকে সমবেত করেন এবং তাদের সম্মুখে উক্ত জবাবী পত্রটি পাঠ করে বললেন, আপনারা সাম্রাজ্যবিরাগী সুলতান ও সাম্রাজ্যপ্রত্যাশী আমীরের চিঠি পর্যালোচনা করে দেখুন![২৪২]

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুলতান নূরুদ্দীন মাহমুদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে কথা উল্লেখ করা হলো। যাতে পাঠকগণ একথা অনুধাবন করতে পারেন যে, মহান আল্লাহ তাআলা যাকে সম্মানিত করেন তাকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত যোগ্যতা ও গুণাবলি দান করেন এবং তাকে নিজ দয়া ও করুণার চাদরে ঢেকে নেন।

---

[২৪২] আল কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ, ইবনে কাজি শাহবাহ কৃত : ২৫-২৬।

সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের সাম্রাজ্যের কিছু বিশেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল। আমি অধ্যয়নের সময় সবচে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে যেসব বিষয় নির্ধারণ করতে পেরেছি তা নিম্নরূপ :

এক. জাতিকে ইসলামি ভাবদর্শনের আলোকে গড়ে তোলা এবং বাতেনীদের বিকৃত চিন্তাধারা, ইউনানী দর্শনের কুপ্রভাব, ইবাদত ও শরয়ী নিদর্শন ও প্রতীকসমূহের ব্যাপারে উবায়দিয়া সম্প্রদায়কে অহেতুক বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত করে তাদের ব্যক্তিজীবনকে দীনি সভ্যতা-সংস্কৃতি লালনে পূতঃপবিত্র করে তোলা। এই মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্র অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে এবং জায়গায় জায়গায় কুরআন-সুন্নাহর চর্চা ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র তৈরি করে। তারা জ্ঞানী ও উত্তম চরিত্র মাধুরীর অধিকারী প্রসিদ্ধ আলেম-উলামাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। বিশেষত যারা গাযালী দর্শন ও কাদরিয়্যা ধ্যান-ধারণার চর্চাকারী প্রতিষ্ঠান থেকে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেছেন। সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের যুগে দীনি শিক্ষাদীক্ষা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে উন্নতির এতোটাই উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিল, যা তৎকালীন আলেম-উলামাগণ একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া তার আমলে যে ধারার শিক্ষাদীক্ষা প্রচলিত ছিল তা কুরআন-সুন্নাহর মানদণ্ডে যথাউত্তীর্ণ ছিল। মসজিদ-মাদরাসাগুলো মূলত এ যুগেই সর্বাধিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। বলা হয়, তখন কেবল দামেশক শহরেই একশ মসজিদ ছিল।

তৎকালীন সময়ে ইসলামী শিক্ষাধারা স্বকীয় গতিতে চলার বিপুল সহযোগিতা লাভ করেছে। বিশেষত তখনই নববী শিক্ষা ও আদর্শ বিপুলভাবে চর্চা ও আদৃত হয়েছে। একই সাথে ইসমাঈলী সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণা এবং দর্শনবিদ্যাগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় মোকাবিলা করা হয়েছে। যা তৎকালীন সময়ে জনসাধারণের মনে, তাদের আচার-অভ্যাসে, তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইবনে জুবাইর সেসব উপাখ্যান উল্লেখপূর্বক বলেন,

তাদের অবস্থা ছিল এমন যে, তাদের কোনো দীন-ধর্ম ছিলো না। তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করতো কিংবা বিদআতের প্রচার-প্রসার করতো। তবে আল্লাহ যাকে রক্ষা করেছেন– সে ব্যতীত। জিনকি সাম্রাজ্য তাদের অধিভুক্ত উবায়দিয়া অঞ্চলের সর্বত্র উবায়দিয়া সম্প্রদায়ের বাতিল কর্মকাণ্ড প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করে। তারা তাদের প্রচলিত আযানের حي على خير العمل বাক্য বলতে নিষেধ করে এবং সাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তারা এই

ব্যাপারগুলো মারাত্মক অপরাধ আখ্যায়িত করে। আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শী আলেম-উলামাগণ অনুগত সৈনিকের ন্যায় জিনকি সাম্রাজ্যের সাথে ছিলেন। ইসমাঈলিয়্যাহ বাতেনিয়া উবায়দিয়া বিশেষ করে শিয়া মতাদর্শীদের জন্য জনসাধারণের সম্মুখে বয়ান দেওয়া নিষিদ্ধ ছিলো। এতে করে তাদের মন সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এরপর তারা জিনকি সাম্রাজ্যের ধরপাকড়ের ভয়ে সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা থেকে বিরত হয়ে যায়।[২৪৩]

শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ফকীহ কুতুবুদ্দীন নিসাপুরী খোরাসানী সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের শাসনামলে সুন্নাহ পুনরুজ্জীবিতকরণে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। একইভাবে ইবনুশ শায়েখ আবু নাজীব বাগদাদী জিনকি সাম্রাজ্যের একজন বড় মাপের হর্তাকর্তা ছিলেন। ইস্পাহান থেকে শায়খ শারফুদ্দীন আবদুল মুমিন ইবনে শাওরাদাহ এই জিনকি সাম্রাজ্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

সুলতান নূরুদ্দীন নিজ সালতানাতের রাজনৈতিক মনোবৃত্তি প্রকাশ করেছেন নিম্নোক্ত ভাষ্যে,

ما أردنا ببناء المدارس إلا نشر العلم و دحض البدع من هذه البلدة و إظهار الدين.

আমরা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছি কেবল দীনি ইলম প্রচার-প্রসার করার জন্য এবং এই ভূখণ্ড থেকে বিদআত মূলোৎপাটন করার জন্য এবং দীনের শান ও মর্যাদা বুলন্দ করার জন্য।

তিনি তার উযির, আমির ও সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র নির্মাণ এবং তাতে জন সাধারণের ব্যাপক সম্পৃক্তি ও পড়াশোনার অবারিত সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য বিপুলভাবে উৎসাহিত করতেন।

সাধারণ প্রান্তিক মুসলমান, যেমন শ্রমিক, চাষী ও ব্যবসায়ীদের দিকেও জিনকি সাম্রাজ্যের সজাগ দৃষ্টি ছিলো। তারা তাদেরকে দিকনির্দেশনা দান এবং শিক্ষিত করে তুলতেও কর্মসূচি প্রদান করেছিলেন। এর মাধ্যমে তারা তাদের অন্তরে

---

[২৪৩] বিস্তারিত দেখুন, আল কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ, বদরুদ্দীন ইবনে কাজি শাহবাহ কৃত। মাহমুদ যায়েদ তাহকীককৃত নুসখা। যা ১৯৭১ খ্রি. সালে দারুল কুতুবিল জাদিদ, বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বীনের স্বচ্ছ আকিদা ও বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিশেষ করে শায়েখ আবদুল কাদির জিলানী রহ.-এর অন্যতম আধ্যাত্ম সাধনা ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মপদক্ষেপ সাধারণ মানুষের মনে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো। জিনকি সাম্রাজ্য এই কাদিরিয়্যাহ তরীকার মাধ্যমেই সমাজে আত্মশুদ্ধিমূলক সংস্কারে বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এর জন্য তারা অসংখ্য ইসলাহী মারকায বা খানকাহ তৈরি করে দেন। এই তরীকার পীর-মাশায়েখদেরকে ভক্তি-সম্মানকরত তাদেরকে সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। এর মাধ্যমে তারা আপন ইশতিহার অনুসারে সাধারণ মানুষের মন মেজায ও চিন্তা-চেতনা সংস্কারে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। একই সাথে তারা দীনি শিক্ষাদীক্ষা ও তালিম-তরবিয়্যতে সমৃদ্ধ একদল দক্ষ ও চৌকস সেনাবাহিনীও প্রস্তুত করেন। তারা তাদের অনুসারীবৃন্দকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং তাদের অন্তরে জিহাদের জযবা ও অনুপ্রেরণা তৈরি করে দেন। তাদের এসব সংস্কার ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হতো দুটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে। যথা :

ক. জন সাধারণকে মনস্তাত্তিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করা।

খ. তাদেরকে সেনা প্রশিক্ষণ দান করা।

জিনকি সাম্রাজ্যের প্রধান শাসক সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ জিহাদ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

উলামা-ফুকাহা, মুরুব্বী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গরা অন্যান্য সাম্রাজ্যের বা রাষ্ট্রের জাতীয় পরিষদে অধিভুক্ত হয়ে এই মিশনের নীতি ও আদর্শ প্রচার-প্রসার করেন। তাদের চেষ্টা-পরিশ্রমের মাধ্যমে নূরী সালতানাতের সর্বত্র একই রীতিনীতি ব্যাপকভাবে প্রচলন হয়।

সার্বজনীন উদ্যোগ ও একতার কারণে জিনকি সাম্রাজ্য সকল আলেম-উলামাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ফলে তারা ইসলামী ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হিজরত করে জিনকি সাম্রাজ্যে আগমন করেন। তারা এসে এখানকার সুসমন্নীত ইসলামী পতাকাতলে সমবেত হন। তাদের সংখ্যা হাজারের কোটা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই সাম্রাজ্যও তাদের নীতি আদর্শের দ্বারা বিরাটভাবে উপকৃত হয়। ইতিহাসের পাতায় এখানে প্রতিষ্ঠিত হাজার হাজার মাদরাসা ও কুরআন-হাদিস চর্চাকেন্দ্র, অসংখ্য খানকাহ ও সরাইখানার কথা পাওয়া যায়। যেগুলোতে উপর্যুক্ত নীতি-আদর্শের চর্চা হতো

সুনিবিড় তত্ত্বাবধানে। সুলতান নূরুদ্দীন জিনকির সরাসরি পর্যবেক্ষণের কারণে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়। সর্বক্ষেত্রে পরিকল্পিত নীতি-আদর্শ বাস্তবায়নের ফলে অল্প সময়ের ভেতরেই সিরিয়ার প্রাচীন অবস্থায় পরিবর্তন আসতে শুরু করে। নতুন প্রজন্ম এই নীতি-আদর্শের আলোকেই বেড়ে ওঠে এবং সমাজ ও পরিবারের জন্য তারা কল্যাণকামী সেবকে পরিণত হয়। জীবনের সর্বব্যাপী কার্যক্রমেই তারা সংস্কারধর্মী মনমানসিকতা লালন করতে থাকে। যার ফলে তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় এই জাতির বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলার বাণী যথার্থরূপে প্রতিভাত হয়। তিনি ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ.

আল্লাহ্ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।[২৪৪]

## দুই.

জিনকি সাম্রাজ্য নিজেদের যাবতীয় ইচ্ছা-অভিপ্রায়কে ইসলামী আদর্শের রঙে রঙিন করতে চেয়েছে এবং রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বকে শরয়ী বিধিবিধান ও মর্মবোধের আলোকে পরিচালিত করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছে।

একারণে দেখা যায়, সুলতান নূরুদ্দীনের কর্মঠ সহযোগী ও বাহিনীপ্রধানদের প্রত্যেকেই ছিলেন বিপুল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত আচার-আখলাকের অধিকারী। এর অন্যতম উপমা হলেন তারই উযির আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল কাসিম আশ শাহরাযূরী। তিনি ছিলেন একজন সহজাত প্রতিভাধর ফকীহ এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী। যেমন তিনি দূতাবাস, মন্ত্রণালয়, ওয়াকফ স্টেটের ব্যবস্থাপক, অর্থ ও বিচার বিভাগের নীরিক্ষক। তিনি সুলতান সালাহউদ্দীনের শাসনামলের আগ পর্যন্ত এসব বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন।[২৪৫]

আরেকজন হলেন, আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ ইবনে আবী ইসরূন। তিনি

---

[২৪৪] সূরা রাদ : ১১।

[২৪৫] দেখুন, তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ, ইমাম সুবকী রহ: ৬ : ১৪৮।

দামেশকের বিচারপতি ছিলেন। ওয়াক্ফ স্টেটের পরিদর্শক ছিলেন।[২৪৬]

এমনিভাবে সালাহউদ্দীন ছিলেন একজন গুণধর ফকীহ। তিনি ফিকহে শাফেয়ী আত্মস্থ করেছিলেন। একই সাথে তিনি আবু তাহির সালাফী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের কাছে হাদিসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তার থেকে অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু মানুষ হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন, ইফনুস বিন মুহাম্মদ আল ফারাকী ও ইমাদ আল কাতিব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। বলা হয়, তিনি কুরআনে কারীম হিফয করতেন। পাশাপাশি ফিকহের জন্য التنبيه এবং পদ্য ও কাব্য শাস্ত্রের জন্য الحماسة মুখস্থ করতেন।[২৪৭]

একইভাবে তার সুখ্যাত উযির, কাতিব ও উপদেষ্টা মহামতি বিচারক আবদুর রহীম ইবনে আলীর নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুলতান সালাহউদ্দীন রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন, আমি দেশসমূহ কেবল আমার তরবারির জোরেই বিজয় করিনি। এর সাথে সাথে মহামতি বিচারকেরও পরামর্শ ছিল। তিনি রাজনৈতিক কূটকৌশলগুলো খুবই ভালো বুঝতেন। একইসাথে তিনি অধিক পরিমাণে নামায, রোযা ও কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি অসম্ভব বিনয়ী ছিলেন। বেশি বেশি রোগিদের সেবা করতেন, তাদের দেখতে যেতেন। গরিব-দুঃখীদেরকে দান-সদকা করতেন। এই গুণী ব্যক্তি জনসাধারণের ভাগ্য পরিবর্তনে ও তাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে সমূহ পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে খুবই দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। রাষ্ট্রের ভেতর ও বাইরের কত দুর্যোগ ও গোলযোগ যে তিনি সফলভাবে মোকাবিলা করেছেন– তার ইয়ত্তা নেই। নিম্নে তার দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো,

**এক.**

বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে পারঙ্গমতা। তার নেতৃত্ব ও দেশ পরিচালনায় সমূহ সংকট ও ঝুঁকি ছিল। কিন্তু সেগুলো উত্তরণে তিনি যে বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা সকলের কাছে নির্ভরযোগ্য করে তুলেছিল। তিনি যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আলেম-উলামা, জ্ঞানী-পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। সুলতান নূরুদ্দীনের একটি উলামা পরিষদ ছিল। এতে দেশের বাহিনী প্রধান ও সেনাসদস্যরা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের সাথে বসে মতবিনিময় করার সুযোগ লাভ করতো। এখানে

---

[২৪৬] প্রাগুক্ত : ৪ : ২৩৭।
[২৪৭] প্রাগুক্ত : ৭ : ৩৪।

বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণই প্রথম কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।[২৪৮]

দুই.

রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির একক চিন্তা বাদ দিয়ে শূরা বা শূরার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছিল সুলতান নূরুদ্দীনের প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই শূরায় রাষ্ট্রের যাবতীয় বিষয়ে চিন্তা-বিনিময় করা হতো। তার একটি ফিকহ বোর্ড ছিল। যার সদস্যরা সকল মাযহাব ও সূফীবাদের মাঝে শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্তগুলো রচনা ও সংকলন করে দিতেন। তারা প্রশাসন ও বিচার বিভাগ নিয়ে কাজ করতেন। সুতরাং যখন তারা সমগ্র জাতির প্রয়োজনীয় কোনো বিষয় তত্ত্ব-তালাশ করতেন কিংবা জনমানুষের কল্যাণে উপযোগী আসবাব বা অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনবোধ করতেন তখন তারা তা এই মজলিসের সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করতেন এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তারা এ বিষয়ে প্রত্যেকের কাছে স্ব স্ব জ্ঞান-অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করতেন। পরিশেষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যে ফায়সালা গ্রহণ করা হতে তা নিয়ে কেউ মতবিরোধ করতো না।

এরূপ একটি ঘটনার উপমা হলো, ১১ই জুলাই ১১৪৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবিক ১৯ই সফর ৫৫৪ হিজরী সনে সুলতান নূরুদ্দীন দামেশকের কেল্লায় একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। তিনি এই সভায় নেতৃস্থানীয় বিচারপতি, রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সহযোগী ও ন্যায়ের পতাকাবাহী অসংখ্য গুণী ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত প্রদান করেন। যাতে তারা সম্মিলিতভাবে জামে উমাভির ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। জামে উমাভির শায়েখগণ ইতোপূর্বে ওয়াকফের মাঝে জন সাধারণের কল্যাণে ব্যবহৃত অনেক ভূসম্পত্তি ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। সুলতান নূরুদ্দীন রহ. এসব সম্পত্তিগুলোকে ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে আলাদা করার সিদ্ধান্ত নেন। যাতে জনকল্যাণের সম্পদগুলোকে মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে সৈন্যবাহিনী গঠনে ও তাদের পরিপালনে এবং দামেশকের দুর্গ-প্রাচীর নির্মাণে ব্যবহার করা যায়। কেননা সুলতান নূরুদ্দীনের দৃষ্টিতে এটাই ছিলো জনকল্যাণের সবচে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তখন মজলিসের সকলে সুলতানের ইচ্ছার বিপরীতে ঐকমত্য পোষণ করেন। তারা তাকে ওয়াকফের উদ্বৃত তহবিল থেকে মুসলমানদের সুরক্ষায় দুর্গপ্রাচীর নির্মাণেও অনুমতি দেননি; বরং বললেন, আপনি এই উদ্বৃত অর্থ ওই কল্যাণমূলক কাজে

---

[২৪৮] সালাহউদ্দীন : ২২৫।

ব্যবহারের জন্য করয বা ঋণ গ্রহণ করবেন এবং পরে তা বায়তুল মাল থেকে পরিশোধ করবেন। ওই সময় রাষ্ট্রকে বহির্শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচানোর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার লক্ষ্যে ওই অর্থ বিনা দায়ে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন সত্ত্বেও নূরুদ্দীন মজলিসের সকলের সর্ববাদি সিদ্ধান্ত মেনে নেন। তিনি ধর্মীয় জ্ঞানে ঋদ্ধ পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে জামে উমাভির ওয়াকফ সম্পত্তির উদ্ধৃত তহবিল থেকে কোনো অর্থ গ্রহণ করেননি।[২৪৯]

তিন.

এই সাম্রাজ্যের অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, জনসাধারণের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে যুগ যুগ ধরে চলে আসা জনসাধারণের পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও মামলা-মোকাদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তি করে দেওয়া হতো।

চার.

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে অত্যাবশ্যক দায়িত্ব ও কর্মসূচি পালনে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দেওয়া দীন ও শরীয়তের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল এমন দৃঢ়তর– যা তাদের উন্নত নীতি-আদর্শ চর্চার পরিচায়ক। দীনের প্রতি তাদের এই প্রবল ভালোবাসার কারণেই শাসক ও প্রশাসকবৃন্দ নিজেদের নাম ধারণ করতেন, ইমামুদ্দীন, সাইফুদ্দীন, মুঈনুদ্দীন, নূরুদ্দীন, সালাহউদ্দীন, আসাদউদ্দীন, নাজমুদ্দীন, যাইনুদ্দীন। আর শিয়াগণ দুনিয়ার প্রতি আসক্ত থাকার কারণে নিজেদের নাম ধারণ করতো, আসাদ উদ্দৌলা, বাহাউদ্দৌলা, সিমামুদ্দৌওলা।

সুলতান নূরুদ্দীনের প্রসাশনিক কর্মকর্তারা রণাঙ্গনে ও যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুবরণ করা পছন্দ করতেন। কেউ তা না পারলে অসিয়ত করে যেতেন, যেন তাকে মদীনা মুনাওয়ারায় দাফন করা হয়। এরূপ যারা করেছেন তাদের অন্যতম হলেন, জামালুদ্দীন আল মুসিলী, আসাদ উদ্দীন শেরকুহ, তার ভাই সুলতান সালাহ উদ্দীনের পিতা নাজমুদ্দীন।[২৫০]

---

[২৪৯] নূরুদ্দীন মাহমুদ, ড. হোসাইন মুনিস কৃত : ৪০৪-৪০৫।

[২৫০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২: ২৭২।

## সিরিয়া ও মিসরের অঞ্চলসমূহে ঐক্যের সুবাতাস

সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের রাজনৈতিক মিশন ছিলো, মুসলমানদেরকে একই নেতৃত্বে ও একই নীতিআদর্শের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করা। এ কারণে তিনি হালব, রুহাসহ অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোকে দামেশকের অধীনে নিয়ে এসেছেন। যে অঞ্চলগুলো মুসলমানগণ একদা শাহাদাতের অদম্য বাসনায় বিজয় করেছিলেন।

নূরুদ্দীন তার এই শুদ্ধি অভিযানের সময় মিসর ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত খ্রিস্টানদের দুর্গ ও শহরগুলো নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, মিসর থেকে মুসলিমবিদ্বেষী খ্রিস্টানদের মিত্র বাতেনী ও উবায়দিয়্যাহ সম্প্রদায়কে উৎখাত করা। এটা ছিলো তার মনের একান্ত ইচ্ছা। এ কারণে তিনি মিসরে অসংখ্য আলেম-উলামা, ফকীহ ও ওয়ায়েয প্রেরণ করেন, যাতে তারা সাধারণ মানুষকে দীনের দাওয়াত দেন। কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের পথ সহজতর করেন এবং দেশ থেকে মুসলিম বিদ্বেষী রাফেযীদেরকে উৎখাত করেন। এই যুগ ও সময়ে যারা এসব ব্যাপারে ভূমিকা রাখেন, তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলেন, মুহাম্মদ ইবনুল মুওয়াফফিক আল খাবুশানী। তিনি ৫৬০ হিজরীতে মিসরে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানে বিশুদ্ধ ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। উবায়দিয়াদের ব্যাপারে জন সাধারণকে সতর্ক করেন। তাদেরকে যিন্দীক ও ইহুদী আখ্যায়িত করেন। তার শিষ্যগণ এসব সংবাদ নিয়ে ইসলামী বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েন।[২৫১]

সুলতান নূরুদ্দীনের সাম্রাজ্য মিসরে সেনা অভ্যুত্থান ঘটানোর সুযোগ খুঁজছিলো। আর সেই কাঙ্ক্ষিত সুযোগ এসে গেলো যখন মিসরের শাসকবৃন্দের সাথে উবায়দিয়্যাদের মতবিরোধ সৃষ্টি হলো। এর অন্যতম কারণ ছিলো, দুনিয়াবী স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের দ্বন্দ্ব। তখন উযির মুহতারাম খ্রিস্টান বা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের সাথে এবং সেনাপতি সারগাস ইবনে ছালাবার সঙ্গে পরামর্শ করেন। তখন মিসরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় এবং একের পর এক যুদ্ধ দানা বেঁধে উঠে। অবশেষে মিসর অভিমুখে সুলতান নূরুদ্দীনের পাঠানো সেনাপতি আসাদউদ্দীন শেরকূহ মিসরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে সক্ষম হন। ৫৬৪ হিজরী সনে এই রাষ্ট্রটি সুলতান নূরুদ্দীনের পূর্ণ করতলগত হয়। সে সময় চাচা আসাদ উদ্দীনের পর সালাহউদ্দীন সেনাবাহিনীর নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। সালাহউদ্দীন মিসরে

---

[২৫১] সালাহউদ্দীন : ২৬২।

উবায়দিয়্যাহ সাম্রাজ্যের মূলোৎপাটনে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। তিনি সেখানে সুন্নাহর পুনর্জাগরণ এবং বায়তুল মুকাদ্দাসকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে মুসলমানদেরকে একই কাতারে সমবেত করার বিরাট উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

## সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের ইন্তিকাল

৫৬৯ হিজরী সনে মহামতি সুলতান, দীনের নিষ্ঠাবান কর্মী, সুন্নাহ পুনরুজ্জীবিতকারী, বিদআত মূলোৎপাটনকারী, খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রামকারী, দীন-ইসলামের মহান সেবক ও সহযোগী নূরুদ্দীন মাহমূদ ইন্তিকাল করেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি বাতিলের বিরুদ্ধে আমৃত্যু যুদ্ধ করেছেন। ইসলামের কল্যাণে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দিয়েছেন। দীনের খেদমতে আত্মনিবেদিত ও উৎসর্গিত প্রাণ ছিলেন। মহান আল্লাহ তাআলা তাকে কবুল করুন।

তার ইন্তিকালের পর নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন, তারই হাতে দীক্ষাপ্রাপ্ত এবং তারই ইচ্ছায় সেনাবাহিনীর প্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী।

***

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## মিসর থেকে উবায়দিয়া সাম্রাজ্য উৎখাতকারী ও বায়তুল মুকাদ্দাস বিজেতা সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী

সুলতান ইউসুফ বিন আইয়ুব ৫৩২ হিজরী সনে ইরাকের তিকরিত কেল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আইয়ুব বিন শাদী ছিলেন তিকরিত শহরের গভর্নর। এরপর তিনি তার পিতা ও চাচা আসাদউদ্দীন শেরকূহসহ মসূল শহরে গমন করেন। এই আইয়ুবী শার্দুল সেখানে পিতা ও চাচার ন্যায় দুই মর্দে মুজাহিদের কোলে লালিত পালিত হন। এরপর ক্রমে ক্রমে তিনি মুজাহিদ বাহিনীর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। পরে সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ যখন তার চাচা আসাদউদ্দীনকে মিসরে বাহিনী দিয়ে পাঠান তখন তিনি তার সহযোদ্ধা হিসেবে গমন করেন। উবায়দিয়্যাহ সাম্রাজ্য পতনের শেষ সময়ে যখন তার চাচা ইন্তিকাল করেন তখন তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং বাহিনীর নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন।

তিনি নিজের ইচ্ছা ও লক্ষ্য অনুসারে মিসর সাম্রাজ্যকে আব্বাসী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে থাকেন। যা অপরাপর মুসলমানগণও চাচ্ছিলেন। এর ফলে তিনি মিসরে নিযুক্ত উবায়দিয়া ও রাফেযী মতাদর্শী বিচারকদেরকে অপসারণ করেন এবং আবদুল মালিক ইবনে দিরবাস শাফেয়ীকে বিচারক পদে পদায়ন করেন। তিনি আযান থেকে উবায়দিয়াদের সংযুক্ত حي على خيرالعمل অংশটি বিলুপ্ত করেন এবং খুতবায় আব্বাসী খলীফাদের মাগফিরাত কামনার বাক্য সংযুক্ত করেন। যা ২০৮ বছর ধরে মিসরে অনুপস্থিত ছিল। এসব কার্যক্রম সম্পাদনের পর তিনি সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদকে তার কর্মপন্থা বিষয়ে সুসংবাদ প্রদান করেন। এ সংবাদ শুনে মুসলমানগণ খুবই খুশি হয়। তিনি উবায়দিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পুন চেষ্টা-তদবীর সবই দূরদর্শী কৌশল ও নেতৃত্বের দ্বারা নস্যাৎ করে দেন। একই সঙ্গে তিনি জনসাধারণের কল্যাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।

আদিদ উবায়দির মৃত্যু ও মিসরে তার রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য পতনের পর কবি ইমাদ ইস্পাহানী একটি চমৎকার কবিতা রচনা করেন। নিম্নে তা হুবহু তুলে ধরা হলো,

توفى العاضد الدعي فما ✪ يفتح ذو بدعة بمصر فما

و عصر فرعونها انقضى وغدا ✪ يوسفها في الأمور محتكما

قد طفئت جمرة الغواة وقد ✪ داخ من الشرك كل ما اضطرما

وصل شمل الصلاح ملتئما ✪ بها وعقد السداس منتظما

لما غدا مشعرا شعار بني ✪ العباس حقا والباطل اكتتما

وبات داعي التوحيد منتظرا ✪ و من دعاة الإشراك منتقما

وظل أهل الضلال في ظلل ✪ داجية من غبائه وعمى

وارتكس الجاهلون في ظلم ✪ لما أضاءت منابر العلما

وعاد المستضيء معتلي ✪ ببناء حق بعدما كان منهدما

أعيدت الدولة التي اضطهدت ✪ وانتصر الدين بعدما كان اهتضما

واهتز عطف الإسلام من جلل ✪ و افتر ثغر الإسلام وابتسما

واستبشرت أوجه الهدي فرحا ✪ فليقرع الكفر سنه ندما

عاد حريم الأعداء منتهك الهدي ✪ وفي الطغاة منقسما

قصور أهل القصور أخربها ✪ عامر بيت من الكمال سما

أزعج بعد السكوت ساكنها ✪ و مات ذلا وأنفه رغما.

আযিদ উবায়দি মৃত্যুবরণ করেছে। মিসরে সে নব্য নীতির পথ খুলে গেছে।

তার ফেরাউনী রাজত্ব ধ্বংস হয়েছে। ইউসুফ সে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেছে।

(এখন) ভ্রান্তির অঙ্গার নিভে গেছে। শিরকের চোরাপথও বন্ধ হয়ে গেছে।

কল্যাণ পূর্ণতা পেয়েছে। রাষ্ট্রও সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হচ্ছে।

শাসনভার গ্রহণ করে তিনি বনী আব্বাসের খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে বাতিল মুখঢাকা দিয়েছে।

তাওহীর বাহকগণ নির্দেশনার অপেক্ষায় আছে, কখন শিরকের ধ্বজাধারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।

বাতিলপন্থীরা আজ ভ্রান্তির আধারে নিপতিত। সত্যের আহ্বান আসার পরও তারা অন্ধ।

মূর্খরা এখনো অন্ধকারেই আছে। যদিও উলামায়ে উম্মত নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন।

আলো অন্বেষীরা এখন সত্যের পতাকা উড্ডীন করতে ফিরে এসেছে। ইতোপূর্বে যা হারিয়ে গিয়েছিল।

হারানো রাজ্য ফিরে এসেছে। মুখ থুবড়ে পড়ার পর দীনের বিজয় পুনরায় ফিরে এসেছে।

ইসলামের বাহকরা আজ আনন্দে উদ্বেল। মুসলিম জাতি আজ হর্ষোৎফুল্ল।

হিদায়াতপ্রাপ্তদের মুখ আজ খুশিতে ঝলমল করছে। সুতরাং কুফর যেন এখন লজ্জিতবদনে ফিরে যায়।

হিদায়াতের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিতকারী শত্রুদের মুণ্ডপাতকারীরা আজ ফিরে এসেছে। আজ তাগুতপন্থীদেরকে তাদের হিংসা বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

তারা তো ইতোপূর্বে তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছিল। সুতরাং এখন তাদেরকে সেগুলো বিনির্মাণ করে দিতে হবে।

এখানকার অধিবাসীরা এতদিন চুপ করে ছিল। আজ নির্লজ্জ বাতিলের মুখে চুনকালি মাখা হবে। লজ্জায় যেন তাদের নাক কাটা পড়বে।

উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল ৫৬৭ হিজরী সনে। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, ফাতেমি সাম্রাজ্যের সময়কাল ছিল প্রায় দুইশ বছর। এরপর তারা কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। যেমন সূরা হুদে আল্লাহ তাআলা বলেন, كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا যেন সেখানে তারা কোনো কালে ছিলোই না। তাদের প্রথম শাসক হল মাহদি। সে সালমিয়ার হাদ্দাদ বংশীয় ছিল। তার নাম উবায়দ। সে মূলত ইহুদি ছিল।

এরপর সে মধ্যপ্রাচ্যে আসে এবং উবায়দুল্লাহ নাম ধারণ করে। সে দাবি করে, সে হযরত আলী ও ফাতেমি বংশীয়। নিজের সম্পর্কে সে দাবি করে বলে, সে প্রতীক্ষিত মাহদি। চারশ শতকের পর অনেক আলেম ও ইমাম তার এই ব্যাপারগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। এই মিথ্যা দাবিদার ওই সব অঞ্চলে

নিজের মিথ্যা দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে একদল গণ্ডমূর্খ তাকে সঙ্গ দিয়েছে। এরপর তার সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। পরে সে মাহদিয়া নামে একটি শহরের গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হয়। সে এখানকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। সে রাফেযি মতবাদ প্রচার করে এবং নিজের কুফরী মতাদর্শ ছড়াতে থাকে। এরপর তার পুত্র মুহাম্মদ এই দায়িত্ব পালন করে। তারপর তার পুত্র মানসূর ইসমাঈল দায়িত্ব গ্রহণ করে।

এরপর তার পুত্র মাআদ। তাদের মধ্যে সে-ই প্রথম মিসরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। সেখানে সে অসংখ্য প্রাসাদ নির্মাণ করে। এরপর তার পুত্র আযীয নাজ্জার দায়িত্ব পায়। তারপর তার পুত্র হাকেম মানসূর দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরপর তার পুত্র তাহের আলি। এরপর তার পুত্র মুস্তানসির মাআদ। এরপর তার পুত্র মুস্তালি আহমাদ। এরপর তার পুত্র আমির মানসূর, এরপর তার চাচাতো ভাই হাফেয আবদুল মাজীদ, এরপর তার পুত্র যাফের ইসমাঈল, এরপর ফায়িয ঈসা, এরপর তার চাচাতো ভাই আযিদ আবদুল্লাহ পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করে। সে-ই ছিল সর্বশেষ খলিফা। তারা সর্বমোট ১৪ জন পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করে। তাদের সময়কাল ছিল ২০০ বছরের কম ১৮০ বছর। বনী উমাইয়্যার খলিফাদের সংখ্যাও ছিল ১৪ জন। কিন্তু তাদের সময়কাল ছিল প্রায় ৮০ বছর।

এরপর তিনি আরও বলেন, ফাতেমি খলিফাগণ ধন-সম্পদে প্রাচুর্যবান ছিলেন। তারা অন্যান্য খলিফাদের চেয়ে বেশি ধনী, অধিক জোর-জুলুমকারী ছিলেন। চরিত্রগত দিক থেকে খুবই ধূর্ত ও কদাকার চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাদের যুগে রাষ্ট্রসমূহে ব্যাপক অন্যায়-অশ্লীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অসংখ্য হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলাকারী বৃদ্ধি পেয়েছে। নেককার আলেম উলামা ও সৎকর্মশীল আবেদদের সংখ্যা কমে গেছে। সিরিয়ায় নাসিরিয়্যাহ, দারযিয়্যাহ ও হাশিশিয়্যাহরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে। ফরাসীরা সিরিয়ার উপকূলে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। পর্যায়ক্রমে তারা আল কুদস, নাবলুস, আজলূন, গূর, গাজা, আসকালান, কুর্ক, শোবেক, তাবরিয়া, বানিয়াস, সূর, আক্কা, সাইদা, বৈরুত, সফদ, তারাবলুস, ইন্তাকিয়া ও এর আশেপাশের অঞ্চলসমূহ দখল করে নিয়েছে। তারা অসংখ্য অগণিত মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে। যার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তারা মুসলিম রমণী ও যুবতীদেরকে, তাদের সন্তানাদিদেরকে অপহরণ করেছে। তাদের সঙ্গে এমন পৈশাচিক আচরণ করেছে- যা উল্লেখ করার মতো নয়। অথচ সাহাবায়ে কেরাম এসকল অঞ্চল বিজয় করেছিলেন এবং এগুলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত

বানিয়েছিলেন। তারা নির্বিবাদে মুসলমানদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। তারা দামেশকের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরিস্থিতিও তৈরি করে ফেলেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা রক্ষা করেছেন। তাদের শক্তি-ক্ষমতা ও সময়কাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া-অনুগ্রহ ও কুদরতের ক্ষমতাবলে পুনরায় এসকল অঞ্চলগুলো মুসলমানদের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন।[২৫২]

আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শী আলেমগণ বিশেষত ফকীহ ও বিচারকগণ সুলতান সালাহউদ্দীনের সুন্দর ও গঠনমূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তা হলো উবায়দিয়া রাফেযী ও বাতেনী সাম্রাজ্য মূলোৎপাটন করা। কবিগণ এ প্রসঙ্গে তার প্রশংসা করে অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন,

أبدتم من بلى دولة الكفر من ✪ بني عبيد بمصر إن هذا هو الفضل.

*তোমরা কুফরী রাষ্ট্রের অভিশাপ থেকে আমাদেরকে মুক্ত করেছো। বিশেষ করে উবায়দিয়া সম্প্রদায়কে উৎখাত করেছো। নিশ্চয়ই এটা তো চির শ্রেষ্ঠতম কাজ।*

زنادقة شيعية باطنية مجوس ✪ وما في الصاحلين لهم أصل.

*তারা হলো যিন্দীক শিয়া বাতেনী অগ্নিপূজারী। শ্রেষ্ঠ লোকদের মাঝে তাদের কোনো স্থান নেই।*

يسرون كفرا يظهرون تشيعا ✪ ليستروا سابور عمهم الجهل.

*নিজেদের ভেতরে কুফরী মতাদর্শ লালন করে আর বাইরে শিয়া হিসেবে নিজেদেরকে পরিচয় দেয়। যাতে তারা তাদের অপকর্মগুলো অনায়াসে ঢাকতে পারে। বস্তুত তাদেরকে অজ্ঞতা ও মূর্খতা পেয়ে বসেছে।*[২৫৩]

সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ সিরিয়ায় খ্রিস্টানদের অস্তিত্ব এবং বাতেনী সম্প্রদায়ের অপতৎপরতা নির্মূলের জন্য উবায়দিয়াদেরকে উৎখাত করা আবশ্যক মনে করতেন। কারণ তিনি মিসর ভূখণ্ডে বিশুদ্ধ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং আপন ইচ্ছা ও বাসনা অনুসারে তিনি প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করেন, কাঙ্ক্ষিত সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং এর জন্য বিশ্বস্ত ও চৌকস নেতৃবৃন্দকে মন্ত্রী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করেন। এর ফলে আল্লাহ তাআলা

---

[২৫২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২ : ২৮৪-২৮৭।
[২৫৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২ : ২৮৮।

তাঁরই নিষ্ঠাবান কর্মী সালাহউদ্দীনের হাতে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেন। সালাহউদ্দীন সুলতান নূরুদ্দীনের দূরদর্শী চিন্তা চেতনার আলোকে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

যখন মিসরে মুসলিম নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করলো এবং জনসাধারণও নিরাপদে বসবাস করতে লাগলো, বিদআত দূরীভূত হলো, সুন্নাহ পূনর্জীবিত হলো, ফিতনা বিদূরীত হলো এবং সুলতান নূরুদ্দীনও রাব্বে কারীমের ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমালেন তখন সমূহ ফিতনা-ফাসাদের পথ মাড়িয়ে শাসনভার অর্পিত হলো সুলতান সালাহউদ্দীনের ওপর। তিনি সমূহ ফিতনা ও দুর্যোগ মাড়িয়ে সিরিয়া ও মিসরকে তার সুষ্ঠু ও ইনসাফপূর্ণ শাসনের অধীনে একীভূত করলেন এবং সুলতান নূরুদ্দীনের ইচ্ছা-অভিপ্রায় বাস্তবায়ন করতে শুরু করলেন। সুলতান নূরুদ্দীনের অন্যতম অভিপ্রায় ছিলো, মুসলিম দেশগুলোকে খ্রিস্টানদের কবল থেকে মুক্ত করা এবং বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করা। তিনি তার এই ইচ্ছা বাস্তবায়নে সুচিন্তিত কর্মসূচি ও কর্মপন্থাও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার এই মহৎ ইচ্ছা পূর্ণ করার আগেই ইন্তিকাল করেন। আর আল্লাহ তাআলা এটি সুলতান সালাহউদ্দীনের হাতে বাস্তবায়ন করার ফায়সালা করে রেখেছিলেন। সুতরাং দায়িত্ব গ্রহণের পর সালাহউদ্দীন বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছা পোষণ করেন। একই সাথে তিনি শহর ও নগরসমূহকে খ্রিস্টানদের বসতি ও পদচারণা থেকে মুক্ত করার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করেন। তিনি ৫৭৫ হিজরী সনে 'মারাজুল উয়ূন' নামক স্থানে এবং 'বানিয়াস' নামক স্থানে খ্রিস্টান লড়াকুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করেন। তাদের নেতৃস্থানীয়দেরকে বন্দী করে 'আহযান' নামক দুর্গ পদানত করেন। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন এবং তাদের হাত থেকে একের পর এক দুর্গ ছিনিয়ে নিতে থাকেন। এভাবে 'হিত্তীন' তীরবর্তী অঞ্চলে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী তার অধীনে সমবেত হয়ে যায়। কার্যত তখনই এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ক্রুসেডারদের দৃঢ় মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পথ সুপ্রশস্ত হয়। এই যুদ্ধে বিরাট সংখ্যক ক্রুসেডার যোদ্ধা নিহত হয় এবং মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। যারা সেখানের নিহতদের সারি দেখেছে, তারা বলেছে, সেখানে বন্দী করার মতো কেউ অবশিষ্ট ছিল না। আর যারা বন্দীদেরকে প্রত্যক্ষ করেছে তারা বলেছে, সেখানে কেউ নিহত হয়নি। উল্লেখ্য, ক্রুসেডাররা যতদিন সিরিয়ার তীরবর্তী অঞ্চল দখল করে রেখেছিল ততদিন পর্যন্ত 'হিত্তীন' যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়

অর্জনের কথা চিন্তাও করা যায়নি।[২৫৪]

এই যুদ্ধে বন্দীদের অন্যতম একজন ছিলো, কোর্ক অঞ্চলের অধিপতি আরনাত। সে তার এলাকা দিয়ে আসা-যাওয়াকারী হাজী সাহেবদেরকে কষ্ট দিত এবং রাসূলুল্লাহ সা.-কে গালিগালাজ করতো। সুলতান সালাহউদ্দীনের কানে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে এই শপথ করেন যে, তিনি দীনের সুরক্ষা ও রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি তার নিখাঁদ ভালোবাসার দাবিতে ওই পাপিষ্ঠকে নিজ হাতে হত্যা করবেন। সুতরাং যুদ্ধে বন্দী হওয়ার পর সুলতান সালাহউদ্দীন তাকে নিজ হাতে হত্যাপূর্বক নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করেন এবং মুসলমানদেরকে তার দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন।

হিত্তীন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৫৮৩ হিজরী সনে। এই যুদ্ধের পর ক্রুসেডারদের মন একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাদের ওপর হতাশা-অবসাদ ও ভয়ভীতি চেপে বসেছিল। অপরদিকে সুলতান সালাহউদ্দীনের বাহিনী একের পর এক মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পুনরুদ্ধারে অগ্রসর হচ্ছিল। তারা মুসলিম বিদ্বেষী খ্রিস্টানদের বিনাশ করছিলো এবং নির্দয় খ্রিস্টান শাসকদের হাত থেকে মুসলিম বন্দীদেরকে মুক্ত করছিলো। সুলতান সালাহউদ্দীন বেঁচে যাওয়া ক্রুসেডারদেরকে নির্মূল করার জন্য এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহায়তাকারী অপরাপর রাজাবাদশাদেরকে হত্যা করার জন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। একই সাথে যারা মনে করে, হযরত ঈসা মাসীহ আ. যে গির্জায় ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন তার নাম সালিবুস সালাবুত- তা নির্মূল করার জন্য তিনি মহামান্য বিচারপতি ইবনে আবী আসরুনের নেতৃত্বে দামেশকের দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি সেই গির্জায় বীরবিক্রমে প্রবেশ করেন। সেটি ছিল ইতিহাসের এক গৌরবময় দিন।

সুলতান ক্রমান্বয়ে খ্রিস্টানদের কেল্লাসমূহের দিকে অগ্রসর হন এবং তাদের শহরে আগমন করেন। এর মধ্যে তিনি তাতরিয়া কেল্লা বিজয় করেন এবং আক্কা কেল্লাকে খ্রিস্টানদের হাত থেকে মুক্ত করেন। সেখান থেকে মুসলিম বন্দীদেরকে উদ্ধার করেন। সংখ্যায় তারা ছিলেন চার হাজার মুসলমান। এরপর তিনি পর্যায়ক্রমে সারদা, বাইরূত, আসকালান, নাবলূস, এরপর বায়সান ও আরদুল গাওর শহরে উপনীত হন এবং সবগুলো অঞ্চল বিজয় করে নিজের শাসনাধীন করে নেন।

---

[২৫৪] আর-রাওযাতাইন : ২ : ৭৮।

সুলতান নিজ বাহিনীকে এসব অঞ্চলে উন্মুক্তভাবে বিচরণ করার এবং আল কুদস বিজয়ের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। জনমানুষের ভেতরে এই সংবাদ ছড়িয়ে যায়। তারা এ ব্যাপারে দৃঢ় মনোভাবের কথা জানতে পারে। তখন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আলেম-উলামা ও নেককার ব্যক্তিবর্গও নিজেদের সাধ্যানুসারে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেন। তারা একে একে এই মহা যুদ্ধে তাকে সহযোগিতা করার জন্য বাহিনীর অধীনে সমবেত হতে থাকেন।[২৫৫]

সুলতান সালাহউদ্দীনের বাহিনী কর্তৃক বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করার সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যা গত ৯২ বছর যাবৎ মুসলিম বিদ্বেষী খ্রিস্টানদের হাতে ও কর্তৃত্বে রয়েছে। সুলতানের বাহিনী বায়তুল মুকাদ্দাসকে ঘিরে প্রবল প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং বহু দিন তারা খ্রিস্টানদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবরুদ্ধ করে রাখে।

ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে উল্লিখিত আছে, সুলতান সালাহউদ্দীন যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের অভিমুখে রওয়ানা করেন তখন বায়তুল মুকাদ্দাসে গৃহবন্দী কেউ একজনের কাছ থেকে তার নিকট পত্র পৌঁছে। পত্রে বায়তুল মুকাদ্দাসের কণ্ঠে নিম্নোক্ত কবিতাটি লেখা ছিল,

يا أيها الملك الذي ✪ لعالم الصلبان نكس

جاءت إليك ظلامة ✪ تسعى من البيت المقدس

كل المساجد طهرت ✪ وأنا على شرفي منجس.

*হে খ্রিষ্টবাদের সাম্রাজ্য পদানতকারী মহান মালিক!*

*বায়তুল মুকাদ্দাসের থেকে আপনার কাছে জুলুমাতের বার্তা এসেছে।*

*পৃথিবীর সকল মসজিদই মুক্ত-পবিত্র। অথচ আমি গৌরবময় হওয়া সত্ত্বেও আজো মুশরিকদের পদভারে গান্দা-অপবিত্র।*[২৫৬]

অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হলে খ্রিস্টানরা নিজেদের জীবনের নিরাপত্তা প্রার্থনা করে, বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রধানকর্তা এসে সুলতান সালাহউদ্দীনের কাছে করজোরে

---

[২৫৫] আর-রাওযাতাইন : ২ : ৭৮।

[২৫৬] হিত্তিনের নায়ক সুলতান সালাহউদ্দীন, আবদুল্লাহ উলওয়ান : ৭৫।

মিনতি করতে থাকে। তখন সুলতান তার প্রস্তাবে সাড়া দেন। মুসলমানগণ আল-কুদসে প্রবেশ করে এবং খ্রিস্টানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। তারা মসজিদুল আকসার আঙিনা ক্রুশ, পাদ্রী ও শূকর থেকে পয়পরিস্কার করে, মুসলমানদের শাসনামলে যেখানে যা ছিল সেখানে তা প্রতিস্থাপন করে। মসজিদের সোনালী গম্বুজ পবিত্র পানি দিয়ে ধৌত করে। পরে আবার গোলাপ ও মেশক আম্বর মিশ্রিত পানি দিয়ে পরিস্কার করে। শেষে তা দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ইতোপূর্বে তা দর্শনার্থীদের দৃষ্টি থেকে আবৃত ও নিষিদ্ধ ছিল। তিনি মসজিদুল আকসার গম্বুজ থেকে ক্রুশ অপসারণ করেন এবং মসজিদুল আকসার হৃত সম্মান ফিরিয়ে আনেন। সুলতান সালাহউদ্দীন রাজকন্যা ও তাদের সঙ্গে থাকা অন্যান্য দাসী, নারী, শিশু ও পুরুষদেরকে যথাসম্মান দান করেন। তাদের অধিকাংশকেই ক্ষমা করে দেন। অনেক মানুষের প্রাণভিক্ষা চাওয়া হলে তিনি তাদেরকে মাফ করে দেন। তিনি তাদের থেকে প্রাপ্ত গনীমতের স্বর্ণালঙ্কার সেনাবাহিনীর মাঝে বিতরণ করে দেন। তিনি নিজে সঞ্চয় করে রাখার মতো কিছু গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন খুবই সম্ভ্রান্ত, মহানুভব, সাহসী ও সহনশীল নেতা।[২৫৭]

এসবই ঘটেছিল বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেন্দ্র করে। তিনি বলেন, যখন বায়তুল মুকাদ্দাস ক্রুশ, ঢংকা, পাদ্রী ও গণকদের (অভিশাপ) থেকে মুক্ত হলো, তখন ঈমানদারগণ সেখানে প্রবেশ করলো, আযান দেওয়া হলো, কুরআন পাঠ করা হলো, রহমানের একত্ববাদ ঘোষণা করা হলো, সেখানে শাবান মাসের আট তারিখে বিজয়ের দিনে সর্বপ্রথম জুমআ অনুষ্ঠিত হয়। মিহরাবের দিকে মিম্বার প্রতিস্থাপন করা হয়। মুসল্লা বিছানো হয়। চারপাশে কুপি বাতি জ্বালানো হয়। প্রাঙ্গনে শামিয়ানা টাঙ্গানো হয়। সত্য সমাগত হয়। মিথ্যা দূরীভূত হয়। জায়নামায বিছানো হয়। সিজদাকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নামায কায়েম করা হয়। আযান দেওয়া হয়। প্রতিমাসমূহ দূর করা হয়। হতাশা কেটে যায়। অন্তর প্রশান্তি অনুভব করে। সৌভাগ্য ফিরে আসে। দুঃখ-দুর্দশা বিদূরিত হয়। একমাত্র ওই মহান আল্লাহর ইবাদাত করা হয়, যিনি নিজে জন্মলাভ করেননি এবং কেউ তাকে জন্মদান করেনি এবং কেউ তার সমকক্ষ নয়।[২৫৮]

রুকুকারী ও সিজদাকারী দাঁড়ানো ও উপবেশনকারী তার তাকবীর ধ্বনি দেয়। মসজিদপ্রাঙ্গন মুসল্লীদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। হৃদয়ে প্রবল আবেগে দু চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়। সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলার পূর্বে যখন নামাযের

---

[২৫৭] হিত্তীনের নায়ক সালাহউদ্দীন : ৭৫।
[২৫৮] সূরা ইখলাস : ৩-৪।

জন্য আযান দেওয়া হয় তখন সকল মুসলমানের হৃদয় আবেগ ও আনন্দের আতিশয্যে ভরপুর হয়ে উঠে। তখনও নামাযের জন্য কোনো খতীব নির্ধারণ করা হয়নি। তখন কুব্বাতুস সাখরায় অবস্থানরত সুলতান সালাহউদ্দীনের পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয় যে, আজ কাজি মুহিউদ্দীন যাকী খুতবা প্রদান করবেন। তখন তিনি কালো জুব্বা পরিধান করেন এবং মানুষের সামনে সাহিত্যালঙ্কার সমৃদ্ধ একটি স্পষ্ট ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের মর্যাদার কথা উল্লেখ করেন। এর ফযীলতের কথা দলিল-প্রমাণসহ উল্লেখ করেন। শায়খ আবু শামা আর-রাওযাতাইন গ্রন্থে সেই খুতবাটি পূর্ণাঙ্গ উল্লেখ করেছেন। খুতবার শুরুতে তিনি বলেছিলেন,

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

অতঃপর জালেমদের মূল শিকড় কর্তিত হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্যে, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা।[২৫৯]

এরপর তিনি কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার সকল প্রশংসা বাক্য পাঠ করেন। পরিশেষে বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি নিজ নুসরতের মাধ্যমে ইসলামকে সুসম্মানিত করেছেন। নিজ ক্ষমতাবলে শিরককে অপদস্থ করেছেন। নিজ নির্দেশনায় বিধান প্রণয়ন করেছেন। শুকরিয়া বাক্য দিয়ে নেয়ামত বৃদ্ধি করেছেন। নিজ কৌশলবলে কাফেরদেরকে পাকড়াও করেছেন। যিনি নিজ পরিবর্তন নীতি হিসেবে দিনসমূহকে সুনির্ধারিত করে দিয়েছেন। যিনি নিজের মনোনীত ধর্মকে সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করেছেন। যিনি নিজ বান্দাদের ওপর কর্তৃত্বশীল, ফলে তারা তাকে পরাহত করতে পারে না। যিনি নিজ সৃষ্টিসমূহের ওপর প্রকাশমান, ফলে তার সঙ্গে বিতণ্ডা করা যায় না। তিনি যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ করেন, ফলে তা প্রতিহত ও পরিবর্তন করা যায় না। আমি তার দৃশ্য-অদৃশ্য নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি। তার অলীদের সম্মান করাকে এবং তার সহযোগীদেরকে সহযোগিতা করাকে নিজ কর্তব্য জ্ঞান করি। আমি তার এমন প্রশংসা করি– যাতে তার প্রশংসার গোপনভেদ এবং বাহ্যিক অনুভূতি পূর্ণরূপে অনুভূত হয়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক। তার কোনো শরীক নেই। তিনি এক সত্তা। তিনি পরান্মুখ। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। আর তার কোনো সমকক্ষ কেউ নেই। আমি তার এমন সাক্ষ্য দেই– যদ্দারা অন্তর তাওহীদের মর্মবাণী দিয়ে পূতঃপবিত্র হয়। অন্তর তাকে রব হিসেবে গ্রহণ করে

[২৫৯] সূরা আনআম : ৪৫।

তুষ্ট হয়। আমি আরও সাক্ষ্য দেই, মুহাম্মদ সা. তার বান্দা ও রাসূল। তিনি শিরকের মূলোৎপাটন করেছেন এবং শিরকী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করেছেন। তিনি মিথ্যা অপবাদ দূর করেছেন। তিনি মিরাজের রাতে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত নৈশ ভ্রমণ করেছেন। সেখান থেকে তাকে বোরাকের মাধ্যমে সপ্ত আকাশ ঊর্ধ্বে সিদরাতুল মুনতাহায় পরিভ্রমণ করানো হয়েছে।

عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ... مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ.

যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত।... তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি।[২৬০]

আল্লাহ তাআলা নবী কারীম সা.-এর প্রধান সহযোগী হযরত সিদ্দীকে আকবারের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যিনি সবার আগে ঈমান এনেছিলেন। তিনি আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যিনি সর্বপ্রথম এই বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ক্রুশের প্রতীকসমূহ উচ্ছেদ করেছেন। তিনি আমিরুল মুমিনীন হযরত উসমান বিন আফফান যিন-নূরাইন-এর ওপর রহমত বর্ষণ করুন। যিনি ছিলেন কুরআন সংকলক। আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী বিন আবি তালিবের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যিনি শিরক বিদআত নির্মূল করেছেন। কাফের-মুশরিকদের প্রতীমা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। একইভাবে তিনি নবী কারীম সা.-এর পরিবার-পরিজন, সঙ্গী-সাথী এবং তার একনিষ্ঠ অনুসারীদের ওপরও রহমত নাযিল করুন।[২৬১]

তিনি তার জলদগম্ভীর, আবেগে ভরপুর, বোধ ও চেতনার রেণুমিশ্রিত কণ্ঠে বক্তৃতায় আরও বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর হে বিজয়ী বাহিনী! কেননা তোমাদের হাতেই নববী মুজিযার অন্যতম দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। সিদ্দিকী দৃঢ়তা, উমরী বিজয়নেশা, উসমানী বাহিনীর অমিততেজী মনোভাব এবং আলী রা. এর মতো ন্যায়পরায়ণতার সুনিপুণ বহিপ্রকাশ ঘটেছে। তোমরা ইসলামী ইতিহাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ কাদেসিয়ার দিনগুলো এবং ইয়ারমূকের ঘঠনাগুলো পুনরুজ্জীবিত করেছো। খায়বারের ইতিহাস ও খালিদ বিন ওয়ালিদের বীরবিক্রম দৃঢ়তা ও সাহস পূন ফিরিয়ে এনেছো। সুতরাং তোমাদের নবীর পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে উত্তম বিনিয়ম দান করুন। শত্রুর বিরুদ্ধে তোমরা যে সর্বাত্মক

---

[২৬০] সূরা নাজম : ১৫ ও ১৭।

[২৬১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২: ৩৪৬।

লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছো সেজন্যে তোমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তোমরা নিজ নিজ রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছো আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম বানান। তোমাদেরকে চির সুখ ও সৌভাগ্যময় জান্নাতের অধিকারী বানান। সুতরাং তোমরা এইসব নেয়ামতের মর্যাদা রক্ষা করো এবং শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহ তাআলার দিকে ধাবিত হও। কেননা অন্যসব মানুষের মধ্যে তিনি কেবল তোমাদের জন্যই এসব নেয়ামত বরাদ্দ রেখেছেন এবং তোমাদেরকে এসব কৃতিত্বপূর্ণ খেদমতের সুযোগ দান করেছেন... ।[২৮২]

এই মহাবিজয়ের পর রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান থেকে কবি, আলেম, লেখকবৃন্দ ও ঐতিহাসিকগণ সুলতানের কাছে আসেন। তারা তার এই অমর কীর্তির ভূয়সী প্রশংসা করে কাব্য, ছন্দ ও কবিতা রচনা করেন। যা ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থাবলিতে উদ্ধৃত রয়েছে। আমি নিম্নে কবি আবুল হাসান ইবনে আলী আল জুওয়াইনির কবিতা উদ্ধৃত করছি,

جند السماء لهذا الملك أعوان ✪ من شك فيهم فهذا الفتح برهان

هذی الفتهوح فتوح الأنبياء و ما ✪ لها سوى الشكر بالأفعال أثمان

أضحت ملوك الفرنج الصيد في يده ✪ صيدا وما ضعفوا يوما و ما هانوا

تسعون عاما بلاد الله تصرخ ✪ والإسلام أنصاره صم و عميان

فالآن لبي صلاح الدين دعوتهم ✪ بأمر من هو للمعوان معوان

إذا طوى الله ديوان العباد فما ✪ يطوى لأجر صلاح الدين ديوان.

*এই মহান বাদশাহের জন্য আসমানের বাহিনী সহায়তাকারী। যে ব্যক্তি তা সন্দেহের চোখে দেখবে, এ বিজয় তার জন্য প্রমাণ।*

*এই বিজয় নবীদের বিজয়ের ন্যায়। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ছাড়া কার্যত এর জন্য কোনো প্রতিদান হয় না।*

*ফিরিঙ্গি সম্রাটেরা তার হাতে শিকারের ন্যায় বন্দী হয়েছে। অথচ তিনি এক দিনের জন্যও ক্লান্ত ও অপমানিত হননি।*

---

[২৮২] দেখুন, হিত্তীনের মহানায়ক সুলতান সালাহউদ্দীন : ৭৮।

তোমরা অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছ। অথচ ইসলাম ও আল্লাহর দেশ অনেক দিন থেকেই চিৎকার-হা-হুতাশ করছে। ইসলামের ধ্বজাধারীরা এ থেকে বোবা ও বধির হয়ে আছে।

এখন সালাহউদ্দীন সে ডাকে সাড়া দিয়েছে। সেই মহান প্রতিপালকের ইশারায়, যিনি সর্বোত্তম সহযোগী।

আল্লাহর রেজিস্টার খাতা গোটানো হলেও সালাহউদ্দীনের প্রতিদানের রেজিস্টার গোটানো হবে না।[২৬৩]

মিসর সাম্রাজ্যের মুখপাত্র জনাব মুহাম্মদ বিন সাদ বলেন,

أترى منا ما ما بعيني أبصر ✪ القدس تفتح والفرنجة تكسر
ومليكهم في القيد مصفود ولم ✪ ير قبل ذلك لهم مليك يؤسر
فتح الشام و طهر القدس الذي ✪ هو في القيامة للأنام المحشر
يا يوسف الصديق أنت لفتحها ✪ فاروقها عمر الإمام الأطهر
ولأنت عثمان الشريعة بعده ✪ و لأنت في نصر النبوة حيدر.

তুমি কি আমাদের কাছে এমন বিষয় দেখেছো, যা আমার চোখ কখনো দেখেনি? কুদস বিজিত হবে আর ফিরিঙ্গিরা বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

তাদের সম্রাট কয়েদখানায় বন্দী। অথচ ইতোপূর্বে তাদের কোনো সম্রাটকে বন্দী দেখা যায়নি।

সিরিয়া বিজিত হয়েছে আর আল-কুদস শত্রুমুক্ত হয়েছে। কিয়ামতের দিন সেটাই হবে মানুষের জন্য হাশরের ময়দান।

হে সত্যবাদি ইউসুফ! আপনিই সেটা বিজয় করেছেন। আপনিই উমরে ফারুক, পূতঃপবিত্র ইমাম।

তার পর আপনিই শরয়ী খেলাফতের উসমান। আর নবুওয়াতের সাহায্যে আপনিই হচ্ছেন আলী হায়দার।[২৬৪]

---

[২৬৩] দেখুন, হিত্তীনের মহানায়ক সুলতান সালাহউদ্দীন : ৭৮-৭৯।
[২৬৪] প্রাগুক্ত : ৭৯।

সুলতান সালাহউদ্দীন ও খ্রিস্টানদের মাঝে যে সন্ধিচুক্তি হয়েছিল তার অন্যতম একটি শর্ত ছিলো, প্রথম চল্লিশ দিনের জন্য তাদের জনসাধারণের মাঝে বের হওয়ার অনুমতি থাকবে। পুরুষরা এর জন্য দেবে ১০ দিনার, নারীরা দেবে ৫ দিনার। আর শিশুসন্তানদের জন্য দিতে হবে ২ দিনার। কেউ যদি তা দিতে সক্ষম না হয় সে বন্দী বলে গণ্য হবে।[২৬৮]

কিন্তু সুলতান সালাহউদ্দীন সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করেন এবং ইসলাম বিদ্বেষী খ্রিস্টানদের কায়ে এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠির সামনে ইসলামের সুমহান আদর্শ ও ন্যায়পরায়ণতার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনের লক্ষ্যে তিনি খ্রিস্টানদের সাথে দয়া, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার আচরণ করেন। এভাবে তিনি সারা পৃথিবীর সামনে ক্ষমা-উদারতা এবং ন্যায়পরায়ণতার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা দেখিয়ে দেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে অসহায় খ্রিস্টানদের, যাদেরকে তাদের নেতৃবর্গ ফেলে রেখে গেছে এবং যাদেরকে সহায়তা করার মতো কেউ ছিলো না, সুলতান তাদেরকে প্রয়োজনীয় অর্থসম্পদ ও বাহন প্রদান করেন। যাতে তারা তাদের মাল-সম্পদসমেত কাঙ্ক্ষিত স্থানে যেতে পারে।

রোম সম্রাটের এক স্ত্রী ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। সে তার স্বামীর কাছে যাওয়ার এবং তার সাথে দিন কাটানোর অনুমতি চাইলো। তখন সুলতান তাকে অনুমতি দেন এবং নাবলুস কেল্লায় তাকে বন্দী স্বামীর সাথে থাকার ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দেন।

অনেক রমণী সুলতানের কাছে এসে স্বামী ও সন্তানদের ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি তাদের আবেদনে খুবই আবেগাপ্লুত হন এবং তাদেরকে মুক্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন।

তিনি বয়স্ক ও দরিদ্র লোকদের জন্য জিযিয়া কর ছাড়াই বের হওয়ার সুযোগ করে দেন। পাশ্চাত্যের লেখক যেমন 'স্টিফেনসন', 'স্ট্যানলি লেন বুল' প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ খ্রিস্টানদের ব্যাপারে সুলতান সালাহউদ্দীনের দয়া, উদারতা ও বদান্যতার অসংখ্য ঘটনা ও কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সুলতান সালাহউদ্দীন খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ও অপরাপর সাধারণ মানুষদেরকে তাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজনমাফিক আসবাব সামগ্রী নিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেন। তখন তারা কোনোরূপ বাধাবিপত্তি ছাড়াই নিজেদের ইচ্ছা ও চাহিদামাফিক অর্থ ও ধনসম্পদ নিয়ে নেন। যেগুলো তারা নিতে সক্ষম ছিলেন না সেগুলো রেখে

---

[২৬৮] হিত্তীনের মহানায়ক সুলতান সালাহউদ্দীন : ৭৯।

যান। তখন মুসলমানগণ তাদের কাছ থেকে সেগুলো কিনে নেন।

জনৈক বাতারিকা বা খ্রিস্টান পাদ্রী নিজের সম্পদ ও অর্থকড়ি নিয়ে বের হয়ে গেলেন। তার সম্পদ ছিল পরিমাণে অঢেল। সে তা দরিদ্র ও মিসকিনদের প্রয়োজনে খরচ করতো না। তখন সুলতানকে বলা হলো, আপনি একে কেন তার কর্মকাণ্ডে বাধা দিচ্ছেন না? কেন তার অর্থকড়ি এমন ক্ষেত্রে কাজে লাগাচ্ছেন না, যদ্দারা মুসলমানগণ শক্তি-ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে? তখন সুলতান তাদেরকে বললেন, আমি তার কাছ থেকে ১০ দিনারের বেশি একটি দিনারও গ্রহণ করবো না। আমি তার সাথে প্রতারণা করতে পারবো না।[২৮৬]

ইসলামবিদ্বেষী খ্রিস্টানরা যখন ৪৯২ হিজরীতে আমাদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস ছিনিয়ে নেয় তখন তারা মুসলমানদের সঙ্গে কী নির্মম আচরণ করেছিল ইংরেজ ঐতিহাসিকত 'মেল' তা নিম্নোক্ত ভাষ্যে উদ্ধৃত করেছেন,

পথে-ঘাটে, ঘরে-বাইরে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছিল। কুদসবাসীর জন্য এমন কোনো স্থান ছিলো না, যেখানে গিয়ে তারা কোনো আশ্রয় পেতে পারে বা কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পেতে পারে। কেউ কেউ জবাইয়ের ছুরি থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য প্রাসাদের উপরে উঠে আত্মহুতি দিয়েছে। কেউ কেউ প্রাসাদের ভূগর্ভস্থ কক্ষে কিংবা মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু কোনো কিছুই তাদেরকে রক্তপিপাসু খ্রিস্টানদের নখরথাবা থেকে বাঁচাতে পারেনি। তারা যেখানে আশ্রয় নিচ্ছিল সেখানেই ক্রুসেডাররা তাদের পিছু নিচ্ছিল।

তিনি আরও বলেন, পলায়নপর পথচারী ও অশ্বারোহী মুসলিমদের পিছু ধাওয়া করা হচ্ছিল। জনবসতির এই বিরাট উপত্যকা থেকে তখন কেবল মৃত্যু ও মৃত্যুর কাতরধ্বনি শোনা যাচ্ছিলো। ওই সকল নরপিশাচ ক্রুসেডাররা পচনশীল লাশের উপর দিয়ে কেবল ওই সকল মুসলিমদের পশ্চাদ্ধাবনই করছিল- যারা কোনো আশ্রয়স্থল বা আশ্রয়ের ঠিকানা তালাশ করছিলো।"

মহাপুরুষ, কীর্তিমান মুসলিম সেনাপতি সুলতান সালাহউদ্দীন এভাবেই মানবতার স্বরূপ ও সৌন্দর্য এবং তার লাজ-মর্যাদা রক্ষা করে ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়েছেন। মানবসভ্যতার ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই ইসলামের শান ও মর্যাদা সমুন্নীত করার জন্যে সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ ও সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর ন্যায় মহানায়কগণ কী

---

[২৮৬] দেখুন, হিত্তীনের মহানায়ক সুলতান সালাহউদ্দীন : ৭৯।

অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন! যা অতি বিরল ও আশ্চর্যকর। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দয়া-ক্ষমা ও সন্তুষ্টির চাদরে আবৃত করে নিন। কবি বলেন,

ملكنا فكان العدل منا سجية ✪ فلما ملكتم سال الدم أبطح

وحللتم قتل الأسارى وطالما ✪ غدونا على الأسرى نمن ونصفح

فحسبكم هذا التفاوت بيننا ✪ وكل إناء بالذي فيه ينضح.

আমরা যখন রাজ্যক্ষমতা লাভ করেছি তখন এমনভাবে রাজ্য পরিচালনা করেছি যে, তা আমাদের সৎস্বভাবে পরিণত হয়েছে। আর যখন তোমরা রাজ্য লাভ করলে তখন বিপুলভাবে রক্তপাত ঘটালে।

তোমরা বন্দীদেরকে হত্যা করা বৈধ প্রতিপন্ন করলে। অথচ আমরা সমসময়ই বন্দীদেরকে ক্ষমা ও উদারতা দেখিয়েছি।

তোমাদের ও আমাদের মাঝে এই পার্থক্যই যথেষ্ট। প্রত্যেক পাত্র তা-ই ঢেলে দেয়, যা তার ভেতরে আছে।

ইসলামী নীতি-আদর্শের প্রবাদ পুরুষদের– যাদের পুরো জীবনীই আমি পাঠ করেছি, পাঠের পর আমার মনে হয়েছে, যখনই কোনো ধীমান নেতা, দক্ষ সমরবিদ এবং বাতিল ও কুফরী শক্তির মূলোৎপাটনকারী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে তখনই তার পেছনে কোনো না কোনো আলেম-ফকীহ তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেছেন। সুলতান সালাহউদ্দীনের বেলায়ও ব্যাপার তেমনই। তিনি নিজেই আলেম-উলামা ও ফকীহদের বিরাট সম্মান করতেন। তবে তার পেছনে এমন একজন আলেম-ফকীহ ও সুসাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে সুলতানের জীবনে। এখানে তার সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হলো।

## মহামান্য বিচারপতি

আল্লামা যাহাবী রহ. তার জীবনী উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, মহামান্য বিচারপতি, আলেম, ইমাম, বাগ্মী মুহিউদ্দীন আবু আলী আবদুর রহীম বিন আলী ইবনুল হাসান ইবনে আহমাদ ইবনুল মুফাররাজ আল-লাখমী, আশশামী ছিলেন সুলতানের ডানপার্শ্ব বা প্রধান উপদেষ্টা। তিনি ছিলেন খুবই স্পষ্টভাষী। জন্মগতভাবে তিনি আসকালানী ছিলেন। মিসরে বসবাস করতেন। তিনি

স্বনামধন্য লেখক ছিলেন এবং 'দিওয়ানে ইনশায়ে সালাহী'র অন্যতম রচয়িতা ছিলেন। তিনি ৫২৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেছেন।[২৬৭]

আল্লামা ইমাদ ইস্পাহানী রহ. তার ব্যাপারে লিখেছেন, তিনি একজন সৌভাগ্যবান বিচারপতি ছিলেন। তিনি কোনো ভালো কাজের ইচ্ছা করলে তা অগ্রাধিকার দিতেন। জান্নাত লাভের ব্যাপারে কোনো চুক্তি সম্পাদন করতে হলে তা বাস্তবায়ন করতেন। কোনো কল্যাণকর কাজ সমানে এলে তা পূর্ণ করতেন। তিনি গোলামদের ব্যাপারে বেশি ভাবতেন। তিনি কত গোলাম যে আযাদ করেছেন- তার কোনো হিসাব নেই। বিশেষ করে তিনি বন্দীদের মুক্ত করতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। তিনি মালেকী ও শাফেয়ীদের মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতেন। তিনি ইয়াতীম ছাত্রদের কিতাব ক্রয় করে দিতেন। তিনি সকলের মানবাধিকার রক্ষায় পূর্ণ সচেতন ছিলেন। বাস্তবেও তিনি সবার অধিকারের মর্যাদা দিতেন। সুলতান তাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। সুলতান তার নির্দেশনা অনুসারেই অঞ্চল বিজয় করতেন। তার ধনাঢ্যতা ছিল তুলনাহীন। আমি তার সৌন্দর্যের গুণগরিমা হিসাব করতাম। তার দয়া ও অনুগ্রহের কথা ভাবতাম। তার হাতের লেখা ছিল খুবই সুন্দর। তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল যুগশ্রেষ্ঠ। কল্যাণকামিতা ছিল অনন্য। তার বাগ্মীতাপূর্ণ কথাবার্তা ছিল রাষ্ট্র ও জনসাধারণের জন্য অমূল্য পাথেয়। বিশেষত সুলতান সালাহউদ্দীনের যুগ তার কারণে অন্য সকল যুগের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। তিনি প্রাচীন জ্ঞানীদের চেয়ে অধিক ফলপ্রসু কর্মকৌশল তৈরি করেছেন। তিনি মুকাতাব গোলামের মুক্তির জন্য কায়মনোবাক্যে দুআ করতেন। কেউ তার নিকট কিছু চাইলে তিনি কখনোই ফিরিয়ে দিতেন না।

তিনি আরও বলেছেন, আমি ভাবতাম, তার ইন্তিকাল হলে মানুষ কার কাছে যাবে? মানুষ কার কাছ থেকে উপকৃত হবে? কে সবার নেতৃত্ব দেবে? দূরদর্শী চিন্তা ও কৌশল উদ্ভাবন করে আর কেই-বা জনসাধারণের সুখ-সৌভাগ্য বয়ে আনবে?[২৬৮]

কবিগণ তার সুষ্ঠু-ব্যবস্থাপনা ও বাস্তব সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন। একই সাথে সুলতান সালাহউদ্দীনের রাষ্ট্রে সৃষ্ট সমস্যা ও বিশৃংখলা দমনে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রশংসাও করেছেন। তাছাড়া নামায, রোযা ও জ্ঞানপ্রীতির এবং বিনয়-সহনশীলতা, দয়া-দাক্ষিণ্য ও যুদ্ধ-জিহাদের মনোভাবেরও

---

[২৬৭] দেখুন, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২১ : ৩৩৮-৩৩৯।
[২৬৮] প্রাগুক্ত : ২১: ৩৪০।

গুণকীর্তণ করেছেন। কবি হিবাতুল্লাহ ইবনে সানাউল মুলক তার প্রশংসায় বলেন,

و أنت سعادته إلى أبوابه ✪ لا كالذي يسعى إلى أبوابها
فلتفتخر الدنيا بسائس ملكها ✪ منه و دارس علمها و كتابها
صوامها قوامها علامها ✪ عمالها بذالها وهابها.

সৌভাগ্য তার দুয়ারে এসে ধরা দিয়েছে। এমনভাবে নয়, যেমন ব্যক্তি সৌভাগ্যের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে-ফিরে।

দুনিয়া তার রাজ্য পরিচালনা ও তার জ্ঞান-গরিমার দ্বারা গর্ববোধ করছে।

দুনিয়ার সকল আবেদ-যাহেদ, দীনদার ও দানশীল ব্যক্তিবর্গও তার কথা স্মরণ করে গর্বিত।[২৬৯]

সুলতান সালাহউদ্দীন তার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি তার কাছে বারবার আসা-যাওয়া করতেন।

মহামান্য বিচারপতি রচনা ও পড়াশোনায় বিপুল অনুরাগী ছিলেন। তিনি সচ্চরিত্রবান, ধার্মিক, মুত্তাকী, সারারাত নফল-ইবাদাতে জাগরণকারী, রোযা ও তিলাওয়াতে মনোযোগী ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। যখন সেনাপতি আসাদউদ্দীন মিসর বিজয় করে নেন তখন তাকে তার সামনে উপস্থিত করা হয়। তিনি তাকে পেয়ে খুবই আশ্চার্যান্বিত হন। এরপর সুলতান সালাহউদ্দীন তাকে নিজের পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করেন।

তিনি মুখরোচক খাবার খুব কমই খেতেন। বেশি বেশি দান-সদকা করতেন ও জনকল্যাণমূলক কাজ করতেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। তিনি কুরআনের তাফসীর ও সাহিত্য পাঠে মশগুল থাকতেন। তিনি ব্যাকরণ খুব একটা জানতেন না। কিন্তু যা জানতেন, তা-ই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি পানাহার ও বস্ত্র-পরিচ্ছদ খুবই পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করতেন। তিনি বেশি বেশি জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করতেন। রোগিদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে তার গুণকীর্তন করা হতো। শারীরিক গঠনের

২৬৯ প্রাগুক্ত : ২১ : ৩৪১।

দিক দিয়ে তিনি দুর্বল ও কৃশকায় ছিলেন।[২৭০]

সুলতান সালাহউদ্দীন তার ব্যাপারে বলেন, তোমরা এ কথা মনে করো না যে, আমি তোমাদের তরবারির জোরে দেশ জয় করেছি; বরং আমি দেশ বিজয় করেছি মহামান্য বিচারপতির লেখনী শক্তির জোরে।[২৭১]

কবি ইমাদ ইস্পাহানী তার গুণকীর্তন করে বলেন,

عاينت طود سكينة و رأيت ✪ الشمس فضيلة ووردت بحر فواضل

ورأيت سحبان البلاغة سابحا ✪ ببيانه ذيل الفخار لوائل

حلف الحصافة و الفصاحة ✪ و السماحة و الحماسة و التقى و النائل

بحر من الفضل الغزير خضمه ✪ طامى العباب و ما له من ساحل

في كفه قلم يعجل جريه ✪ ما كان من أجل و رزق عاجل

أبصرت قسا في الفصاحة معجزا ✪ فعرفت أني في فهامة باقل.

আপনি চাকুর বাট ধরেছেন। সূর্যকে দীপ্ত দেখেছেন। আর শ্রেষ্ঠত্বের সমুদ্রে অবগাহন করেছেন।

আপনি অংলকার শাস্ত্রে বিরাট পারঙ্গম। এর দ্বারা আপনি গর্বকারীদের মাথা নিচু করে দিয়েছেন।

আপনি ভাষা-সাহিত্য, দয়া-মহানুভবতা, খোদাভীতিতে শ্রেষ্ঠতর।

আপনি শ্রেষ্ঠত্বের এমন অতল সমুদ্র, যার কোনো কূলকিনারা নেই।

আপনার হাতে রয়েছে একটি কলম। এর দ্বারা আপনি সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড ও ভাতা বণ্টনের কথা লিখেন।

আমি আপনার বাগ্মিতার একটু ঝলক দেখতে পেয়েছি। তখন বুঝতে পেরেছি যে, আমার বুঝ-বুদ্ধি খুবই নগণ্য।[২৭২]

---

[২৭০] দেখুন, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২১: ৩৪৩।
[২৭১] আন নুজূমুয যাহিরাহ : ৬: ১৫৭।
[২৭২] প্রাগুক্ত : ৬ : ৭৩-৭৪।

একবার মহামান্য বিচারপতি যখন সুলতান সালাহউদ্দীনের কাছে নিবেদন করলেন, যেন ইমাদুদ্দীন ইস্পাহানীকে তার সহকারী লেখকরূপে নিয়োগ দান করে। যাতে সে অনারবী ব্যক্তিবর্গের জীবনী সংকলন করতে পারে। তখন সুলতান সালাহউদ্দীন তাকে বললেন, আমার কাছে আপনি ছাড়া আর কেউ মুখ্য নয়। আপনি আমার লেখক ও উযির। আমি আপনার চেহারায় বরকতের ছাপ লক্ষ্য করেছি। সুতরাং আমি যদি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে লেখক নিযুক্ত করি তবে মানুষ আমার সমালোচনা করবে।[২৭৩]

তবে তারা উভয়ে একমত হন যে, মহামান্য বিচারপতি ইন্তিকাল করলে ইমাদুদ্দীন ইস্পাহানীকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হবে।

'আন নুজূমুয যাহিরাহ' নামক গ্রন্থের লেখক বলেন, মহামান্য বিচারপতির শ্রেষ্ঠত্ব ও বাগ্মিতার কথা উল্লেখ করার চেয়েও বেশি সমাদৃত। তার একটি কবিতা হলো,

وإذا السعادة لاحظتك عيونها ✪ نم فالمخاوف كلهن أمان

واصطد بها العنقاء فهي حبائل ✪ واقتد بها الجوزاء فهي عنان.

সৌভাগ্য যখন আপনাকে স্পর্শ করেছে তখন আপনি ঘুমিয়ে থাকুন। সকল বিপদ ও ভয়ের বিষয়ই এখন নিরাপদ। এর দ্বারা আপনি আনকা/অচিন পাখি শিকার করুন। কেননা এটি তো আপনার কৌশল। এর দ্বারা আপনি জাওযা পাহাড়ের খনি সঞ্চয় করুন। কেননা এটি আপনার উপকারে আসবে।[২৭৪]

মহামান্য বিচারপতি ছিলেন সুলতান সালাহউদ্দীনের নির্ভরস্থল। রাজ্যের গোপন বিষয়াদির শলা-পরামর্শদাতা। সুলতান তার মতামত না নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতেন না।[২৭৫]

সুতরাং সুলতান তার সাথে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করতেন; বরং ইমাদ ইস্পাহানী তার প্রসঙ্গে বলেন, সুলতান ছিলেন তার প্রসঙ্গে আস্থাশীল। তিনি ছিলেন সুলতানের পূর্ণ অনুগত। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব এবং বাস্তব জ্ঞান

---

[২৭৩] প্রাগুক্ত : ৬ : ৭৪।

[২৭৪] আন-নুজূমুয যাহিরাহ : ৬ : ১৫৭।

[২৭৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২: ৩৪০।

ও প্রজ্ঞায় বিরাট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।[২৭৬]

তিনি সুলতান সালাহউদ্দীনের জন্য রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন-কানুন রচনা করতেন। তিনি তাকে পাপে জড়ানো থেকে সতর্ক করতেন। সৈন্যবাহিনীর কারও উপর জুলুম করতে নিষেধ করতেন। কেননা তা হয়তো তার লাঞ্ছনার কারণ হতে পারে। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. তার ব্যাপারে বলেন,

মহামান্য বিচারপতি মিসরের দেখাশোনা করতেন। তিনি এখান থেকে সুলতানের প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদের যোগান দিতেন। প্রশাসনিক কাজ করতেন এবং সরকারি চিঠি-পত্র রচনা করতেন। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, এই দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের কারণ, পাপাচার বেড়ে যাওয়া। মানুষ হারাম কাজকর্মে জড়িয়ে পড়া। আল্লাহ তাআলা কেবল তার আনুগত্যপূর্ণ আমলই গ্রহণ করবেন। আর কেবল তার অভিমুখী হলে এবং তার নির্দেশনাবলি পালন করলেই সকল কষ্ট-বিপদ দূর করে দেবেন। সুতরাং অবরোধ কেন দীর্ঘ করা হবে না? অথচ সকল স্থানেই তো অন্যায়-পাপাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। সকল আমলের মাঝে কেবল সেই আমলই আল্লাহর কাছে পৌঁছে, যা কোনো পাপে জড়ানোর পর তাওবা করার পর করা হয়।

আরেক চিঠিতে লিখেছেন, আমাদেরকে রিযক দেওয়া হয় আমাদের অংশ থেকেই। আমরা যদি আমাদের সম্পদ সদকা করি তাহলে সদকার দ্বারা যতটুকু অংশ কমে যায় ততটুকু আল্লাহ পূর্ণ করে দেন। আমরা যদি সম্পদ দান-সদকা করি তবে এর কারণে আল্লাহ তাআলা আমাদের শত্রুদের দ্বারা আমাদেরকে বিপদে ফেলেন না। আমরা যদি তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমাদের পক্ষে করা সম্ভব এমন আমল করি তবে তিনি আমাদের জন্য এমন কাজের সুযোগ দান করেন, যা তার তাওফীক ছাড়া কখনো করা সম্ভব নয়। সুতরাং মানুষ কেবল নিজের ভাগ ও অংশ নিয়েই ঝগড়া-বিবাদ করে। অথচ সে তো পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছেই ফিরে যাবে। মানুষ যেন অধিক সৈন্য ও সহযোগীর বড়াই না করে। লড়াই করতে গিয়ে অমুক-তমুকের ওপর ভরসা না করে। মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর কারও মুখাপেক্ষী হলে তিনি বিজয় দান করবেন না। কেননা নুসরত ও বিজয় তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই করা হয়। আল্লাহ আমাদেরকে বিপদে ফেলবেন না- এ থেকে আমরা নিশ্চিত নই। আমরা আল্লাহর সাহায্য চাই এবং তার অনুগ্রহ কামনা করি। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের পাপের জন্য তাওবা ইস্তিগফার করি। যদি আমাদের দুআ

---

[২৭৬] আর-রাওযাতাইন : ২ : ২৪১।

কবুলের রাস্তা বন্ধ না করা হয়ে থাকে তবে তো আমাদের দুআ অবশ্যই তিনি কবুল করবেন। ভয়কারীদের চোখের অশ্রু তার খুবই প্রিয়। কিন্তু তারপরও পথে পথে নানান বাধা-প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের মহান নেতাকে সম্মুখ ও পশ্চাতের সকল বিপদাপদে উত্তম সহায়তা দান করুন।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. আরও বলেন, 'আর-রাওযাতাইন' গ্রন্থ প্রণেতা শায়খ শিহাবুদ্দীন এখানে মহামান্য বিচারপতির পক্ষ থেকে সুলতান সালাহউদ্দীনের কাছে পাঠানো আরও কয়েকটি চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলোতে প্রাঞ্জল ভাষায় ওয়ায-নসীহত ও জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে এমন কথাবার্তা লেখা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই মহান বাগ্মী-সাহিত্যিকের ওপর রহম করুন। এমন কল্যাণকামী উযিরের ওপর নিজ করুণা বর্ষণ করুন। এমন তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বকে নিজ রহমতের চাদরে আচ্ছাদিত করুন।[২৭৭]

এ ধরনের কীর্তিমান ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নিজ দীন-ধর্মকে সাহায্য করেন এবং নিজ ওলীদেরকে সঠিক পথে অবিচল থাকার সুযোগ দান করেন। মহান আল্লাহ তাআলা সুলতান সালাহউদ্দীনকেও এই মহামান্য আলেম, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, পরোপকারী উযির, দুনিয়াত্যাগী দরবেশ, দুআ কবুল হয় এমন বুযুর্গ ব্যক্তির দ্বারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন।

### ইন্তিকাল

এই মহামান্য বিচারপতি ৫৯৬ হিজরী সনে রব্বে কারীমের ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। আল্লাহ তাআলা তার কবরকে জান্নাতের বাগিচায় পরিণত করুন। আমীন![২৭৮]

'আন-নুজূমুয যাহিরাহ' গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, আল-মালিকুল আদিল আবু বকর ইবনে আইয়ুব ও মহামান্য বিচারপতির মাঝে মনোদ্বন্দ্ব ছিল। যখন মহামান্য বিচারপতির কাছে এ সংবাদ পৌঁছল যে, আল মালিকুল আদিল মিসর আসছেন তখন তিনি আল্লাহর কাছে এই দুআ করেন যে, তিনি যেন তাকে নিজের কাছে নিয়ে যান। সুতরাং আল-মালিকুল আদিল মিসরে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। আল মালিকুল আদিল যখন বাবুন নসর দিয়ে মিসরে প্রবেশ করছিলেন তখন মহামান্য বিচারপতির লাশ যাবীলা নামক দরজা দিয়ে বের করা হচ্ছিলো।[২৭৯]

---

২৭৭ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২ : ৩৬১।
২৭৮ দেখুন। সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২১ : ৩৪৩।
২৭৯ দেখুন : আন-নুজূমুয যাহিরাহ : ৬ : ১৫৭।

## মহান বিজেতা সুলতান সালাহউদ্দীনের ইন্তিকাল

আমি এখন সুলতান সালাহউদ্দীনের জীবনী সমাপ্ত করার ইচ্ছা করছি এবং তার জীবনের শেষ কিস্তি লেখার আগ পর্যন্ত উপনীত হয়েছি। আমার দু' চোখ ছাপিয়ে এখন কেবল অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে এবং কুফর শক্তির হাত থেকে ইসলামের গৌরব ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনা ইসলামের এই মহান সেবক ও গর্বিত সেনাপতির ব্যাপারে ভালোবাসায় অন্তর আবেগাপ্লুত হয়ে উঠছে। তিনি হিজরী ৫৮৯ সনে ইন্তিকাল করেন।

ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে পাওয়া যায়, দামেশকবাসী তার ইন্তিকালের ন্যায় আর কোনো সময় এতো বেশি শোকাতুর হয়নি। তাদের প্রত্যেকের কামনা ছিল, যদি নিজ সন্তান, নিজ বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীর বিনিময়ে সুলতানের জীবন ফিরে পাওয়া যেত তবে তারা সেজন্যেও প্রস্তুত। যখন সুলতান মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তার পাশে বসে কেউ একজন তিলাওয়াত করছিল,

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.

তিনিই আল্লাহ্ তাআলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা।[২৮০]

তখন সুলতান সালাহউদ্দীন রহ. বললেন, আল্লাহ তাআলার বাণী সত্য ও যথার্থ।

যখন ফজরের আযান দেওয়া হলো তখন প্রধান বিচারপতি তার কাছে এলেন, তিনি তখন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন। জনৈক তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াত করলেন,

لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ.

আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই।[২৮১]

তখন তিনি হেসে দিলেন। তার চেহারায় আনন্দের দ্যুতি ছড়িয়ে গেলো। তিনি মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমালেন। তিনি ইন্তিকাল

---

[২৮০] সূরা হাশর : ২২।
[২৮১] সূরা তাওবা : ১২৯।

করলেন এবং জান্নাতে নিজ আবাসস্থল বানিয়ে নিলেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। এরপর লোকেরা তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করলো। তার সকল সন্তানাদি ও পরিবারের লোকজন তাকে দেখতে উপস্থিত হলো। দেশের শ্রেষ্ঠতম খতীব ফকীহ আদ-দাওয়ানী তাকে গোসল দান করেন। মহামান্য বিচারপতি সুলতানের নিজস্ব হালাল সম্পদ থেকে তার কাফন ও গোসলের সরঞ্জামাদি ক্রয় করেন। ইমাম ইবনুয যাকি লোকদের নিয়ে তার জানাযার নামায পড়ান। এরপর দামেশকের মনসুর কিল্লায় তার ঘরের আঙিনায় তাকে দাফন করা হয়। তার জ্যৈষ্ঠ্য পুত্র, যে তখন সিরিয়ার সুলতান হিসেবে মনোনীত হয়েছে সে কবরে নেমে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিল।

বলা হয়, তার সাথে তার ওই তরবারিও দাফন করে দেওয়া হয়, যা দিয়ে তিনি জিহাদের ময়দানে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেন। আর এটি করা হয়েছিল মহামান্য বিচারপতির নির্দেশক্রমে। তারা এটা শুভকর মনে করেছেন যে, এটি কিয়ামতের দিন তার সঙ্গী হবে। তিনি এতে ভর দিয়ে কিয়ামতের ময়দানে উঠবেন এবং আল্লাহর দয়ায় ইনশাআল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

সুলতান সালাহউদ্দীনের মৃত্যু মুলমানদের কাছে বজ্রপাতের ন্যায় মনে হলো। কেননা তার উপস্থিতি ছিলো তাদের জন্য অশেষ কল্যাণ ও জননিরাপত্তার অন্যতম আঁকড়। কাজী ইবনে শাদ্দাদ সেদিনকার মর্মবিধুর ঘটনার স্মৃতিচারণ করে বলেন, যেদিন সুলতান মৃত্যুবরণ করেন, খোলাফায়ে রাশেদীনের ইন্তিকালের পর এরূপ শোকাবহ দিন মুসলমানদের জীবনে আর আসেনি। সকল কেল্লা, রাজ্য ও সারা দুনিয়ায় এমন এক শোকের আবহ তৈরি হলো, যা কেবল আল্লাহই মোচন করতে পারেন। আল্লাহর কসম! আমি মানুষদেরকে এমন কথাও বলতে শুনেছি যে, তাদের কাছে সবচে প্রিয় ব্যক্তির বিনিময়ে যদি তারা তাদের সুলতানের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হতেন তবে তারা তা করতে একপায়ে প্রস্তুত। ওই দিনের আগ পর্যন্ত আমি মনে করতাম, মানুষ কি কখনো এরূপ কথা ভাবতে পারে? কিন্তু সেদিন আমি নিজেই নিজের ভেতর থেকে এবং অপরাপর মানুষের অবস্থা দেখে অনুভব করতে পারলাম যে, যদি জীবনপণ দেওয়া বৈধ হতো তবে আজ আমিই আমার জীবন দান করতাম।[২৮২]

সুলতান সালাহউদ্দীন রহ. ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান নেতা ও শাসক। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের সুসমৃদ্ধ পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছেন। বিশেষত তিনি সুলতান নূরুদ্দীনের যুগে জীবনের কৈশোর পেরিয়েছেন এবং তার পূর্ণ যুগের সুফল

---

[২৮২] আন-নুজূমুয যাহিরাহ : ৬ : ৫২।

উপভোগ করেছেন। যুগের ওই উৎকর্ষই তাকে এমন বিরাট ও মহান নেতায় পরিণত করেছে– যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার সাফল্য দান করেছেন।

## সুলতান সালাহউদ্দীনের জীবনের বিশেষ দিকসমূহ

**এক.**

তিনি উলামায়ে কেরামের সান্নিধ্য গ্রহণ করতেন। তাদেরকে পছন্দ করতেন। অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাদেরকে ভালোবাসতেন। বরং তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে শলা-পরামর্শ করতেন এবং প্রত্যেককে যথাসম্মান ও মর্যাদা দান করতেন। তিনি মাদরাসা ও জ্ঞানের পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করতেন। জ্ঞানের মজলিসে স্বয়ং তিনি নিজেই উপস্থিত হতেন। সুলতান সালাহউদ্দীন নিজ দুপুত্র আলী ও উসমানকে সঙ্গে নিয়ে ইস্কান্দারিয়ার মাদরাসায় গমন করতেন এবং সেখানকার উচ্চপদস্থ আলেম-উলামাদের দরসের মজলিসে বসতেন। তিনি বিশিষ্ট আলেম কামাল উদ্দীন শাহরাযূরী রহ. কে উযিরের পদমর্যাদা দান করেছিলেন।

সুলতান সালাহউদ্দীনের অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন বিশিষ্ট ওয়ায়েয ও আলেম ইবনে নাজা হাম্বলী রহ.। তার মহামান্য উযির ও বিচারপতি ছিলেন একজন বড় মাপের লেখক। তিনিও ইলম ও আহলে ইলমদেরকে ভালোবাসতেন। তাদের মাঝে আরও আছেন, নাজমুদ্দীন আল খবুশানী ও আল ফকীহুশ শাফেয়ী। তিনিই সুলতান সালাহউদ্দীনকে উবায়দিয়া সাম্রাজ্য বিনাশ ও মূলোৎপাটনে সবিশেষ উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন। সুলতান সালাহউদ্দীন তার জন্য একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে দেন এবং তাকে এর শিক্ষাদীক্ষা দেখভাল করার দায়িত্ব প্রদান করেন। তার একটি ফিকহ বোর্ড ছিল। ফকীহ আল হাকারী রহ. বলেন, সুলতান সালাহউদ্দীন ছিলেন একজন সাহসী ও সম্মানিত সৈনিক। তিনি শায়খ আবুল কাসিম আল বারাযীর নিকট দীনের জ্ঞানার্জন করেছেন। তিনি সালাহউদ্দীনকে এমন এমন কাজ ও দায়িত্ব প্রদান করতেন, যা তিনি ছাড়া আর কেউ পালন করতে সক্ষম নয়। তিনি যখন ইন্তিকাল করেন তখন সালাহউদ্দীন 'আক্কা' নামক শহর অবরোধ করে রেখেছিলেন।[২৮৩]

---

[২৮৩] ওফায়াতুল আয়ান : ৩ : ৪৯৭।

যখন কোনো আলেম তার সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন তখন তিনি তার খুবই যত্নআত্তি করতেন। যাওয়ার সময় তিনি তাকে তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ও উপহার-উপঢৌকন প্রদান করতেন।

কর্মজীবনে তার বিপুল সাফল্য ও বিজয় অর্জিত হয়েছে নিঃসন্দেহে আমীর-উমারা ও আলেম-উলামাদেরকে যথাযথ মূল্যায়ন করার কারণে। কাজি ইবনে শাদ্দাদ রহ. বলেন, তিনি প্রতিদিন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আদালত বসাতেন। বছরে বায়ান্ন দিন তিনি আলেম-উলামা ও বিচারকদের নিয়ে মজলিস করতেন। সফরে থাকলেও তিনি এ অভ্যাস জারি রাখতেন।[২৮৪]

আলে মাকদিসী- যারা দামেশকের সালেহিয়্যায় বসবাস করতো, যেমন আবু উমর মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে কুদামা, তার ভাই, তার মামাতো ভাই হাফেয আবদুল গনী ও শায়খ ইমাদ। সুলতান সালাহউদ্দীন কোনো যুদ্ধে গেলে তারা তাতে অংশ গ্রহণ করা থেকে পিছিয়ে থাকতেন না। তারা তার সাথে আল-কুদস, সাওয়াহিল ও অন্যান্য অঞ্চলে সংঘটিত যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন।[২৮৫]

যেসব নেতৃবর্গ জেনে বুঝে আলেম ও ফকীদেরকে মূল্যায়ন করেন এবং তাদেরকে যথাযথ সম্মাননা প্রদান করেন কার্যক্ষেত্রে তারা সফলও হন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে থাকেন।

নিশ্চয় যারা উম্মাহর আলেম, চিন্তাশীল ব্যক্তি, মুরুব্বী, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও চেতনা বিতরণকারী ব্যক্তিদের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয় তারা মূলত ইহুদি, খ্রিস্টান, বাতিল ও বিদআতীদের কর্মপন্থা অনুসরণ করে। তারা সেটা বুঝুক আর না বুঝুক। আর যারা উলামায়ে কেরামকে ক্রমাগত গালিগালাজ করে এবং তাদের ব্যাপারে অন্যায়-অনৈতিক মনোভাব পোষণ করে তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতাদর্শ থেকে দূরে অবস্থান করে। তারা পূর্ববর্তী হোক বা পরবর্তী- তারা সদা-সর্বদা কল্যাণ ও পুণ্যের ধারক-বাহক এবং সূক্ষ্ম বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। সুতরাং সর্বদা তাদের ব্যাপারে ভালো কথা বলতে হবে এবং তাদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতে হবে। যারা তাদের ব্যাপারে

---

২৮৪. প্রাগুক্ত : ৩ : ৯৪।
২৮৫. দেখুন, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩১-৩৯।

কোনো মন্দ ও অশুভ কটূক্তি করবে তারা বিপথগামী।[২৮৬]

আমি অনেক লোককে দেখেছি, যারা আলেম-উলামা, ফকীহ-মুহাদ্দিস ও দাঈদের নিয়ে বিদ্রুপ করে। তারা বরং কোনোরূপ প্রমাণ ছাড়াই ইসলামি আন্দোলন ও সংগ্রামে নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তির ব্যাপারে মারাত্মক বক্তব্য প্রদান করে। তারা এরূপ করে অজ্ঞতাবশত, বিদ্বেষবশত এবং দীনের ব্যাপারাদিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য স্বরূপ। কেউ কেউ তো আলেমদের গীবত করে এবং তাদের ব্যাপারে অবান্তর সমালোচনা করে খুবই মজা পায়। তারা বক্তৃতার মঞ্চে, পত্রিকা-ম্যাগাজিনে এসব প্রচার করে বেড়ায়। কেউ যদি গণমাধ্যমে এসব অপপ্রচার চালানোর সুযোগ পায় তবে সে খুশিতে ডগমগ করতে থাকে। এই নরাধম তো জানে না যে, উলামায়ে কেরামের গীবত করা কত মারাত্মক। আর আল্লাহ তাআলা তাদের বিরুদ্ধাচারণকারীদের অবশ্যই মূলোৎপাটন করে ছাড়বেন। এই পাপী তো জানে না যে, মর্যাদার আধিক্যের দ্বারা ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণিত হয়।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, যে ব্যক্তির শরীয়ত ও দুনিয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে তিনি অবশ্যই জানেন যে, ইসলাম ও শরয়ী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিপুল অবদান রেখেছেন এমন অনেক মহান সাধকপুরুষ রয়েছেন, তারা কদাচিৎ কিছু কিছু বিষয়ে জমহুর আলেম-উলামাদের মতাদর্শের বিপরীতে এমন এমন মতপোষণ করেন কিংবা এমন এমন কাজ করে থাকেন, যা দৃশ্যত ভ্রান্তি বলে দৃষ্টিগোচর হয়। তবে তিনি ইজতিহাদ বা শরয়ী বিধানের তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য এসব ক্ষেত্রে নিন্দাবাদের শিকার হলেও নিজ কাজ ও কর্মের জন্য সাওয়াব লাভ করবেন। মতবিরোধপূর্ণ এসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে মুসলমানদের মনে তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার সৃষ্টি করা মারাত্মক অপরাধ।[২৮৭]

ইসলামের সোনালি ইতিহাস আমাদের সম্মুখে আলেম-উলামা, দীনের দাঈ ও কর্মীদের প্রতি ভক্তি-সম্মান ও তাদের যথাযথ মর্যাদা দানের কথা স্পষ্টভাষায় বর্ণনা করেছে। সুতরাং যারা ইসলামি ইতিহাসের সোনালি দিনগুলো এবং মুসলমানদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে ভূমিকা ও অবদান রাখতে প্রত্যাশী তারা যেন সর্বোত উপায়ে উলামায়ে কেরামের শান ও মর্যাদা দানে কোনোরূপ কসুর না করেন। একই সাথে তারা যেন জনসাধারণের মনে আলেম-উলামাদের ভক্তি-সম্মান ও মুহব্বতের আবশ্যকতা প্রতিভাত করে দেন। পাশাপাশি তারা

---

২৮৬ শারহুত তাহাবিয়্যা : ২ : ৭৪০।
২৮৭ ইলামুল মুআক্কিয়ীন : ৩ : ২৮৩।

যেন ওই সকল লোকদেরকে শক্ত উপায়ে প্রতিহত করেন, যারা সারাক্ষণ আলেম-উলামাদের পেছনে পড়ে থাকে। তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে এবং অবান্তর নিন্দাবাদ করে বেড়ায়। যাতে বুর্বকরা যুবক শ্রেণির মনে আলেম-উলামাদের ব্যাপারে হীন ও তুচ্ছ মনোভাব সৃষ্টি করতে না পারে। অন্যথায় আমাদের সবার দুনিয়াও বরবাদ হবে, আখেরাতও বরবাদ হয়ে যাবে।

দুই.

সুলতান সালাহউদ্দীনের জীবনের সবচে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল, জিহাদের প্রতি বিপুল ভালোবাসা। কাজি ইবনে শাদ্দাদ রহ. বলেন, সুলতান জিহাদের প্রতি খুবই অনুরাগী ছিলেন। জিহাদের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। কোনো ব্যক্তি যদি এই মর্মে কসম করে যে, তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পর থেকে কোনো দিনার খরচ করলে তা কেবলই জিহাদের পথে ও প্রতিরোধ-সংগ্রামে ব্যয় করেছেন তবে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না; বরং তার শপথই সঠিক ও সত্য বিবেচিত হবে। জিহাদ তার দেহ ও মন-মননে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছিল। কারণ তিনি সারাক্ষণ এই বিষয়েই কথা বলতেন। সারাক্ষণ যুদ্ধ সরঞ্জাম দেখে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কাটাতেন। যোদ্ধা ও সৈনিকদের বেশি গুরুত্ব দিতেন। কেউ যুদ্ধ-জিহাদ সম্পর্কে কিছু বললে বা এ সম্পর্কে কোনো আলাপচারিতা জমালে তিনি তার প্রতি মনোনিবেশ করতেন। জিহাদের ভালোবাসায় তিনি নিজ পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তানাদি, নিজ দেশ ও আবাস ছেড়ে দূর-দূরান্তে সফর করতেন। দীনের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ-জিহাদ ও সংগ্রামে নিবেদিত হওয়ার সুবিধার জন্য তিনি তাঁবুতে দিন কাটাতেন। যা বাতাসের দোলায় ডানে-বামে দুলতো- হেলে পড়তো। কেউ যদি সুলতানের নৈকট্য অর্জন করতে চাইতো তবে তিনি তাকে জিহাদের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন।

আমরা আক্কা নামক শহর বিজয় করার মানসে সুলতানের সঙ্গে নদীর তীর ধরে সফর করেছি। তখন ছিল কনকনে শীতের দিন। সমুদ্র ছিল খুবই উত্তাল। এর একেকটি ঢেউ ছিল পাহাড় সমপরিমাণ। সেবারই আমি প্রথম সমুদ্র দেখি। সেটা আমার কাছে খুবই বিশালাকায় মনে হয়। আমি ভেবে পেলাম না, মানুষ কী করে এই উত্তাল তরঙ্গের মাঝে, সমুদ্রবক্ষে সফর করে বেড়ায়! আমি যখন এসব কথা চিন্তা করছিলাম তখন সুলতান আমার দিকে ফিরে তাকালেন এবং একাকীই বলতে লাগলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যখন আমাকে বাকি অঞ্চলসমূহ বিজয় করার তাওফীক দেবেন তখন আমি সারা দেশকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করবো। শাসনভার যোগ্য কারো হাতে ন্যাস্ত করে পরিবার-পরিজনের কাছ

থেকে শেষ বিদায় নিয়ে বেড়িয়ে পড়বো। এই আরব সাগরের বুক চিড়ে আমি জাযিরাতুল আরবের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাবো এবং পৃথিবীর বুকে আল্লাহর নাফরমানি করে এমন কাউকে রাখবো না। অন্যথায় আমি মৃত্যুবরণ করবো।

তখন তার এই কথাটি আমার কাছে খুবই বিরাট কথা হিসেবে প্রতিভাত হলো। আমি তাকে আমার মনের কথা খুলে বললাম। পাঠক! তুমি তার এই পবিত্র মনোবৃত্তির দিকে তাকাও। দেখো! তিনি কতো দুঃসাহসী ও নির্ভীক!

হে আল্লাহ! আপনি জানেন, সুলতান কেবল আপনার দীনের সহায়তার জন্যই নিজের সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করেছেন। আর তা কেবলই আপনার রহমত লাভের প্রত্যাশায়। সুতরাং আপনি তার ওপর রহম করুন।

তার ধৈর্যের কথা কী বলবো! আমি তাকে আক্কা শহরের উপকণ্ঠে দেখলাম, তিনি খুবই অসুস্থ। অধিক সফর ও যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশগ্রহণের কারণে তার পায়ের হাঁটুতে মারাত্মক ক্ষত তৈরি হয়েছিল। এর কারণে তিনি ঠিকমতো বসতেও সক্ষম ছিলেন না। এতদসত্ত্বেও তিনি ভোর প্রত্যুষে উঠে অযু-ইস্তিঞ্জা সেরে ফজরের নামায পড়তেন এবং চাশত ও ইশরাকসহ অন্যান্য নামাযও পড়তেন। ব্যথার যন্ত্রণায় তিনি তীব্র কষ্ট সহ্য করতেন। একই সঙ্গে এ কথাও বলতেন, আমি যখন যুদ্ধের জন্য বাহনে আরোহণ করি তখন তা থেকে নামার আগ পর্যন্ত কোনো ব্যথা অনুভব করি না।[২৮৮]

বর্তমান সময়ে ভ্রান্তি ও গর্হিত বিষয়ে আমাদের পদস্খলন ব্যাপক হয়ে গেছে। এর অন্যতম নিদর্শন আফগানিস্তান। সভ্যতার এই উত্তর আধুনিক যুগে সেখানে মানবতার কীরূপ মারাত্মক অবনতি ঘটেছে! তবে কোনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে ব্যক্তিবিশেষ সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে দীনের পক্ষে যুদ্ধ-জিহাদ করে যাচ্ছেন। তারা নিজেদের মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে দেশ-সমাজ ও জনগণের মনস্তত্ত্ব পরিবর্তনের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আল্লাহর দীন সম্পর্কে তাদের জানাশোনার পরিধি ও পরিমাণ খুবই সীমিত। বিশেষত ধর্মীয় রাজনীতি, জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে শরয়ী দণ্ডবিধি কার্যকর করার উদ্যোগ ও ভূমিকা খুবই কম। জাতিগত পরিবর্তনের কর্মসূচি খুবই অপ্রতুল। অনেকে আছেন ফতোয়া ও বিধিবিধান প্রকাশের কাজে ব্যস্ত। সেগুলো তারা বড় বড় কিতাবাদি দেখে সংকলন করে থাকেন। যুব সমাজকেও তারা এরই আলোকে গড়ে তোলেন।

---

[২৮৮] আর-রাওযাতাইন : ২ :২২১-২২২।

রাষ্ট্র ও প্রশাসনযন্ত্রের শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাদের সাহসী পদক্ষেপ নেই। যা খুবই দুঃখজনক। তারা শরীয়তের জিহাদী কর্মকাণ্ড থেকে পিছিয়ে থাকেন মূলত কয়েকটি কারণে। তারা মনে করেন,

জিহাদ হলো জাতিগত অধিকার। তা কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠিবিশেষের জন্য প্রযোজ্য নয়। আর এই মত তাদের নির্বাচিত আলেম-ফকীহ ও জ্ঞানী লোকদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। এই প্রচার-প্রচারণার আলোকেই তারা জনসমাজকে দীনের বুঝ ও সমঝ দান করে থাকেন। এই ধারণার ভিত্তিতেই তারা বয়ানের ফুলঝুড়ি ছুটিয়ে থাকেন। আর এসবই হয়ে থাকে আলেম ও ফকীহদের তত্ত্বাবধানে, তাদেরই নির্দেশনায়। আমরা যে জাতির কথা বলছি, যদি তাতে কোনো আলেম ও ফকীহ না পাওয়া যায়, তবে অবশ্যই তাদের সন্তানাদির মধ্যে কাউকে না কাউকে দীনের সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য এবং প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে জ্ঞানাহরণের জন্য পাঠায়। যাদের ব্যাপারে উম্মত জ্ঞানী হওয়ার কথা সর্বসম্মতভাবে বলে থাকে। যাতে পরে তারা (জিহাদের ন্যায় এই উত্তম) কর্ম সম্পাদন করতে পারে। যাতে উম্মত তাদের সমস্যা নিরসনে তার কাছ থেকে সঠিক সমাধান ও নির্দেশনা পেতে পারে। আর সে তাদের হাত ধরে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যেতে পারে। বিশেষত আমাদের বর্তমানের এই নাযুকতম সময়ে- যখন ফিতনা-ফাসাদ উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যেমন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ- এর দায়ভার ও দায়িত্ব সর্বদা জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান আলেম-উলামাদের কাঁধেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا.

আর যখন তাদের কছে পৌছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌছে দিত রাসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুত: আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত![২৮৯]

---

[২৮৯] সূরা নিসা : ৮৩।

এ দায়িত্ব ওই ব্যক্তির নয়– যার জীবন কেটেছে নির্মাণ প্রকৌশল বিভাগে, বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপনায় কিংবা যার জীবন অতিবাহিত হয়েছে অসুস্থ রোগীদের রোগ নির্ণয়, প্রেসক্রিপশন লেখায় বা দেহের কোনো অঙ্গের কাটা-ছেঁড়া জোড়া লাগানোর কাজে কিংবা ভিন্ন কোনো শাস্ত্রে। এরপর সে কোনো কিতাবাদি পড়ে নিয়েছে। তা মুখস্থ করেছে এবং নিজের বুঝ-বুদ্ধির আলোকেই তার মর্ম উদ্ঘাটন করতে চেয়েছে। এরপর তার অসম্পূর্ণ বুঝ-বুদ্ধির ঢেঁকি নিয়ে প্রজ্ঞাবান আলেম-উলামা, ফকীহ ও তাদের ইসলামি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী মনোভাব লালন করেছে। অথচ সেসব বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিকা কর্মকাণ্ডের কর্মসূচি প্রদান করেছেন এমন আলেম, ফকীহ ও দাঈ ব্যক্তিবর্গ– পুরো উম্মাহ যাদের জ্ঞানগরিমা, নিষ্ঠা ও সততার পূর্ণ সত্যায়ন করেছে।

একইভাবে এই দায়িত্ব এমন ব্যক্তির ওপরও বর্তায় না, যারা কেবল পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বই-পত্র প্রকাশনায় কিংবা প্রিন্টমিডিয়ায় কর্মে নিরত থেকে জীবন অতিবাহিত করেছেন। তারা ভ্রান্ত চিন্তাচেতনা লালনকারী নেতৃবর্গের অনুসরণ করেছেন কিংবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উস্কে দেয় এমন গ্রন্থাদি পড়েছেন। যেমন চীনে মাওসেতুং, ল্যাটিন আমেরিকায় চে গুয়েভারা। তারা আমাদের মহান নেতা ও আদর্শ সুলতান নূরুদ্দীন ও সালাহউদ্দীনের ন্যায়, তাদের পূর্বে সাইয়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মদ মুস্তফা সা. ও তাঁর একনিষ্ঠ সঙ্গীসাথী ও সাহাবীদের মত ও পথ অনুসরণ করা থেকে দূরে থেকেছে। তারা বরং যুবক শ্রেণিকে তাদের স্বার্থান্ধ চিন্তাধারার দিকে ঠেলে দিতে চায়।

আল্লামা ইবনে সাদী রহ. উপর্যুক্ত আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দাদেরকে অযাচিত কর্মে নিরত না হওয়ার পথনির্দেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের উচিত হলো, যদি কখনো তাদের সম্মুখে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বা জাতীয় কল্যাণ সম্বলিত কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়- চাই তা জাতীয় নিরাপত্তার বা মুমিনদের খুশি-আনন্দের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক কিংবা তাদের কোনো বিপদ ও দুর্যোগজনিত বিষয় হোক তাহলে তারা যেন তখন আপন আদর্শে দৃঢ়পদ থাকে। উক্ত বিষয়টি দ্রুত প্রচার-প্রসার না করে। বরং তারা যেন সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সা. এর নির্দেশনা অনুসরণ করে এমন জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেয়- যারা প্রকৃতার্থে সিদ্ধান্তদাতা। তারা এমন ঐশী জ্ঞানগরিমা, কল্যাণকামিতা, মেধা-বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী, যার মাধ্যমে তারা কোনো বিষয়ে কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ণয় করার যোগ্যতা রাখেন। যদি তারা উপস্থিত বিষয়ে

কল্যাণ দেখেন তবে তা করার নির্দেশ দেবেন। আর যদি কল্যাণের সাথে বিরাট কোনো ক্ষতি সংশ্লিষ্ট দেখতে পান তবে তারা তা প্রচার-প্রসার করবেন না। এ কারণেই আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ অর্থাৎ তারা নিজেদের আদর্শিক চিন্তাচেতনা, সুষ্ঠু-সঠিক সিদ্ধান্ত এবং ঐশী জ্ঞান-প্রজ্ঞার আলোকে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত দান করবেন।

এই ব্যাখ্যা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বের হয়ে আসে। তা হলো, যদি কখনো কোনো বিষয় সামনে আসে তবে তা উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হবে। নিজে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। এতেই অবস্থার প্রেক্ষিতে সঠিক ও প্রয়োজনীয় পন্থা ও উপায় বের হয়ে আসবে। এর মাধ্যমেই ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

একই সঙ্গে তাড়াহুড়ো না করা এবং বিষয়টি শোনার সাথে সাথে তা দ্রুত প্রচার-প্রসার করতে নিষেধ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো বিষয়ে কথা বলার আগে ভালোমতো চিন্তা-ভাবনা করে নেওয়া উচিত। বিষয়টি এ দৃষ্টিকোণ থেকে গভীরভাবে ভাবা ও পর্যবেক্ষণ করা যে, এতে কী কল্যাণ আছে, তাহলে মানুষ তা করতে অগ্রসর হবে। আর কী অকল্যাণ আছে, তাহলে মানুষ তা থেকে বিরত থাকবে।[২৯০]

নিশ্চয় শরয়ী বিষয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করার যাবতীয় পথনির্দেশনা ও কর্মসূচি প্রদান করবেন বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম। যারা জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতায় অগ্রগামী। শরয়ী জ্ঞানবিজ্ঞানে যাদের প্রচুর জ্ঞান ও দক্ষতা রয়েছে। যারা কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ণয় করতে সক্ষম। যারা শরয়ী ও যুক্তিভিত্তিক বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ জানেন। নবযৌবনে পদার্পণকারী যুবশ্রেণির জন্য নিজেদের মূল্যবান সময়টুকু অযথা তর্ক-বিতর্ক ও প্রশ্ন-আপত্তিতে ব্যয় করা উচিত নয়। কেননা তারা তো এখনও তাদের শায়খদের জ্ঞান ও ইলমের দরসে বসে এতটুকু গভীর জ্ঞান অর্জন করেনি, যদ্দারা তারা নিজেরাই জিহাদ ও সংগ্রামের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো ফতোয়া দিতে পারবে। অথচ জিহাদ ও সংগ্রাম এমন একটি ব্যাপার যে, এর ঘোষণা দিলেই অসংখ্য প্রাণ বিসর্জন যাবে, অঢেল অর্থ-সম্পদ খরচ হবে এবং অন্যান্য নানান সমস্যা ও উপসর্গও দেখা দেবে।

আল্লাহর পথের মহা সংগ্রামী যোদ্ধা সুলতান সালাহউদ্দীন রহ.-এর জীবনী

---

[২৯০] তাফসীরে সাদী : ২ : ৫৪-৫৫।

অধ্যয়নের পর আমাদের সম্মুখে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, তাদের যুগে যারা ফতোয়া প্রদান করতেন, তারা ছিলেন শরীয়ত ও তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞানগরিমার অধিকারী। তারা কল্যাণ-অকল্যাণের মাঝে পরিপূর্ণরূপে সাযুজ্যতা ও সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে পারতেন। কেননা তারা যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বেড়ে উঠেছেন তা তাদেরকে কল্যাণ ও অকল্যাণ অনুধাবনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

আমি আমার মুসলিম ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে এ কথা নিবেদন করতে চাই যে, তারা যেন এমন ব্যক্তির পেছনে না পড়ে যে কেবল মুখে বিতর্ক করতে জানে। অথচ তার ব্যাপারে ফতোয়া দানের যোগ্য ব্যক্তি বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। একই সঙ্গে মানুষ যেন ওই ব্যক্তির দীন-ধর্ম ও মতাদর্শ গ্রহণ না করে। তবে যাদের ব্যাপারে উম্মত জ্ঞান-প্রজ্ঞা রয়েছে বলে স্বীকৃতি দেয় এবং বাস্তবেই ইলমের প্রতি তার বিপুল অনুরাগ রয়েছে তাদের থেকেই যেন ইসলামের বিষয়ে যাবতীয় নির্দেশনা গ্রহণ করে। মানুষ যেন উলামাদের হাতে হাত রেখে ইলম ও জ্ঞান শিক্ষা করে। তারা যেন ইলম অর্জনে ধৈর্য অবলম্বন করে।

কেননা দীন ও দীনের বুঝ ও সমঝ হচ্ছে তোমার হাড্ডি, গোশত ও রক্ত। সুতরাং ভেবে দেখো, তোমরা কার কাছ থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করছো? তোমরা তা এমন আত্মগর্বী লোকের কাছ থেকে গ্রহণ করো না, যারা মাত্র জ্ঞানবিজ্ঞানের কয়েকটি পাতা উল্টে-পাল্টে পড়ে নিয়েছে, একেই নিজের বিরাট বুঝ-বুদ্ধির প্রমাণ সাব্যস্ত করেছে এবং নিজেকে নিয়ে বড়াই করেছে।

নিশ্চয় শরয়ী জ্ঞান হচ্ছে এমন জ্ঞান- যা পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত হয়। সুতরাং কেবল বইয়ের পাতা থেকে পড়ে কিছু কথা শিখে নিলেই যে দীন শেখা হয়ে গেছে তা বলা যাবে না। বরং কখনো কখনো কেবল বইয়ের পাতা থেকে জ্ঞানাহরণের দ্বারা অনেক সমস্যা ও সংকটও তৈরি হয়। একই সমস্যা হবে, যদি যুবকরা কোনো কামেল শায়খের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন না করে কেবল নিজেরা বসে কিছু কিতাবাদি অধ্যয়ন করে নেয়।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام

যে ব্যক্তি কেবলই বইয়ের পাতা থেকে জ্ঞানাহরণ করে সে আহকাম বা বাস্তবজ্ঞান বিনষ্ট করে দেয়।[২৯১]

[২৯১] তাজকিরাতুস সামি, ইবনে জামাআহ : ৮৭।

পূর্ববর্তী আলেমগণ বলেছেন, من أعظم البلية تشييخ الصحيفة সবচেয়ে বড় দুর্যোগ হলো (শিক্ষক বাদ দিয়ে) কেবল বই-কিতাব থেকে জ্ঞানাহরণ করা।[২৯২]

যুগের আবর্তন-বিবর্তনের পর উম্মাহর আলেমগণ নিজেদের মাথার ওপর কোনো নির্দিষ্ট পতাকা উত্তোলন করেন না। তারা কোনো অবুঝ বুলি ও থিওরির দিকেও মানুষকে আহ্বান করেন না। তারা মানুষের কাছে এ-ও কামনা করেন না যে, তারা তার দিকে ঝুঁকে পড়ুক। তারা বরং সদাসর্বদা মানুষ থেকে এটাই কামনা করেন যে, তারা যেন সাইয়্যিদুল মুরসালীন নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সা. এর সুন্নাহর দিকে ধাবিত হয়।

প্রিয় ভাই! তুমি খারেযিদের মতো হয়ো না, যারা জ্ঞানী ও মর্যাদাবান সাহাবায়ে কেরামকে পরিত্যাগ করেছে। তাদের পরিবর্তে এমন বুর্বকদের অনুসরণ করেছে, যারা কেবল কবি হামাসার কবিতার লক্ষ্যবস্তুই হতে পারে। তারা কেবল মানুষের ভেতরকার মনুষ্যত্ববোধকে বিচূর্ণ করে দিতে পারে। সুতরাং দীন ও দীনের বুঝ গ্রহণের ক্ষেত্রে তোমরা ওই কথাই মেনে নাও, যা হযরত হাসান বসরী রহ. বলেছেন,

فإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.

নিশ্চয় এই জ্ঞান হচ্ছে দীনস্বরূপ। সুতরাং তোমরা ভেবে দেখো যে, তোমরা কার কাছ থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করবে?[২৯৩]

নিশ্চয় মহান নেতা সালাহউদ্দীন রহ. এর বাহিনীর সেনাপতি হোক বা সাধারণ সৈনিক, সৈন্যদল হোক বা একজন সৈনিক, তারা প্রত্যেকেই জ্ঞান ও ইলমের মর্যাদা বুঝেছেন। এটাও বুঝেছেন যে, তারা কার কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করবেন? তারা ফতোয়া দানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছেই অর্পণ করেছিলেন। তারা হক্কানী উলামায়ে কেরামের হাতে দেশীয় রাজনীতির নেতৃত্বভার প্রদান করেছিলেন। এর মাধ্যমে তারা কার্যক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তারা সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিবেদিত হয়েছেন। আমীর-উযির, সুলতান, সাধারণ মানুষ, সকলেই। সুতরাং ইলমের প্রতি ও ইলমের ধারক-বাহকদের প্রতি তাদের ভালোবাসা ছিল প্রগাঢ় ও নির্খাদ। জিহাদের প্রতি তাদের বিপুল অনুরাগ ও এর জন্য প্রয়োজনীয়

---

[২৯২] প্রাগুক্ত : ৮৭।
[২৯৩] মুকাদ্দিমাতু সহিহ মুসলিম : ১ : ১৪।

শক্তি-সামর্থ অর্জন করা ছিল তাদের জাবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিশ্চয় জিহাদ হলো একটি জাতিগত অধিকার, ব্যক্তিগত নয়। উম্মাহই এ বিষয়টি চূড়ান্ত করে নিয়েছে যে, উম্মাহর নেতৃস্থানীয়, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় বিভূষিত, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী উলামায়ে উম্মত কর্তৃক যে কর্মসূচি প্রদান করা হবে- তা-ই বাস্তবায়ন করা হবে। কেউ তাদের বিরোধীতা করে কোনো মত ও সিদ্ধান্ত প্রদান করলে খণ্ডিত দৃষ্টিতে তা যতই যুক্তিযুক্ত হোক- গ্রাহ্য ও গ্রহণীয় হবে না।

তিন.

সুলতান সালাহউদ্দীনের অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, আদল-ইনসাফের প্রতি তার পূর্ণ সচেতনতা ও আন্তরিকতা। অথচ পূর্ববর্তী কালে দেখা যেত, আমীর-উমারা ও উযিরগণ অর্থ-সম্পদ, ভূমিসম্পদ ও ক্ষমতার দাপটে জনসাধারণের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতো। আর রাজা-বাদশাহরাও আমীর-উমাদেরকে খুশি করার জন্য তাদেরকে এর জন্য কিছুই বলতো না। যাতে সে তাদের আনুগত্য থেকে বঞ্চিত না হয়।

চার.

দুনিয়ার প্রতি তার অনাসক্তি। এ কারণেই দেখা যায়, তিনি মৃত্যুর আগে খুব বেশি সহায়-সম্পত্তি রেখে যাননি। কেননা তিনি নিজের পরিবার-পরিজন, প্রজা-সাধারণ এমনকি শত্রুপক্ষকে দান-সহায়তা করতে গিয়ে হাতে আসা অর্থসম্পদ খরচ করে ফেলেছেন। তিনি পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, বাহন-জন্তু খুবই পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করতেন। তিনি কেবল মোটা সুতার কাপড় বা পশমের কাপড় পরিধান করতেন।

পাঁচ.

তিনি ভাষা-সাহিত্য ও জনমানুষের দিনকাল বা ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞানাজর্নে খুবই গুরুত্ব দিতেন। তিনি কবি আবু তামামের দিওয়ানে হামাসা মুখস্থ করতেন।

ছয়.

তিনি সময়মতো জামাতে নামায আদায়ে খুবই যত্নবান ছিলেন। বলা হয়, মৃত্যুর আগে দীর্ঘসময় পর্যন্ত তার জামাতে নামায আদায় করা ছুটে যায়নি। এমনকি মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও নয়। তখন ইমাম তার ঘরে যেতেন এবং

তাকে নিয়ে নামায আদায় করতেন। তিনি শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন।

সাত.

তার মন ও হৃদয় ছিলো খুবই কোমল। কুরআনে কারীম তিলাওয়াত বা হাদিস শরীফ শ্রবণ করতে থাকলে তার দু গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকতো।

আট.

তিনি সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। মুখে সবসময় হাসি হাসি ভাব লেগেই থাকতো। এমন কোনো কল্যাণ নেই– যা তিনি করেননি। তিনি ভালো ও কল্যাণকর কাজে সর্বদা উন্মুখপর থাকতেন।[২১৪]

আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন এবং সর্বদা নেককার ব্যক্তিবর্গের কাতারে তার নাম জারি রাখুন। আমিন।

## সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহ.-এর ব্যাপারে মর্মস্পর্শী শোকগাঁথা

আল্লামা ইমাদ ইস্পাহানী রহ. বলেন, (ইন্তিকালের আগে) রবিবার দিন রাতে আমরা তার সেবা করার জন্য গেলাম। তখন তার অসুস্থতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল। প্রতিদিনই তিনি শারীরিকভাবে বেশি দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। এরপর একদিন তিনি এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে পাড়ি জমালেন। তার মৃত্যুতে অসংখ্য মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নও মৃত্যুবরণ করলো। তার সূর্য অস্তমিত হওয়ায় পুণ্য ও কল্যাণের একটি দিগন্ত আঁধারে ছেয়ে গেল। কবিজনরা তার শোকে কাব্যও লিখতে থাকলেন। ইমাদ আল ইস্পাহানী রহ. তার ঐতিহাসিক শোকগাঁথাও রচনা করলেন। কবিতাটি নিম্নরূপ :

شمل الهدى والملك عم شتاته ✪ والدهر ساء وأقلعت حسناته

*তিনি হিদায়াত ও রাজত্ব একীভূত করেছেন। যদিও (বাহ্যত) তা বিপরীতমুখী দুটি বিষয়। যুগ ও সময় নষ্ট হয়ে গেছে এবং তা পুণ্য কাজকে গিলে খেয়েছে।*

---

[২১৪] দেখুন, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. কৃত : ১২: ৬-৭।

بالله أين الناصر الملك الذي ✪ لله خالصة صفت نياته.

আল্লাহর শপথ! ওই মহান সাহায্যকারী বাদশাহ আজ কোথায়? যিনি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেরই নিয়ত করতেন।

أين الذي لم يزل مخشية ✪ مرجوة رهباته وهباته.

তিনি আজ কোথায়? যিনি ছিলেন (আল্লাহর ভয়ে সদা) কম্পমান। যার আধ্যাত্ম সাধনা ও দান-দক্ষিণা ছিল আশাপ্রদ।

أين الذي كانت له طاعاتنا ✪ مبذولة ولربه طاعاته.

তিনি আজ কোথায়? আমরা যার আনুগত্য করতাম। আর তিনি তার মহান রবের আনুগত্য করতেন?

أين الذي ما زال سلطانا لنا ✪ يرجى نداه وتتقى سطواته.

তিনি আজ কোথায়? যিনি আমাদের একজন মহামান্য সুলতান ছিলেন। তার শুভমুক্তির আশা করা যায় এবং তার অন্যায় পদবিক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

أين الذي شرف الزمان بفضله ✪ وسمت على الفضلاء تشريفاته.

তিনি আজ কোথায়? যিনি আপন পুণ্য কর্মের দ্বারা যুগকে সম্মানিত করেছেন। আর সকল শ্রেষ্ঠ লোকদের চেয়ে তার কর্ম-কীর্তি শ্রেষ্ঠতর গণ্য হয়েছে।

أغلال أعناق العدا أسيافه ✪ أطواق أجياد الورى مناته.

তার তরবারি শত্রুর গলায় শিকল পরিয়েছে। তার স্বপ্ন পলায়নপর মানসিকতায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে।

لم يجد تدبير الطبيب وكم وكم ✪ أجدت لطب الدهر تدبيراته.

তিনি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন পাননি। তবে যুগের চিকিৎসার প্রয়োজনে তিনি কতশত প্রেসক্রিপশন/ফর্মুলা তৈরি করে দিয়েছেন।

من في الجهاد صفاحه ما أغمدت ✪ بالنصر حتى أغمدت صفحاته.

তিনি এমন ব্যক্তি- জিহাদের ময়দানে জীবন পার করে দিয়েই যার জীবনপ্রাণ নিঃশেষ হয়েছে।

من في صدور الكفر صدر قناته ✪ حتى توارت بالصياح قناته.

তিনি কুফরের বুকে কম্পন সৃষ্টি করেছেন। তাদের আর্তচিৎকারে তার মহানুভবতা অন্তরাল হয়ে গেছে।

لذ المتاعب في الجهاد ولم تكن ✪ مذ عاش قط لذاته لذاته.

যুদ্ধ-জিহাদের প্রচুর কষ্ট সহ্য করলেও তিনি আমৃত্যু নিজ জীবনে পার্থিব কোনো সাধ-আহ্লাদ পূরণ করেননি।

مسعودة غدواته محمودة ✪ روحاته ميمونة ضحواته.

তার সকাল-দুপুর সৌভাগ্যময়, তার বিকেল-সন্ধ্যা সুপ্রশংসিত, তার ত্যাগ ও কুরবানী সুখময়

في نصرة الإسلام يسهر دائما ✪ ليطول في روض الجنان سنانه.

ইসলামের তরে তিনি সদা বিনিদ্র রজনী জেগে থেকেছেন। যাতে সুখময় জান্নাতে তার শির উঁচু থাকে।

لا تحسبوه مات شخص واحد ✪ فممات كل العالمين مماته.

তোমরা মনে করো না যে, তিনি কেবল একজন ব্যক্তিই মৃত্যুবরণ করেছেন। তার মৃত্যুতে তো সারাজাহানের মৃত্যু হয়ে গেছে।

ملك عن الإسلام كان محاميا ✪ أبدا إذا ما أسلمته حماته.

তিনি ইসলামের জ্ঞান-গরীমা আত্মস্থ করেছেন। ইসলামকে সদা (বাতিলের নখরথাবা থেকে) রক্ষা করেছেন। যখন অন্যান্য রক্ষকগণ তা রক্ষা করতে পারেননি।

قد أظلمت مذ غاب عنا دوره ✪ لما خلت من بدره داراته.

তার সময় চলে যাবার পর পৃথিবী আমাদের কাছে অন্ধকারময় হয়ে গেছে। কেননা পৃথিবী তো তার ন্যায় পূর্ণিমার চাঁদ থেকে শূন্য হয়ে গেছে।

دفن السماح فليس تنشر بعدما ✪ أودى إلى يوم النشور رفاته.

মহানুভবতা দাফন হয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন তার হাড্ডিসমূহ জমা না হওয়া পর্যন্ত তা আর পাওয়া যাবে না।

الدين بعد أبي المظفر يوسف ✪ أقوت قراه وأقفرت ساحاته.

আবুল মুযাফফর ইউসুফের পর দীন তার মর্যাদা হারিয়েছে এবং তার ভূখণ্ড ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

جبل تضعضع من تضعضع ركنه ✪ أركاننا وتهدنا هداته.

পাহাড়ের গোড়া নড়বড়ে হওয়ার কারণে আমাদের অস্থিমজ্জাকেও প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদেরকে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিয়েছে।

ما كنت أعلم أن طودا شامخا ✪ يهوي ولا تهوي بنا مهواته.

আমি এমন কোনো সুরম্য প্রাসাদের কথা জানি না, যা আকর্ষণ করে। তার রূপ-বিভাও আমাদেরকে কাছে টানে না।

ما كنت أعلم أن بحرا طاميا ✪ فينا يطم وتنتهي زخراته.

আমি এমন শান্ত কোমল সমুদ্রের কথাও জানি না, যা আমাদের নিয়ে শান্তস্থির থাকে এবং তার খনি-ভাণ্ডার শেষ হয়ে যায়।

بحر خلا من ورديه ولم تزل ✪ محفوفة بوفوده حافاته.

সমুদ্র পর্যটকদের থেকে শূন্য হয়ে গেছে। যদিও তা তার অভ্যন্তরের সঙ্গী-সাথি নিয়ে টইটম্বুর।

من لليتامى والأرامل راحم ✪ متعطف مفضوضة صدقاته.

কে এখন ইয়াতীম ও বিধবাদের প্রতি দয়া করবে? কে তাদেরকে থলে ভরে দান-দক্ষিনা করবে?

لو كان في عصر النبي لأنزلت ✪ في ذكره من ذكره آياته.

যদি তিনি নবীর যুগে থাকতেন, তবে তার স্মরণে কোনো আয়াত অবতীর্ণ হত।

بكت الصوارم والصواهل إذ خلت ✪ من سلها وركوبها غزواته.

দুর্গ ও উপত্যকাগুলো তার বিরহে ক্রন্দন করেছে, যখন সেগুলো তার যুদ্ধ-বিগ্রহের সেনা-সৈনিক থেকে মুক্ত হয়ে গেছে।

يا وحشة الإسلام يوم تمكنت ✪ في كل قلب مؤمن روعاته.

হে ইসলামের দুর্যোগকালের সারথী! (কত উত্তম কর্ম হয়েছিল) যেদিন আপনি

*প্রতিটি মুমিন হৃদয়ে ইসলামের গুরুত্ব প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।*

يا راعيا للدين حين تمكنت ✪ منه الذئاب وأسلمته رعاته.

*হে দীনের রক্ষাকারী! (কত সুখকর ছিল) যখন আপনি ইসলামের একজন বীর সিপাহসালারে পরিণত হয়েছিলেন এবং ইসলামের ধারকবাহকদেরকে নিরাপদ রেখেছিলেন।*

ما كان أسرع عصره لما انقضى ✪ فكأنما سنواته ساعاته.

*তার সময় কত দ্রুত কেটে গেছে! তার বছরগুলোর যেন ছিল কয়েক ঘন্টা মাত্র।*

فعلى صلاح الدين يوسف دائما ✪ رضوان رب العرش بل صلواته.

*সুতরাং সালাহউদ্দীন ইউসুফের ওপর সদা সর্বদা আরশের মহান অধিপতির সন্তুষ্টি ও করুণা বর্ষিত হোক।*[২৯৫]

## সুলতান সালাহউদ্দীন রহ.-এর মৃত্যুতে রচিত হৃদয়স্পর্শী সংবাদ

আন নুজূমুয যাহিরাহ গ্রন্থ প্রণেতা লিখেছেন, সুলতানের মৃত্যুর পর মহামান্য বিচারপতি হালবের প্রশাসক সুলতানের বড় ছেলে আল-মালিকুয যাহিরকে একটি পত্র লিখেছেন। তার ভাষ্য হলো,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

তোমাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।[২৯৬]

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ.

নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার।[২৯৭]

আমি আমাদের অভিভাবক সুলতান আল-মালিকুয যাহিরকে উদ্দেশ্য করে

---

[২৯৫] *আন-নুজূমুয যাহিরা : ৬ : ৬০-৬১; সালাহুদ্দীন বাতালু হিত্তীন ওয়া মুহাররিরুল কুদস : ১০২ ঈষৎ সংক্ষেপিত।*

[২৯৬] সূরা আহযাব : ২১।

[২৯৭] সূরা হজ্জ : ১।

লিখলাম (আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, তার ক্ষতির উত্তম বিনিময় দান করুন এবং তার মাঝে মরহুম সুলতানের উত্তরসূরি হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা দান করুন),

মহামান্য সুলতানকে হারিয়ে মুসলমানরা প্রবলভাবে ঝাঁকুনি খেয়েছে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে এবং অন্তর কলিজা ছিঁড়ে বের হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আপনি আপনার পিতাকে হারিয়েছেন এবং আমার সম্মানিত মনীবকে হারিয়েছেন। তাকে এমন চিরবিদায় জানিয়েছেন, যার পর আর কখনো তার সাথে সাক্ষাৎ হবে না।

আমি আমার পক্ষ থেকে এবং আপনার পক্ষ থেকে তার চেহারা চুম্বন করেছি এবং আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে সমর্পণ করেছি। আর আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী কেউ নেই।

দরজায় সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত ছিল, অস্ত্রশস্ত্রও সব যথাস্থানেই ছিল, কিন্তু কেউ-ই এ বিপদ দূর করতে সক্ষম নয়। কেউ-ই ভাগ্যের লিখন পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার পিতার মৃত্যুতে আমাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে, আমরা নির্বাক হয়ে গেছি। কিন্তু আমরা আল্লাহ যে কথায় সন্তুষ্ট হন কেবল সে কথাই বলি। আর নিশ্চয়ই হে ইউসুফ! আমরা আপনাকে হারিয়ে খুবই ব্যথিত। তার ব্যাপারে কোনো ধরনের অসিয়ত প্রয়োজন নেই। এই বিপদ আমাদের সকল কর্মব্যস্ততা ভুলিয়ে দিয়েছে। বিধাতার চিরন্তন বিধান এসে গেছে বলে যদি আমরা ভাবি, তবে তো আমরা কেবল একজন মহান ব্যক্তিত্বকেই হারিয়েছি। আর ব্যাপার যদি এর চেয়ে ভিন্ন কিছু হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে যে বিপদ-আপদ দেখা দিবে, এর চেয়ে তার মৃত্যুবরণ করা অধিক সহজতর। কেননা সে বিপদ তো খুবই ভয়াবহ, অতীব মারাত্মক। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।[২৯৮]

আল্লাহ তাআলা সুলতান সালাহউদ্দীন এবং তার পূর্বে বিগত মুসলমানদের ওপর ও তার পরবর্তী সময়ে আগত ওই মুসলমানদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন– যারা তার নীতি ও আদর্শকে পরিপূর্ণরূপে আঁকড়ে ধরবে।

পাঠকবৃন্দ এখানে প্রশ্ন করতে পারেন, সুলতান সালাহউদ্দীন এবং সুলতান নুরুদ্দীন রহ. এর জীবনী নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনা কেন করা হলো?

---

[২৯৮] আন-নুজুমুয যাহিরাহ : ৬ : ৫২-৫৩।

উত্তরে আমি বলবো, নিশ্চয়ই উবাইদিয়া সাম্রাজ্য পতনের কিছু প্রত্যক্ষ এবং কিছু পরোক্ষ কারণ রয়েছে। আমার দৃষ্টিতে উবাইদিয়া সাম্রাজ্য পতনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, এই মহান দুই সেনাপতি সুলতান নূরুদ্দীন মাহমুদ এবং সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহ.-এর সদিচ্ছা, চেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনা। এ কারণেই আমি তাদের পূতঃপবিত্র জীবনী বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।

একই সাথে আমি কথা একথা স্পষ্ট করতে চেয়েছি যে, এ ব্যাপারটিতে তারা কী পরিমাণ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং কী পরিমাণ চেষ্টা-সংগ্রাম করেছেন। একই সাথে উক্ত বিষয়ে তাদের যুগে জ্ঞানী উলামায়ে কেরাম কী ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। যাতে সম্মানিত পাঠক একথা স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে, সুলতান নূরুদ্দীন ও সুলতান সালাহউদ্দীন রহ. কোনোরূপ ভূমিকা এবং কষ্ট স্বীকার না করে হঠাৎই এই কাজ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হননি। উপরন্তু আলেম-উলামা, দীনের দাঈ এবং জনসাধারণের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়াও এই সফলতা আসেনি। এ থেকেই বুঝে আসে, নিশ্চয়ই একটি জাতির বিপ্লব ও পরিবর্তন ঠিক তখনই সাধিত হয় যখন তারা ঐক্যবদ্ধভাবে তা বাস্তবায়ন করতে এগিয়ে আসে।

আমি পাঠকবৃন্দকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, চিন্তা ও কর্মে নিষ্ঠা বজায় রাখার গুরুত্ব কতটা কার্যকরী এবং বিজয় অর্জনে তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চয়ই কাজ ও চিন্তার মাঝে নিষ্ঠা না থাকলে কোনো কাজেই সফলতা লাভ করা যায় না।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমি উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের বিস্তারিত ইতিহাস রচনা সমাপ্ত করছি। যদি আমি সঠিক ও শুদ্ধ কাজ করে থাকি তাহলে তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার তাওফীকে সম্ভব হয়েছে। আর যদি আমি কোনো ভুল করে থাকি তাহলে তার দায় একমাত্র আমার।

আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন একমাত্র তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আমার এই কাজটি কবুল করেন এবং এর দ্বারা সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে যথাযথ উপকৃত করেন।

***

## আলোচনার সারাংশ

১. যখন একটি জাতি খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন তার শত্রুরা ধর্মের পোশাক পরিধান করে তাতে অনুপ্রবেশ করে থাকে। যাতে তারা সহজেই ভেতরে থেকে ধর্মের গোড়া কাটতে সক্ষম হয়। বিশেষত ইহুদি সম্প্রদায় এ কাজটি খুবই চতুরতার সাথে করে থাকে। তাদের লক্ষ্য থাকে, তারা সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য মিথ্যা ও বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনী বলে বেড়ায় এবং তাদের ভেতরে ধর্মের বিষয়ে সংশয়-সন্দেহ তৈরি করে।

২. নিশ্চয় আহলে বাইত রা. বিশেষ করে প্রথম সারির আলেমদের মাঝে হযরত আলী রা. কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারা বিদআতী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এবং তাদের মনগড়া নীতি-আদর্শের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন।

৩. নিশ্চয় হযরত যায়েদ বিন আলী রা. কে রাফেযীরা পরিত্যাগ করেছে। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রধান দুই সহচর হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রা. কে গালি দেওয়া থেকে বিরত ছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় যে, রাফেযীরা ইসলামের সুমহান আদর্শের পতাকাবাহী হযরত সাহাবায়ে কেরামকে গালিগালাজ করে বেড়ায়।

৪. পৃথিবীতে শিয়াদের অসংখ্য দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে। তারা পৃথিবীর কোনো কোনো রাষ্ট্রে সরকারী আনুকূল্যও পেয়ে থাকে। এ কথা সত্য যে, চিন্তা সাধারণত একেবারে মারা যায় না। সময়-কাল, যুগ ও স্থানের প্রেক্ষিতে তার রূপ-বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিক পরিবর্তন হয় মাত্র। সুতরাং পৃথিবীর নানা প্রান্তে তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দল-উপদলসমূহের কথা আলোচনা করে তাদের ভ্রান্ত মতাদর্শ থেকে বিরত থাকার আহ্বান করা মূলত এমন জিহাদ- যা আল্লাহ ও তার রাসূল ভালোবাসেন।

৫. বর্তমান সময়ে শিয়াদের সবচে মারাত্মক দলের নাম নাসিরিয়্যাহ। যারা অতীত কালে খ্রিস্টানদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছে, তাদের হাতে সিরিয়ার দখল তুলে দেওয়ার জন্য। তবে মুসলমানরা যখন বিজয় অর্জন করেছে তখন তারা খুবই ব্যথিত হয়েছে। আর যখন মুসলমানরা পরাভূত হয়েছ তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়েছে। বর্তমান সময়েও ইহুদি-খ্রিস্টানদের সঙ্গে তারা মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ। সিরিয়ায় এখনও তাদের

রাজত্ব চলছে, সেখানকার আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতাদর্শের অধিকারী আলেম-উলামা ও জনসাধারণকে তারা জেল-জুলম ও নির্যাতনের প্রকোষ্টে কারান্তর করে রেখেছে।

৬. বর্তমান সময়ে তাদের অন্যতম ভয়ংকর একটি দল হলো, শিয়া ইসনা আশারিয়া। তারা ইরানে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। সারা পৃথিবীতে তারা তাদের চিন্তা-চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া মিশন অব্যাহত রেখেছে। আমি খুবই অবাক হই, যখন দেখি যে, আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন এবং ইরাক ও সৌদি আরবের কিছু অংশ তাদের কর্মতৎপরতা দেখেও নাকে তেল দিয়ে গভীর ঘুমে নিমজ্জিত হয়ে আছে। আর এ আত্মপ্রশস্তিকেই তারা দীন, জিহাদ ও আল্লাহর নৈকট্য বলে ভেবে বসে আছে।

৭. ইসমাঈলিরা সুষ্ঠুভাবেই নিজেদের রাষ্ট্র সুবিন্যস্ত করেছে এবং একটি রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় দিক তথা সশস্ত্র বিভাগ, অর্থনৈতিক বিভাগ এবং নিজেদের ইচ্ছা-অভিপ্রায়, কার্য-পদক্ষেপ এবং রায় ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সকল ধরনের সক্ষমতা অর্জন করে নিয়েছে।

৮. ইসমাইলি নেতৃত্ব জুলুমের মাধ্যমে একটি স্পর্শকাতর অবস্থান গ্রহণ করেছে। এর দ্বারা তারা বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং আব্বাসী সাম্রাজ্যের ভেতর বিরাট ভাঙ্গন ও ফাটল সৃষ্টি করেছে। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দাঈ বা ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেছে। অবশেষে ধোঁকাবাজ প্রতারক আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়াই এর যুগ এল। ইতিহাসের গ্রন্থাবলী থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে এমন ব্যক্তি ছিল– যার জন্য বিভিন্ন বাহিনী এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দল সৃষ্টি হয়েছিল। সে তাদেরকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবহার করত। যখন সে পশ্চিমা সাম্রাজ্যে শক্তির জায়গা এবং দুর্বলতার জায়গা চিহ্নিত করতে সক্ষম হলো তখন সে শক্তি অর্জনে সম্ভাব্য পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করল। একই সঙ্গে আগালিবা সাম্রাজ্য পতনে এবং তাদের দুর্বল করতে প্রচুর চেষ্টা ও পরিশ্রম করল। এমনকি ২৯৭ হিজরী সনে সে সেই সম্রাজ্য নির্মূলে পুরোপুরি সফলকাম হল।

৯. আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ায়ী এর যুগ আসার প্রাক্কালে মানুষ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। তারা একটি বিকল্প শক্তির উত্থান প্রত্যাশা করছিল। তারা জুলুম বিদূরিত করণে চেষ্টা করছিল। পরিশেষে রোমান জনসাধারণের মধ্যে থেকে উত্তর আফ্রিকায় একটি বৃহৎ দল আত্মপ্রকাশ করে।

১০. উবায়দুল্লাহ মাহদী যখন শাসনভার গ্রহণ করে তখন সে তার নিষ্ঠাবান কর্মীদের নির্মূলে বিরাট হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। যারা মূলত তার সাম্রাজ্য গঠনে সহায়তা করেছিল। মানব ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। প্রবাদ রয়েছে যে, সিংহ নিজের সন্তানদেরকে খেয়ে ফেলে। আমি বলি, এটিই মহান আল্লাহ তাআলার একটি প্রচলিত সুন্নাহ বা কর্মপন্থা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো জালিম শাসককে সহায়তা করে আল্লাহ তাআলা তাকে তারই উপর চাপিয়ে দেন। ইরাকি শাসক তার উজির কর্মচারী ও তার পরিবার-পরিজন থেকে যে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিল ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় তা কমেনি বরং একের পর এক বেড়েই চলেছিল এই হত্যাযজ্ঞ।

১১. শাসক উবায়দুল্লাহ মুসলমানদের মধ্যে প্রত্যাশিত মাহদির ব্যাপারটিকে দৃঢ়মূল করে দিয়েছিল এবং বিষয়টিকে বানিয়ে সাজিয়ে এ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, মানুষ এক পর্যায়ে ধারণা করতে শুরু করে, সে-ই হচ্ছে প্রত্যাশিত মাহদি।

১২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ওলামায়ে কেরাম সদাসর্বদা চিন্তা-ফিকির করেছেন। যখনই জুলুম-অত্যাচার বেড়ে গেছে এবং ইসলামকে নিয়ে কেউ দুরভিসন্ধিতে মেতে উঠেছে তখনই তারা উম্মাহকে সেই জুলুম-অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম ও প্রয়াস চালিয়েছেন- এর জন্য প্রয়োজনে তারা তাদের নিজেদের জীবন ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজনও কুরবানি করেছেন।

১৩. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস মতে উম্মাহকে তরবিয়ত করার ক্ষেত্র হচ্ছে তাদের চিন্তা ও আদর্শগত ক্ষেত্রে এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে এমন চিন্তা ও আদর্শের বীজ বপন করা, যার দ্বারা তারা বিভ্রান্তিকর মতাদর্শের মায়াবী আহ্বান থেকে নিজেদেরকে সহজেই রক্ষা করতে পারবে।

১৪. তারাবলুস অধিবাসীরা রাফেযীদের শিকড় ও বাতেনীদের ভিত সমূলে উৎপাটিত করে। তারা বনী উবায়দের সঙ্গে মারাত্মক যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে। পরিশেষে তারাবলুসবাসী শক্তি-সামর্থে কুলিয়ে উঠতে না পেরে উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের কাছে নতি স্বীকার করে।

১৫. বারাকা অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে এমন নির্মম আচরণ করা হয়েছে,

যার কথা শুনলে শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে যায়, মাথার চুল-দাড়ি সব সাদা হয়ে যায়। বারাকাবাসী উবায়দিয়াদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা তাদের কর্মচারী ও আমলাদেরকে এবং কাত্তামার অসংখ্য লোককে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু এর পরিণতিতে তারা চরম নিগ্রহ-নিপীড়ন, নির্যাতন, হত্যা, গুম, খুন ও লুণ্ঠনের শিকার হয়। তাদের নারীদেরকে বন্দী করে দাসী বানানো হয়।

১৬. আবু ইয়াযীদ খারেযি উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের খুঁটি নড়বড়ে করে দেওয়ার সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করে। তিনি তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করতে প্রায় সফলও হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা আর হয়নি। কেননা তার বুদ্ধি ও মেধা মূলত রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনায় অতোটা পরিপক্ক ছিলো না। তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত ছিলো না। অধিকন্তু তিনি তার সঙ্গীদের সঙ্গে ধোঁকাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর ফলে তিনি মানুষের মাঝে নিজের আস্থা হারিয়ে ফেলেন।

১৭. আহলুস সুন্নাহর উলামায়ে কেরাম যখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, আবু ইয়াযীদ আল খারেযি উভয় দলের মাঝে তুলনামূলক কম ক্ষতিকর তখন তারা তাকে সহায়তা করতে চেষ্টা করেন। আমরা এর থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাই তা-হলো, এ ধরনের চুক্তি ও কর্মকৌশলে এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষত বিদআতীদের বিভ্রান্ত বিশ্বাস এবং ধর্মদ্রোহীদের কূট চিন্তা-চেতনার দিকে খুবই সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা মুসলমান জাতি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রখর বুদ্ধিমান। তারা একই গর্তে দু বার দংশিত হয় না।

১৮. আবু ইয়াযীদের কর্মতৎপরতা সফল হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, উবায়দি খলীফা আল কায়েম বিআমরিল্লাহ নবীদেরকে গালিগালাজ করে এবং নিজে মুরতাদ ও কাফের হয়ে যাওয়ার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়। আবু ইয়াযীদ এটাকেই চালের গুটি বানিয়ে নেয়। সে পুরো পশ্চিমাঞ্চলের সকল গোত্র, ফুকাহা, আবেদ-যাহেদ ও কায়রাওয়ানের মুসলিম জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলে।

১৯. উবায়দী খলিফা মানসূর এসে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ফকীহ-আলেমদেরকে যথামর্যাদা দান করেন। তাদেরকে জুলুম-অত্যাচার ও নিপীড়নের হাত থেকে উদ্ধার করেন। এতে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি শান্ত হয়। তিনি খারেযিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

২০. উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী মুসলমানগণ খুবই পরিচ্ছন্ন মনোভাবের অধিকারী। তারা আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শের বিপরীত অন্য কোনো মতাদর্শ গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। তারা এই বিশুদ্ধ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের দামী বা সস্তা অর্থাৎ যে কোনো জান-মাল ব্যয় করতে সদা প্রস্তুত। এ কারণে উবায়দিয়া খলীফাদের মিসরে যাওয়া-আসা করতে এবং কোনো হাঙ্গামা-বিশৃঙ্খলা ঘটানো থেকে বিরত থাকতে বাধ্য থাকতো।

২১. উবায়দিয়া সাম্রাজ্য পুরো ইসলামী বিশ্বে বাতেনী চিন্তাধারার ধারক বাহকে পরিণত হয়েছে। তারা নিজেদের অর্থসম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ দিয়ে এ মতবাদ সম্প্রসারণে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। যাতে তারা আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে শক্তিসামর্থ অর্জন করতে পারে। এ কারণেই কারামেতা ও উবায়দিয়াদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। যদিও দুনিয়াবি স্বার্থের ক্ষেত্রে তারা পরস্পরে মতবিরোধ ও বিতণ্ডা করে থাকে।

২২. উবায়দিয়া সাম্রাজ্য আহলুস সুন্নাহর আকিদা-বিশ্বাস ও আদর্শের মূলোৎপাটনে যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করেছে। এতকিছু করার পরও তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

২৩. আহলুস সুন্নাহর আলেমগণ জালেম ও তাগুতপন্থী উবায়দি ও রাফেযী মতবাদের ভিত উৎপাটিত করার জন্য তাদেরকে দাওয়াত, তালিম, স্বমতের পক্ষে সমূহ দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন এবং অস্ত্রধারণ ও সংগ্রামের যাবতীয় পথ অবলম্বন করেছেন। দীন-ইসলামের বিশুদ্ধ জ্ঞান ও মতাদর্শ প্রচার-প্রসারের জন্য তারা জেল-জুলুম, হত্যাসহ সমূহ নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করেছেন।

২৪. আহলুস সুন্নাহর আলেমগণ সনহাজি/জিরি সাম্রাজ্যের আমির-উমারাদেরকে টার্গেট করে দাওয়াত প্রদান করেন। তারা তাদের দাওয়াত-নসীহত ও তালিম-তরবিয়্যতে সফল হয়েছেন। এক্ষেত্রে ফকীহ আবুল হাসান আয-যাজ্জাল (র) খুবই দক্ষতা দেখিয়েছেন।

২৫. মুঈয বিন বাদিশ এর ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া ছিল আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শীদের বিরাট অর্জন। মুঈয বিন বাদিশ উবায়দিয়া বাতেনী সাম্রাজ্য থেকে নিজেদের মুক্তকরণে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন। তখন আহলুস

সুন্নাহর আলেম ও ফকীহগণ নিজেদের মতাদর্শ প্রচার-প্রসারে এবং দীনের বিশুদ্ধ দাওয়াত দানে খুবই সাহসিকতা ও প্রেরণা লাভ করেন। তখন রাফেযীরা এক প্রকার কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তিনি বরং তাদেরকে মসিযুদ্ধের চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেন।

২৬. সনহাজি বারবারিয়া জিরিয়া সাম্রাজ্য মুঈয বিন বাদিশের যুগে সুন্নী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এটা ছিল উবায়দিয়া সাম্রাজ্য দুর্বলতর হওয়ার সূচনামাত্র। বরং এটা ছিল তাদের পতনের অন্যতম কারণ।

২৭. সুন্নাহসম্মত সকল মাযহাবকে পেছনে রেখে মানুষকে কেবলমাত্র কোনো একটি মাযহাব মানতে বাধ্য করার ব্যাপারটি উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের জন্য একটু কঠিন ছিলো। মুঈযের জন্য উত্তম ছিলো, সকল প্রকার সুন্নী মতাদর্শ গ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত রাখা। যেমন সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ নিজে হানাফী হওয়া সত্ত্বেও উক্ত পন্থা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু মুঈয সকল মতাদর্শ ও মাযহাব থেকে একটি মাযহাব মানা নির্ধারণ করে দেন। যেমনটি করেছেন, সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ফলে সকলের জন্য তিনি শাফেয়ী মাযহাব মানা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন।

২৮. রাজা-বাদশা ও প্রশাসকদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার নীতি ও কর্মপন্থা খুবই সুস্পষ্ট। একইভাবে চিন্তা করার শক্তিও সুস্পষ্ট- যদ্দারা রাষ্ট্র সুরক্ষিত থাকে। আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শের পরিপন্থী ব্যক্তিদের বংশধর ও নাতি-নাতনীদের থেকেও অসংখ্য ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। (অর্থাৎ তারা আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শের পক্ষে নীতি-পন্থা গ্রহণ করেছে)।

২৯. উবায়দিয়া সাম্রাজ্য মুঈয বিন বাদিশের সঙ্গে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করেছে। যখন তারা আরব্য গোত্র ও দলসমূহকে উত্তর আফ্রিকায় প্রেরণ করেছে। মুঈযের আক্রমণের অন্যতম কারণ ছিলো, সনহাজি, কাত্তামা ও যানাতার মাঝে প্রবল দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ। একই সঙ্গে সৈন্যবাহিনী তৈরি করা এবং তাদেরকে উবায়দিয়াদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া- যারা পরিপূর্ণরূপে ঈমানী শিক্ষা-আদর্শে দীক্ষাপ্রাপ্ত ছিলো না।

৩০. তামীম বিন মুঈযের যুগকে তার পিতার যুগের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর গণ্য করা হয়। পিতার শাসনামলে যেসব শহর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল,

তিনি সেগুলোকে সুসংগঠিত ও একই শাসনাধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি আরব্য গোত্র-কবিলাকে নিজ বাহিনীতে অধিভুক্ত করেছিলেন। হাম্মাদী সাম্রাজ্যের অধিবাসী তার চাচাতো ভাইদেরকে পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একই সাথে তিনি তার পিতার মতাদর্শে ও গঠণতন্ত্রের আলোকে দেশ পরিচালনা করেছেন এবং তার পিতার আদর্শকে ধারণ করে তা প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রেখেছেন।

৩১. ইয়াহইয়া বিন তামীমের যুগকে জিরি বংশের শাসনামলের সবচে শ্রেষ্ঠ যুগ অভিহিত করা হয়। বিশেষত সমুদ্রপথে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা, খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়ানো এবং ভূমধ্য সাগরে জিহাদী অভিযান পরিচালনার জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছিল। যা প্রজাদেরকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। তিনি পুরো আরবজাহানকে একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ শাসনব্যবস্থার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৩২. আমীর আলী বিন ইয়াহইয়ার যুগে খ্রিস্টানদের মিত্রগুলো তাদেরকে সহায়তা দান করে এবং ভূমধ্য সাগরের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য তাদের মিত্র শক্তিগুলো ব্যাপকভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে।

৩৩. ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে সকীলার প্রশাসক খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের হাতে মাহদী সালতানাত তথা জিরি সাম্রাজ্যের রাজধানীর পতন ঘটে। একইভাবে উত্তর আফ্রিকার উপকূলীয় শহর তারাবলুসও খ্রিস্টানদের হস্তগত হয়।

৩৪. একত্ববাদী মতাদর্শের অধিকারীরা উত্তর আফ্রিকাকে খ্রিস্টানদের কবল থেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে সক্ষম হয়। তারা মরক্কোর শেষ অঞ্চল থেকে নিয়ে মিসরের সীমান্ত রেখা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলকে একই রাজনৈতিক মতাদর্শের আলোকে পরিচালনার চেষ্টা চালায়।

৩৫. জিরি সাম্রাজ্য পতনের অনেকগুলো কারণ রয়েছে, এর অন্যতম কারণ হলো, সনহাজি, যানাতা ও কাত্তামাদের পরস্পরের মাঝে লেগে থাকা দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ। আরবরা সেখানে প্রবেশ করলে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও বৃদ্ধি পায়। যা ক্রমান্বয়ে তাদের প্রসাশনকে রাজনীতি, ব্যবসা ও সৈন্যবাহিনী ইত্যাদি দিক থেকে দুর্বলতর করতে থাকে। যার ফলে সেখানকার আলেম-উলামা, ফকীহগণ, প্রাচ্যে বা আন্দালুসে বা পশ্চিমানঞ্চলে হিজরত করেন।

৩৬. জিরি সাম্রাজ্য ১৮০ বছর রাজ্য পরিচালনা করে। এরপর তারা কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই একেকটি নির্ধারিত রয়েছে, যখন তাদের সে সময় এসে যাবে, তখন না একদণ্ড পেছনে সরতে পারবে, না সামনে যেতে পারবে।[২৯৯]

এ আয়াতে আমাদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে।

৩৭. উবায়দিয়ারা যদি [illegible] ও তার সাম্রাজ্য পরাভূত করতে সক্ষম হতো-ও তবুও আল্লাহ তাআলা তাদের উপর আকিদা-বিশ্বাসে মুঈয এর ভাই-বেরাদর সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ ও সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীকে উবায়দিয়া সাম্রাজ্য নির্মূলের জন্য প্রেরণ করতেন।

৩৮. বাতেনী ইসমাঈলীদের ভিত উপড়ে ফেলার জন্য যুগে যুগে উম্মাহর চেষ্টা-প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষয়টি প্রকটভাবে স্পষ্ট হয়েছে, হিন্দুস্থানে সুলতান মাহমুদ গযনভীর অভিযান ও সিরিয়ায় আলেপ আরসালান সালজুকীর অভিযানের মাধ্যমে। তারা উভয়ে উবায়দিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। গযনভী ও সালজুকী গোত্রের লোকেরা আকীদা-বিশ্বাসে সুন্নী মতাদর্শী ছিলেন।

৩৯. সালজুকী সাম্রাজ্যে উযীর নিযামুল মুলক আল হাসান বিন আলী বিশেষ খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করেছেন। তিনি খুবই যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাকওয়া-পরহেযগারীর অধিকারী ছিলেন। সুন্নাহর প্রচার-প্রসার ও বিদআত নির্মূলে বিরাট ভূমিকা রেখেছেন। তিনি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা করেছেন। কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন। যাতে এর মাধ্যমে দীনের বুঝ-বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানী-পণ্ডিত তৈরি হয়। যারা দীনের পথে নিজেদের জান-মাল সর্বাত্মক কুরবানী করে দেবেন। এই লক্ষ্যে তিনি সিরিয়া, ইরাক ও নিশাপুরসহ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি মিসরের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। আলেম-উলামা, ফকীদেরকে জ্ঞানচর্চা, দাওয়াত ও জনমানুষের

---

[২৯৯] সূরা ইউনুস : ৪৯।

আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি উলামায়ে কেরাম ও ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন। সময়ের এই ক্রান্তিকালে যেসব আলেম-উলামা আপন কাজে-কর্মে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হলেন, আবুল মাআলী জুযাযানী, ইমাম গাযালী রহ.। তাদের উভয়ের পূর্বে আল্লামা মাওয়ারদী ও আবু ইসহাক সিরাজী রহ.। তারা শিয়া ও রাফেযীদের দমনে ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক ভূমিকা রেখেছেন। তারা ছিলেন বিশুদ্ধ শাফেয়ী মতাদর্শের ধারক-বাহক। সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ ও সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর যুগে শাফেয়ী মাযহাব ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা শাফেয়ী মতাদর্শীদেরকে সূচনা অবস্থা থেকে উত্তরণের সুযোগ করে দেয়।

৪০. হাম্বলী মতাদর্শী যে সকল আলেম ব্যাপকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন তাদের অন্যতম হলেন, আবুল ওয়াফা ইবনে আকীল ও আবুল ফরজ ইবনুল জাওযী রহ.। তারা জনমানুষকে দীনি শিক্ষাদীক্ষায় দীক্ষিত করে তুলতে ব্যাপক অবদান রাখেন। শায়খ আবু সাঈদ মাখরামী হাম্বলীর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা এক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছে। বিশেষত যখন এই মাদরাসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মহাপণ্ডিত ও সাধক পুরুষ শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ.। বাগদাদে অসংখ্য সিরীয় আলেম তার কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

৪১. ইমাম গাযালী ও শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর ন্যায় দীনের মহান সেবকদের পক্ষ থেকে যখন দীনি সংস্কারমূলক অসংখ্য কর্মতৎপরতা প্রকাশ পেলো, অনেক জ্ঞান ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড সাধিত হলো, যেমন শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাদর্শ প্রচারক মাদরাসা ও প্রতিষ্ঠান এমন শিষ্য তৈরি করলো, যাদের লক্ষ্য সুস্পষ্ট এবং যাদের মনোবল খুবই সুদৃঢ়, তখন এই নতুন প্রজন্ম থেকে ইমাদ উদ্দীন জিনকির ন্যায় পরহেযগার নেতা তৈরি হলো। ইতিহাসে তিনি মুসলিম দেশসমূহকে খ্রিস্টানদের, ইসলামবিদ্বেষীদের এবং বর্বর বাতেনীদের করালগ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রামে জড়িয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

৪২. সুলতান নূরুদ্দীনের যুগ ছিলো উম্মাহর রেনেসাঁর যুগ। তার পুরো শাসনব্যবস্থাই ছিলো ন্যায়-ইনসাফের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ও জন সাধারণের কল্যাণ কামনায় নিবেদিত। নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে

উৎসর্গপ্রাণ। জাতির প্রতিটি নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য-আদর্শ বাস্তবায়নে ছিলো বলিষ্ঠ মনোভাবের অধিকারী।

৪৩. জিনকী সাম্রাজ্য চিন্তা করলো যে, সিরিয়ার সাথে ইরাকের ঐক্য প্রতিষ্ঠা না হলে জাতীয়ভাবে বৃহৎ শক্তি অর্জিত হবে না। ফলে তারা ইসলামী ভূখণ্ডগুলোকে একই নীতি ও আদর্শের পতাকাতলে সুসংগঠিত করতে কর্মপ্রচেষ্টা শুরু করে। তারা নিজেদের দূরদর্শী দৃষ্টি দিয়ে ভেবে দেখলো যে, উবায়দিয়া রাফেযীদের রাজক্ষমতা বিনাশ না করা গেলে খ্রিস্টানদেরকে সমূলে উৎপাটিত করা এবং জাতির হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। সুতরাং তারা এর জন্য সমূহ পদক্ষেপ গ্রহণ করলো। পরিশেষে সুলতান নূরুদ্দীন উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতে সমর্থ হন। একই সঙ্গে ৫৬৪ হিজরী সনে মিসরের সাথে সিরিয়ার ভূখণ্ড একত্র করতে সক্ষম হন। আর এ বিজয় মূলত অর্জন হয়েছিল হকের পতাকাবাহী, তারই একনিষ্ঠ সৈনিক সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর হাতে ধরে।

ইতিহাসের পাঠকমাত্রই বুঝবেন যে, সিরিয়া মিসরের সাথে একাঙ্গীভূত না হলে উম্মাহর পক্ষে খ্রিস্টানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা কিছুতেই সম্ভব হতো না এবং তখন অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোও তাদেরকে এতোটা গুরুত্ব দিতো না।

আর উত্তর আফ্রিকা যদি সিরিয়া ও মিসরের অন্যান্য অঞ্চলগুলোর সাথে সম্পৃক্ত না হতো তবে উম্মাহর পক্ষে ইউরোপে দ্রুততার সঙ্গে যুদ্ধ-জিহাদ পরিচালনা করা এবং ইউরোপে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো না।

৪৪. জিনকী সাম্রাজ্য দেশের সর্বত্র আদর্শ ও চেতনার পতাকাবাহীদের ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস গ্রহণ করেছে। যদ্দারা তারা ওই সকল বিদআতী ভাবাদর্শ দল-সংগঠনগুলো খুঁজে বের করবে, যারা সুন্নী মতাদর্শী জিনকী সাম্রাজ্য পতনে কাজ করে বেড়াচ্ছে। সুতরাং জিনকী সাম্রাজ্য নিজ দেশে খ্রিস্টানদের শেকড় ও তাদের কর্মতৎপরতা খুঁজে বের করা এবং উবায়দিদের বাতিল চিন্তা-চেতনার অনুসারীদেরকে নির্মূল করায় গুরুত্বারোপ করে। তাদেরকে রাষ্ট্রের নজরদারিতে রাখে। ইসলামী ও ধর্মীয় সংগঠকদের (যাদেরকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর বুকে খোদায়ী বিধান ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচন করেছেন) কর্তব্য হলো, নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা। যাতে নিজ নিজ পরিমণ্ডলে বিদআতী, নাস্তিক্যবাদী,

খ্রিস্টান ও ইহুদীদের অঙ্গ-সংগঠণগুলোকে নির্মূল করে ফেলা যায়। আর এ দিকটি নিশ্চিত করতে পারাই রাষ্ট্রক্ষমতা টিকিয়ে রাখার অন্যতম উপায়।

৪৫. সুলতান নূরুদ্দীন জিনকীর প্রশাসন নিজেদের সার্বিক কর্মতৎপরতা ও বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনা সৈন্যবাহিনী ও অপরাপর অফিসারদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিল। এ কারণে দেখা যায়, সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ যখন ইন্তিকাল করেন তখন আদর্শের পতাকা ধারণ করতে এগিয়ে আসেন সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী। তিনি তার পূর্ববর্তী মহান সুলতানের একান্ত ইচ্ছা (তথা রাষ্ট্রের সর্বত্র ইসলামি বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করা) বাস্তবায়নে সমূহ কর্মতৎপরতা গ্রহণ করেন।

উম্মাহ অনেক সময় যে মারাত্মক ভুল করে থাকে তা হলো, উম্মাহ কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বদের নিয়েই মেতে থাকে। ফলে দেখা যায়, তিনি বা তারা ইন্তিকাল করলে উম্মাহ দুর্বল হয়ে যায়। কিংবা তারা বিপথগামী হলে উম্মাহও বিপথগামী হয়ে যায়। সুতরাং দীনের দাঈদের কর্তব্য হলো, জনসাধারণকে এমন এক নীতি ও মানহাজের সাথে জুড়ে দেওয়া, যাতে তারা বিশুদ্ধ ইসলামী চিন্তা ও আদর্শ থেকে কখনো সরে না যায়।

৪৬. যে উম্মাহ কুফুরী রাষ্ট্র এবং জাহেলী প্রথা ও বিধান দমাতে চায়, তাদের কর্তব্য হলো, উম্মাহর মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষাদীক্ষা চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং জিহাদের বাসনা নিয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী প্রস্তুত করা। জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে জ্ঞানী-গুণী ও খোদাভীরু অভিজ্ঞ ব্যক্তি নির্বাচন করা।

যারা মনে করে, কেবলমাত্র সামরিক শক্তি দিয়েই উম্মাহ নিজেদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারবে তারা ভুলে ওপর আছে। আফগানিস্তানের ইতিহাস বেশি দূরের নয়। আর যারা মনে করে, কেবলমাত্র চেতনাদীপ্ত ভাষণ ও প্রেরণাদায়ক গাল-গপ্পোই জাতিকে শক্তিশালী করে তুলবে, তারা সঠিক পন্থা থেকে দূরে আছে। জাযায়েরের ইতিহাস বেশি দিনের নয়।

যারা মনে করে, কেবল জ্ঞানচর্চা বা রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাই সকল সমস্যার সমাধান করে দেবে তবে বাস্তব সফলতা তাদের কাছে অধরাই থেকে যাবে। সফলতা তো আসবে তখনই যখন ইসলামকে সর্বতো উপায়ে আঁকড়ে ধরা হবে। সুতরাং জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইসলাম যে নির্দেশনা দিয়েছে তা

পুরোপুরিভাবে গ্রহণ-ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। চাই তা রাজ্যের ব্যাপার হোক কিংবা দেশের, চাই প্রশাসনিক ব্যাপার হোক বা জাতীয় ব্যাপার। চাই তা আচার-আচরণগত বিষয় হোক বা শক্তি-ক্ষমতার। চাই দয়া-ন্যায়পরতা, সাংস্কৃতিক, আইন-কানুন, জ্ঞান ও বিচারিক বিষয় হোক বা অর্থ-সম্পদ, আয়-উপার্জন, ধনাঢ্যতার ব্যাপার হোক। চাই জিহাদ ও দাওয়াত বিষয়ক হোক বা সৈন্যবাহিনী ও চেতনা-আদর্শের বিষয় হোক। ইসলাম সর্বক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ ও ন্যায়সঙ্গত বিধান প্রবর্তন করেছে। কেউ তা পুঙ্খানুপুঙ্খ পালন করলেই সে সঠিক আমল-ইবাদাত করেছে বলে ধর্তব্য হবে। আর তখনই সে তার আমলের পূর্ণ সাওয়াব পাবে।

নিজ নিজ শাসনামলে এসব দিকেই গুরুত্বারোপ করেছিলেন সময়ের দুই সাহসী সৈনিক মহামান্য সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ ও সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী।

৪৭. সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী উবায়দিয়া সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন করার মিশনে ব্রতী হয়েছেন। তিনি এর জন্য কেবল একটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বই দেখাশোনা করেছেন। তিনি উবায়দিয়াদের অস্তিত্ব খুঁজে বের করা এবং সুন্নী মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক কর্মতৎপরতা গ্রহণ করেন। তবে এর ফলাফল দ্রুত আসেনি। কেননা কোনো জাতির চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন এবং বাতিল মতাদর্শীদের সাম্রাজ্য বিনাশকরণে ধীরতার নীতি অবলম্বন না করে উপায় নেই। কেননা একই সাথে রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যাপারাদি দেখভাল করা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানে যোগ্যতাসম্পন্ন দায়িত্বশীল নিযুক্ত করার কোনো বিকল্প নেই। কেননা সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া একটি কাঙ্ক্ষিত বিপ্লব তৈরি করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

৪৮. সুলতান সালাহউদ্দীন প্রতিপক্ষের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও তাদের সাথে ক্ষমা ও উদারতার নীতি গ্রহণ করেছেন। তার এই কৌশল কার্যক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করেছে। এর কারণে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। তারা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছে। ফলে অনেকেই তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও দীক্ষিত হয়েছে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কাজ করে যাওয়া বাতিল ও ফিতনাবাজ লোকদের নির্মূল করা সহজ হয়েছে এবং জনমানুষকে চেতনার একই সারিতে ঐক্যবদ্ধ করা সহজতর হয়েছে।

বোঝা গেলো, ক্ষমতা ও অধিকার থাকার পরও ক্ষমা করে দেওয়া কখনো কখনো রাষ্ট্রকে সুসংহত করে, মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করে এবং প্রতিপক্ষকে বিবেকের কাছে পরাভূত করে ফেলে।

৪৯. সুলতান সালাহউদ্দীন যখন নিজ রাষ্ট্রের সকল মত ও পথকে একই চেতনার বাহুডোরে বেঁধে রাখতে সমর্থ হলেন তখন তিনি তার বাহিনী নিয়ে জারারার অভিমুখে ছুটে যান। যাতে সিরিয়াকে তিনি ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে পারেন। তার এই অভিযান ছিল সম্পূর্ণ সামরিক কলাকৌশলের আদলে পরিচালিত। তিনি ক্রমে ক্রমে মিসরের নিকটবর্তী কেল্লা ও শহরগুলো বিজয় ও দখল করতে শুরু করেন; তিনি খ্রিস্টানদেরকে পরাভূত করতে করতে হিত্তীন নিয়ে সমবেত করেন। সেখানে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে তাদেরকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন এবং বায়তুল মাকদিস বিজয়ের পথ সুপ্রশস্ত করেন।

৫০. নিশ্চয়ই নেতৃবর্গের উন্নত আচার-আচরণ ও মহিমান্বিত গুণ-গরিমা প্রকাশ পায় বড় বড় বিজয়ের মাধ্যমে। সুলতান সালাহউদ্দীন আল কুদস বিজয় করতে গিয়ে পবিত্র আচার-চরিত্র, ক্ষমা, উদারতা ও মহানুভবতার চিত্তাকর্ষক উপমা তৈরি করেন। তার এই দয়া ও মহানুভবতার আচরণে এবং ক্ষমা ও উদারতার এই বিশেষ গুণে খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহ ও ঐতিহাসিকগণ খুবই প্রভাবিত হন। তারা তার এই গুণ-গরিমার এমন প্রশংসা করেন, যা সাধারণত শত্রুপক্ষ থেকে কল্পনা করা যায় না।

৫১. বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগত নেতৃত্ব দানের বিষয়টি মূলত সুলতান সালাহউদ্দীনের একার হাতে ছিলো না। বরং তা ছিলো আলেম-উলামা ও ফকীহদের নিয়ন্ত্রণে। সুলতানের অন্যতম সহযোগী ছিলেন মহামান্য বিচারপতি। তিনি সুলতানের হাত ধরে তাকে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। সুতরাং বোঝা গেল, যখন বাস্তবিক অর্থেই উম্মাহ ও জাতির নেতৃত্ব থাকবে আল্লাহভীরু আলেম-উলামাদের হাতে, আর সামরিক বাহিনীর অফিসারগণও আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন তখন বিজয় ও সফলতা তাদের পদচুম্বন করবেই। আল্লাহর পথে অটল-অবিচল থাকলে আল্লাহ তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠিত রাখবেন।

৫২. মানুষ তাদের নেতৃবর্গের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়। তারা দুনিয়ার মানুষকে যা বোঝায় বা যে চিন্তা-আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তারা তাতেই মগ্ন

হয়ে পড়ে। তারা সে চিন্তা-আদর্শ ধারণ করে জীবন গড়ে। নেতাদের চারপাশে সমবেত হয়। নেতাদের জন্য নিজেদের সকল জান-মাল উৎসর্গ করে। নেতৃবর্গ যখন কেবল মুখের বুলি আওড়ায়, কাজের কাজ কিছু না করে তখন তাদের আকিদা-বিশ্বাস হয় এমন, যা কোনো মৃত আত্মাকে জাগ্রত করতে পারে না এবং কোনো ব্যক্তিত্ব তৈরি করে না। তারা কেবল নিজেদের দেখানোর জন্য বা খামাখা গাল-গপ্পো করার জন্য আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। এর ফলে এক সময় তাদের প্রতি মানুষের মোহ কেটে যায়। তারা তখন বিচ্ছিন্ন ও শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে।

সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের জীবনচিত্র ছিলো এর বিপরীত। কেননা তিনি প্রথমে নিজের জীবনে ইসলাম পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। একইভাবে সুলতান সালাহউদ্দীন ও তার অনুসারী শিষ্যবৃন্দও একই নীতি অবলম্বন করেছেন। যদ্দরুণ মানুষ তাদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে। তাদের নীতি ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছে। এ কারণেই তাদের দ্বারা ইসলামের অনন্য বিজয়গাঁথা রচিত হয়েছে।

৫৩. যখন জুলুম-অত্যাচার ও নিপীড়ন বেড়ে যায় এবং তা ক্রমাগত অব্যাহতভাবে চলতেই থাকে তখন অবশ্যই তার একটি শেষ পরিণতি থাকে। চাই সে জুলুম-অত্যাচার কোনো ব্যক্তির ওপর করা হোক বা কোনো রাষ্ট্রের ওপর। এই শেষ পরিণতি হয় জালেমদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নীতি ও পন্থার আলোকে। আল্লাহ তাআলা এ সকল জালেমদের ভাগ্যে এমন করুন ও মর্মান্তিক পরিণতি লিখে রাখেন, যা দেখে অন্যরা শিক্ষা নিতে পারে। একটু ভেবে দেখুন তো! উবায়দি সাম্রাজ্যের ওইসব প্রতাপশালী শাসকবৃন্দ আজ কোথায়? কোথায় হারিয়ে গেলো তাদের রাষ্ট্র ও রাজক্ষমতা?

৫৪. যখন কোনো আন্দোলন-সংগ্রাম বা বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কার জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে সংগঠিত হয় তখন তার সুফল খুব দ্রুতই পাওয়া যায়। আর যখন অজ্ঞ-মূর্খরা আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করে, উলামায়ে কেরাম ও চিন্তাশীল যুব সমাজ তা থেকে পিছিয়ে থাকে তখন সেই আন্দোলন ও সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৫৫. আমি মনে করি, সুলতান সালাহউদ্দীন ও সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ পৃথিবীর ইতিহাসে যে অমর গৌরবগাঁথা রচনা করেছেন তা মূলত ওইসব আলেম-উলামা, ফুকাহা ও খোদাভীরু নেতৃবর্গের চেষ্টা-পরিশ্রমের

ফসল– যারা এই মহান নেতাকে প্রস্তুত করায় নিজেদের মূল্যবান সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি উবায়দিয়া সাম্রাজ্য বিনাশ, হিত্তীনে খ্রিস্টানদের রাজক্ষমতা নির্মূল এবং ইসলামবিদ্বেষীদের হাত থেকে মসজিদে আকসা পূতঃপবিত্র করতে সক্ষম হয়েছেন।

৫৬. নিশ্চয় নেতৃস্থানীয় আল্লাহভীরু আলেম-উলামাদের এবং প্রাজ্ঞ জ্ঞানী-পণ্ডিতদের আচার-চরিত্র ধারণ করা উম্মাহ ও জাতির দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণের কারণ। নতুন প্রজন্মকে তাদের নীতি আদর্শের আলোক গড়ে তুলতে পারলে পার্থিব জীবন সুসংহত ও শান্তিপূর্ণ হবে।

৫৭. পাঠক সমাজের কাছে আমার এই রচনাটি সমালোচনা ও পর্যালোচনা দৃষ্টিতে পড়ে দেখার আবেদন করছি। ভাগ্যবিড়ম্বিত মুসলিম জাতির আদর্শিক জ্ঞান ও ঐতিহ্যগত চেতনা-অনুপ্রেরণা দানের তাগিদেই আমি এটি রচনার সাহস করেছি। সমালোচকদের উদ্দেশ্যে আমি জনৈক কবির নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে চাই,

إن تجد عيبا فسد الخللا ✪ جل من لا عيب فيه و علا.

যদি তুমি তাতে কোনো ত্রুটি খুঁজে পাও, তবে দয়া করে সেই ত্রুটি সংশোধন করে দিও। আর যার মাঝে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, সে তো মহান। তার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বাধিক।

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

**সমাপ্ত**

## ফাতেমি সাম্রাজের ইতিহাস- কেন পড়বেন?

১. বইটিতে 'ফাতেমি সম্প্রদায়' নামে পরিচিত ইসলাম বিদ্বেষী গোষ্ঠির পরিচয় ও তাদের রাজ্যশাসনের সূচনা এবং উত্থান-পতনের কথা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. মুসলিম জাতির বিনাশ সাধনে শিয়া-রাফেযিদের মারাত্মক ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. উত্তর আফ্রিকাঞ্চলে বাতেনি সম্প্রদায়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৪. আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শ প্রচার-প্রসার এবং সমগ্র উত্তর আফ্রিকা থেকে রাফেযিদের মূলোৎপাটনে সেখানকার আলেমসমাজের গৃহীত ভূমিকা ও পদক্ষেপের কথা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. শিয়া রাফেযি বাতেনি গোষ্ঠিকে নির্মূল করে ইসলামি অনুশাসন প্রতিষ্ঠায় সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ ও সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (র)-এর অসামান্য সংগ্রাম-সাধনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।